বরুণ সেনগুপ্ত

পালাবদলের পালা

2883

৭.২.৭১

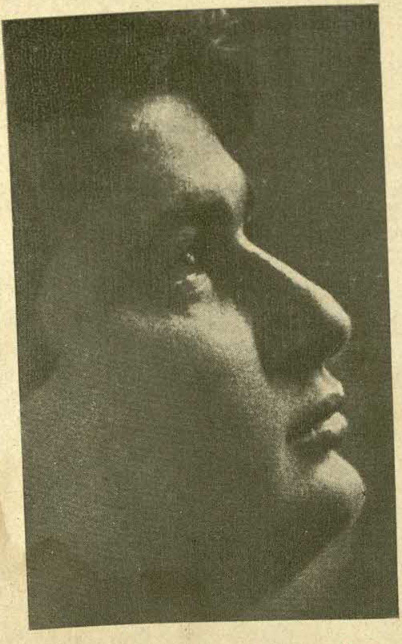

বরুণ সেনগুপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা।
তিনি সাংবাদিকতায় আছেন ১৯৬০ সনে আনন্দবাজারে যোগ দেওয়ারও আগে থেকেই। ১৯৫৪ সনে ছাত্রদের পাক্ষিক পত্রিকা 'ভাবীকালে' তাঁর হাতেখড়ি। তারপর ১৯৫৬ সনে নিজেই এক সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা বের করেন—নাম 'বর্তমান'।
জন্ম বরিশাল জেলায়—১৯৩৪ সনে।
শিক্ষা উড়িষ্যা, বরিশাল এবং কলকাতায়। ছাত্র অবস্থায় ছাত্র-রাজনীতিও করেছেন। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সেই থেকেই—রিপোর্টার হিসাবে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে।
বরুণ সেনগুপ্ত বাইরে ঘুরেছেন বেশ কয়েকবার। প্রথম বাইরে যান ১৯৬৪ সনে—রাশিয়ায়। তারপর ১৯৬৬ সনে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভিয়েৎনাম। ১৯৬৮ সনে গিয়েছিলেন পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজ্যে।

2883

This book was taken from the Library of Extension Services Department on the date last stamped. It is returnable within 7 days.

21.2.72
17.6.75
26.9.80

পালা বদলের
পালা

৮৩.০৬
সেন

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
2883
Dept. of Extension
SERVICE
9.2.71
CALCUTTA-27

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ৯

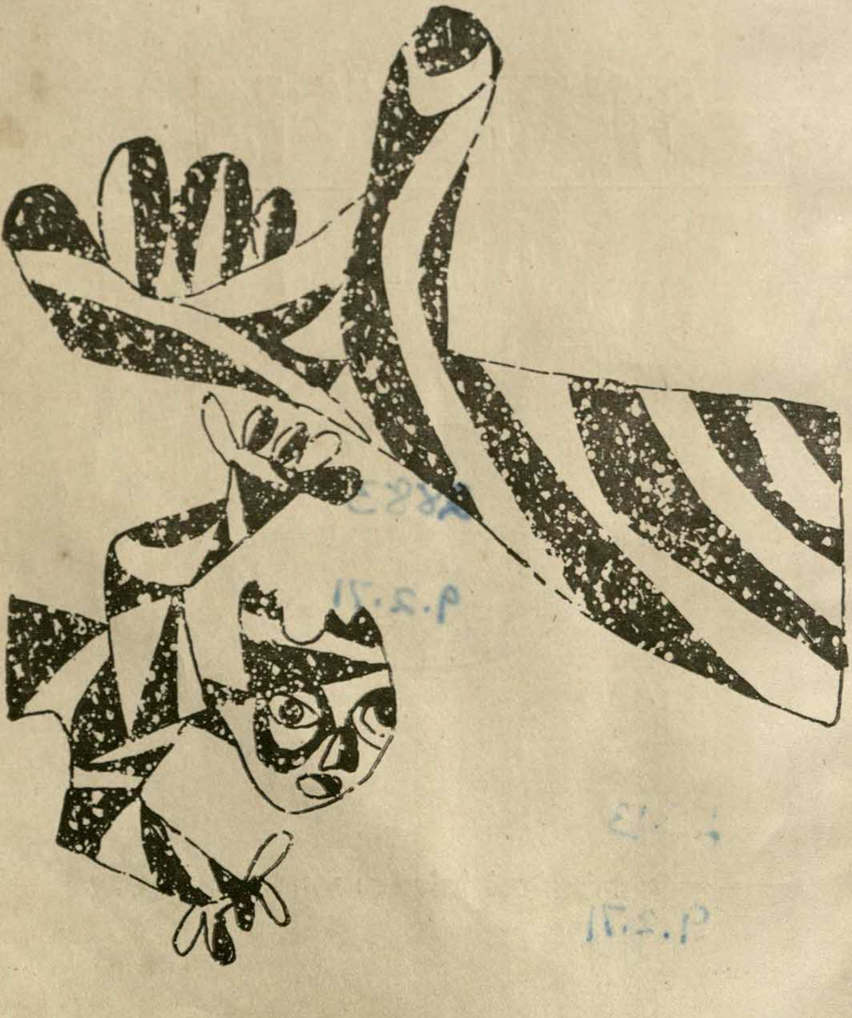

বরুণ সেনগুপ্ত

পালা বদলের পালা

৮৩.০৩
সেন

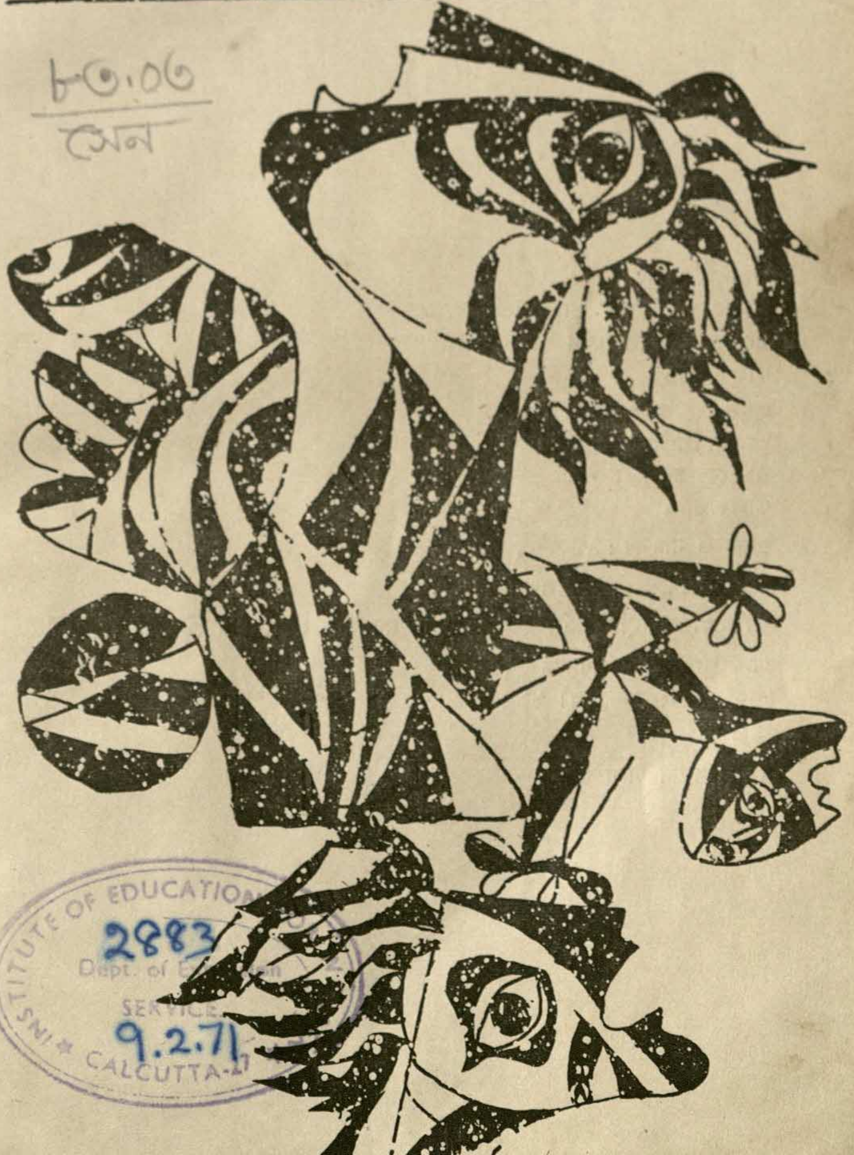

INSTITUTE OF EDUCATION
Dept. of Education
SERVICE
CALCUTTA-

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীঅরূপকুমার সরকার
আনন্দ প্রিন্টার্স
৪৯ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও নামপত্র : পূর্ণেন্দু পত্রী

রাণী সেনগুপ্ত কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বর্ণানুক্রমিক সূচি তৈরি করে দিয়েছেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শ্রীনকুল চ্যাটার্জী

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৭১
চতুর্থ মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৭১

মূল্য : বারো টাকা

২৪৫৩
৭.২.৭১

ঠাকুরমা সৌদামিনী সেনগুপ্তার স্মৃতিতে

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-27

লেখকের বক্তব্য

প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পর একদিন গৌরকিশোর ঘোষ বললেন: কি হে, ডায়রি ফায়রি কিছু রেখেছ? আমি জিজ্ঞেস করলাম: কিসের বলুন তো? গৌরদা বললেন: এই যে একটা বিরাট রাজনৈতিক ওলট পালট হয়ে গেল, যেটা তুমি নিজে রিপোর্টার হিসাবে নানাভাবে দেখলে সেইটা। আমি জবাব দিলাম: না।

গৌরদা তো চটে আগুন: এইটাই আমাদের দোষ। আমরা ভারতীয় রিপোর্টাররা এইটা করি না। তুমি যদি একটা ডায়রি রাখতে, যদি অপ্রকাশিত ঘটনাগুলি রোজকার মত রোজ লিখে রাখতে তাহলে আজ একটা বই লিখে ফেলতে পারতে। একটা নিরপেক্ষ ইতিহাস থাকত এই পিরিয়ডের।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পর আবার গৌরদা সেই প্রশ্ন তুললেন: কিহে, এবার নিশ্চয়ই ভুলটা আর করনি?

আমি বিনীতভাবে বললাম, না, এবারও ভুল করেছি। এবারও ডায়রি রাখিনি। তবে, এবার ঠিক করেছি, একটা লিখেই ফেলব। কিছু কিছু মনে আছে। বাকিটা জোগাড় করে নেব।

গৌরদা তখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন: বেশ, লেগে পড়।

কাজে হাত দিয়ে কিন্তু দেখলাম, ব্যাপারটা গোড়ায় যা মনে হয়েছিল তারচেয়ে অনেক কঠিন। বিশেষ করে এই জন্য যে অনেক জিনিষ, বহু তথ্য খবরের কাগজে, অর্থাৎ ডে টু ডে রিপোর্টিং-এ বেরই হয়নি।

তখন ভাবলাম, তাহলে একটা কাজ করা যাক, নেতাদের সঙ্গে কথা বলা যাক। দেখা যাক, তাঁরা গোপন তথ্যের কিছু বলতে রাজী হন কিনা।

কথা বললাম কয়েকজনার সঙ্গে। দেখলাম, হ্যাঁ, সবাই না হলেও অনেকেই

রাজী। এবং আরও দেখলাম, এক একজন এমন সব তথ্য জানাচ্ছেন যেগুলি আগে জানতামই না, কখনও শুনিইনি। এবং, তথ্যগুলি বেশ চাঞ্চল্যকর।

একদিন এই নিয়েই আলোচনা করছিলাম এক সহকর্মীর সংগে। সহকর্মী সব সময়ই লেটেস্ট পশ্চিমা কায়দাকানুন নিয়ে আলোচনা করে। শুনেই বললে: টেপ করে নিন সবটা। জানেন, ওরা এসব ব্যাপারে তাই করে।

আমি বললাম: ভালই বলেছ। টেপ করে নেওয়াই সেফ।

সেইদিন থেকেই টেপ রেকরডার নিয়ে নেতাদের ইণ্টারভিউ করতে বের হলাম। কিন্তু টেপ রেকরডার দেখে আবার নেতারা কেউ কেউ অখুশী হলেন। বিশেষ করে, কমিউনিস্ট নেতারা। জ্যোতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু, বিশ্বনাথবাবু কেউই টেপ রেকরডার খুলে কথা বলতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন: ওসব যনতর ফনতর আবার কেন !!

আমি কিন্তু উদ্দেশ্যটা তাঁদের খোলাখুলিই বলেছি। বলেছি: দেখুন, এতে সুবিধা অনেক। দিস্তে দিস্তে নোট নিতে হবে না। ভুলের সম্ভাবনাও কম থাকবে। এবং, পরে কারু বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক উঠলে টেপ রেকরডার সাক্ষী থাকবে।

কিন্তু তবু তাঁরা রাজী হননি।

যাঁরা রাজী হয়েছিলেন তাঁদের টেপ করা বক্তব্য আমি এখনও রেখে দিয়েছি। আরও একমাস রাখব। কারু যদি কোনও বক্তব্য থাকে ওই সময়ের মধ্যে জানালে বাধিত হব।

ঘটনাগুলি অর্থাৎ যুক্তফ্রণ্টের দুবারের রাজত্বের ইতিহাস আমি যেমন দেখেছি ও জেনেছি তেমন লিখেছি। সব গোপন তথ্যই আমি জানতে পেরেছি, এমন বড়াই করব না। তবে, সবটা জানার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি এবং যতটা জানতে পেরেছি লিখেছি। তাতে কোন্ দলের বা কোন্ নেতার লাভ বা ক্ষতি হবে সেটা

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-27

ভাবতে বসিনি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদের সূত্র জানিয়েছি। সর্বত্র অবশ্য পারিনি। কারণ, কতকগুলি ক্ষেত্রে এখনও সবাই নাম প্রকাশে রাজি নন। যেমন ধরুন, বিজয় ব্যানার্জীর রুলিং-এর নেপথ্য তথ্যটা। যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা দুজন আমায় এ তথ্য জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও নাম প্রকাশে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি। অথবা ধরুন, অজয়বাবুর চিঠিগুলি ড্রাফট করার ব্যাপারটা। রাজভবনে ধাওয়ান সাহেবের এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং অজয়বাবুর একান্ত নিজস্ব এক ভদ্রলোক বলেছেন যে জ্যোতিবাবুর কাছে লেখা অজয়বাবুর চিঠিগুলি ড্রাফট করে দিতেন লাটসাহেব নিজে। তাঁরাও নাম প্রকাশে রাজী নন। এমনি আরও কতকগুলি ঘটনার ব্যাপারে আমি সংবাদ-সূত্র প্রকাশ করতে পারিনি।

তবে, প্রকাশিত সব তথ্যের সত্যতা আমি নানাভাবে যাচাই করে নিয়েছি। কোথাও অনুমানের ভিত্তিতে কিছু লিখিনি। যে দু একটা জায়গায় অনুমানের উপর আলোচনা করেছি সেখানে তা স্পষ্ট জানিয়েছি।

মোটামুটিভাবে আমি ঘটনা লিখেছি—নেপথ্য ও প্রকাশ্য দুরকমেরই ঘটনা। কে অপরাধী বা কে নিরপরাধ, কে কোথায় কতটা ভুল করেছেন বা ঠিক করেছেন আমি সে আলোচনায় যাইনি। সে বিচার পাঠক করবেন। ঘটনাগুলি জানতে পারলে সে বিচার করতে তেমন অসুবিধাও হবে না।

বই লেখা যখন প্রায় শেষ হল তখন প্রশ্ন উঠল, নাম কী হবে। সন্তোষকুমার ঘোষকে ধরলাম: আপনি তো একসপারট, একটা নাম ঠিক করে দিন। উনি দু তিনটা নাম সাজেস্ট করলেন এবং তারপর নিজেই ঠিক করে দিলেন: পালা বদলের পালা। সেই নামই দেওয়া হয়েছে।

এরপর, ছাপাও যখন প্রায় শেষ তখন একদিন প্রশ্ন তুলল আর এক সহকর্মী: কই,

বই তো তেমন মোটা হল না, আপনি কি পরিশিষ্টে সব ডকুমেণ্ট দেননি?

বললাম: দিয়েছি, তবে দু একটা মাত্র।

ও বলল: না, না, যা যা প্রয়োজন, যা যা রেলেভেণ্ট সব দিয়ে দিন।

পরামর্শ করলাম আমার তিন রিপোর্টার বন্ধুর সঙ্গে—নিশীথ দে, সোমেন মুখার্জী এবং জ্যোতির্ময় গুপ্ত। ওঁরাই সব যোগাড় করে দিলেন। সকলের উৎসাহের আতিশয্যে হয়ত তাই পরিশিষ্ট একটু ভারীই হয়ে গিয়েছে। তবে, আমার মনে হয় এর কোনওটাই অপ্রয়োজনীয় নয়।

এই বই লিখতে গিয়ে আমি অনেকের সাহায্য নিয়েছি—বহু নেতা, বহু সহকর্মী এবং বহু বন্ধুর। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে গেলে বিরাট তালিকা হয়ে যাবে। আবার, সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে শুধু বিশেষভাবে কয়েকজনাকে ধন্যবাদ জানানও অন্যায়। তাই, নাম না করেই সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বই লেখা আমার এই প্রথম। তাই নানা ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গিয়েছে। সেজন্য আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

২০শে ডিসেম্বর ১৯৭০
আনন্দবাজার পত্রিকা ভবন

বরুণ সেনগুপ্ত

চিত্র পরিচিতি

১। যুক্তফ্রন্টের যাত্রা শুরু। ১৯৬৭ সনের ১লা মার্চ ময়দানে প্রথম জনসভা। অজয়বাবু তাঁর "সুপ্রীম কোর্টকে" নমস্কার জানাচ্ছেন।

২। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরূপে অজয়বাবু রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর কাছে শপথ নিচ্ছেন।

৩। শপথ গ্রহণের পর রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য পাঁচজন মন্ত্রী।

৪। ২০শে সেপ্টেম্বর নন্দ কংগ্রেস ভবনের বৈঠকে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

৫। ধর্মবীর যখন প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেন অজয়বাবু ঠিক তখনই গ্রান্ড হোটেলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মহামায়া প্রসাদ সিংহের সঙ্গে ভারতীয় ক্রান্তি দল নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

৬। ১৯৬৭ সনের ২১শে নভেম্বর রাজ্যপাল ধর্মবীরের কাছে মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিচ্ছেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। পাশে খগেন দাশগুপ্ত ও আশু ঘোষ।

৭। প্রথম ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হওয়ার পর হরতালের দিন কলকাতায় একটি সরকারী বাস পুড়ছে।

২। দিল্লির কর্তাদের পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য ১০ই নভেম্বর রাজ্যপাল ধর্মবীর ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ঘোষের রাজধানী যাত্রা।

৯। ১৯৬৭ সনের ১১ই নভেম্বর ময়দানের জনসভায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার।

১০। "ঐতিহাসিক রুলিং" দিয়ে স্পীকার বিজয় ব্যানার্জী সভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছেন।

১১। ১৯৬৭ সনের ২৯শে নভেম্বর বিধানসভার ভেতরের হাঙ্গামায় আহত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ।

১২। ১৮ই ডিসেম্বর আইন অমান্য করতে গিয়ে অজয়বাবু গ্রেফতার হচ্ছেন।

১৩। রাজ্যপাল ধর্মবীর কোনও রকমে তাঁর ভাষণের একটু অংশ পড়ে বিধানসভার পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

১৪। দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠনের আগে ময়দানের জনসভায় জ্যোতিবাবুকে আশীর্বাদ করছেন অজয়বাবুর মেজদিদি। জ্যোতিবাবুর পেছনে যতীন চক্রবর্তী।

১৫। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কাজ শুরু করার দিন রাইটার্স বিলডিংসের সামনে জনতা।

১৬। ১৯৬৯ সালের ১৬ই মার্চ অজয়বাবু তাঁর পদত্যাগপত্রে সই করছেন।

এই বইয়ের সব ছবি আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে নেওয়া। কার্টুনগুলি কুট্টির আঁকা। বিভিন্ন সময়ে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছবি ও কার্টুনগুলি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার স্বত্তাধিকারী ও প্রকাশক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের নিকট কৃতজ্ঞ।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-27

সূচীপত্র

চৌদ্দ দল, নয় মাস
আদি পর্ব ॥ ১
যাত্রা সুরু ॥ ১৫
লোভে পাপ ॥ ২৭
উত্তাপ বৃদ্ধি ॥ ৩৬
দোসরা অক্টোবর ॥ ৪৩
টাস্ক ইজ ওভার ॥ ৬২
আবার ডঃ ঘোষ ॥ ৮০
দুটো প্রশ্ন ॥ ৯৫
চৌদ্দ দল, তেরো মাস
সুরুতেই সংকট ॥ ১০৭
দিল্লীর সঙ্গে লড়াই ॥ ১২৫
শরিকী বিরোধের সূত্রপাত ॥ ১৩৭
আরও উত্তাপ ॥ ১৫৫
শেষ অধ্যায় ॥ ১৭১
সরকারের পতন ॥ ১৮৮
পরিশিষ্ট ॥ ২০৯
বর্ণানুক্রমিক সূচী ॥ ২৭৯

চৌদ্দ দল, নয় মাস

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
2483
Dept. of Extension
SERVICE
9.2.71
CALCUTTA-27

আদি পর্ব

সেদিন বাইশে ফেব্রুয়ারি। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বেরনো সুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের অফিসের সামনে বিরাট ভিড়। আগের দিনও ভিড় ছিল। তবে বাইশের ভিড়টা আরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের দ্বিতীয় দিন। সন্ধ্যা নাগাদ দ্রুত তালে খবর আসা সুরু হলো। কংগ্রেসের পরাজয়ের এক একটা খবর আসছে আর জনতার বিজয়োল্লাসে আমাদের অফিস বাড়িটাই যেন ফেটে পড়ছে। পাগল হয়ে উঠেছে হাজার হাজার মানুষ। শুধু চিৎকার আর চিৎকার : খবর চাই, আরও খবর চাই। প্রত্যেকটি কেন্দ্রের খবর চাই। এবং সবচেয়ে মজার, কংগ্রেসের পরাজয়ের খবর চাই! কোনও কেন্দ্রে কংগ্রেসের বিজয়ের খবর ঘোষিত হওয়া মাত্র ধিক্কারধ্বনি—যেন ঘোষক ফলাফলটা জানিয়ে মহাপাপ করে ফেলেছে!

এমন সময় এক সহকর্মী এসে খবর দিলেন, জরুরী ফোন, ফরওয়ার্ড ব্লক অফিস থেকে অশোক ঘোষ তোমাকে ডাকছেন।

ভাবলাম, অশোকবাবু বোধ হয় কোনও ফলাফল জানতে চান। অথবা, লেটেস্ট সামগ্রিক পরিস্থিতি। তালিকাটা হাতে নিয়েই গিয়ে ফোন ধরলাম। প্রথমেই বললাম, কোন্ কেন্দ্রের ফলাফল চান বলুন।

অশোকবাবু হেসে জবাব দিলেন, কোনও বিশেষ কেন্দ্রের ফলাফল জানতে চাই না। একটা ভাল খবর দেব এবং তোমার অনুমানটা জানতে চাইব।

বললাম, কী খবর!

বললেন : অকংগ্রেসী সরকার গঠনের আলোচনা সুরু হয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি এখনও খবরটা পাওনি। কিছুক্ষণ হলো সেনট্রাল গভরন্‌মেন্ট হস্টেল থেকে ফিরেছি। হুমায়ুন কবির আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। আলোচনা হল। যতটা ফলাফল প্রকাশিত তাই দেখেই কবির সাহেব মনে করছেন, কংগ্রেস এবার আর এ-রাজ্যে মেজরিটি পাবে না। সুতরাং, অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। কবির সাহেবের ধারণা, এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কাজ না সুরু করলে পরে নানা রকমের বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তাই, তিনি আজ থেকেই কাজ সুরু করতে চান। কবির সাহেব বললেন, অজয়বাবুরা নেই, বিশ্বনাথবাবুরাও নেই। তাই কাজ সুরু করার আগে তিনি আমার সংগে একটু কথা বলে নিতে চান। উনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনিসিয়েটিভ নেব কিনা।

জানতে চাইলাম, আপনি কী বললেন?

অশোকবাবু জবাব দিলেন : কী আবার বলব! বললাম, ঠিক আছে, আলোচনা সুরু করুন। আমি যতটা জানি বিশ্বনাথবাবুদেরও এতে কোনই আপত্তি হবে না। বাংলা কংগ্রেসের তো আপনিই আছেন।

তারপর অশোকবাবুই আমার কাছে জানতে চাইলেন : আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়—কংগ্রেস মেজরিটি পাবে না?

একটু ভাবলাম এবং তারপর জবাব দিলাম : এখনই সঠিক কিছু বলা মুশকিল। তবে, ইতিমধ্যে যতটা ফলাফল জানা গিয়েছে তাতে মনে হয় কংগ্রেসের পক্ষে ট্রেন্ডটা মোটেই ভাল নয়। মুসলিম প্রধান এলাকায় কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। সব মুসলিম এলাকায়ই যদি এই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকে তাহলে কংগ্রেসের পক্ষে জেতা অসম্ভব।

বললাম : অনুমানের কথা বাদ দিন। খবর বলুন। কবির সাহেব আজ আর কার কার সঙ্গে কথা বলবেন?

অশোকবাবু বললেন, অন্য পার্টির তেমন কারু সঙ্গে নয়। তবে, আজ রাত্রেই বোধহয় একবার জ্যোতিবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন।

রাত্রেই জ্যোতিবাবুকে টেলিফোন করলাম : কবির সাহেবের সঙ্গে আপনার কোনও কথা হয়েছে? আপনারা কি সম্মিলিত অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনে উৎসাহী?

জ্যোতিবাবু যেমন বলেন তেমনি বললেন : হ্যাঁ, উনিই ফোন করেছিলেন। তেমন কোনও কথা হয়নি। তবে হ্যাঁ, বললেন ননকংগ্রেস সরকার হতে পারে।...

জিজ্ঞেস করলাম : আপনাদের সিদ্ধান্ত কী? সরকার করবেন?

জ্যোতিবাবু বললেন : আমরাও অ-কংগ্রেসী সরকারে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে রাজী। জনগণের রায়, তোমরা এক হও। জনগণের এই রায়ের পর আমরাও প্রোগ্রাম-ভিত্তিক সরকার গঠনে রাজী।

•

পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের ব্যাপারে এই প্রথম পদক্ষেপ। তখনও অবশ্য 'যুক্তফ্রন্ট' নামটা হয়নি। নামকরণ হয়েছিল আঠাশে। যতদূর জেনেছি, নামটাও দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবিরই।

প্রথম থেকেই কবির সাহেবের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে হারবেই। যখন অ-কংগ্রেসীদের দুটো ফ্রন্ট হয়ে গেল[১] এবং যখন নির্বাচনী প্রচারের নামে দুই অ-কংগ্রেসী ফ্রন্টের খিস্তি-খেউড় চরমে উঠল তখনও কবির সাহেবকে বলতে শুনেছি, "কংগ্রেস হারবেই। অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেনকে বিদায় নিতেই হবে।"

---

[১] একটি ফ্রন্টের নাম ছিল ইউ. এল. এফ—ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট। এতে ছিলেন সি. পি. এম, আর. এস. পি, এস. এস. পি, এস· ইউ· সি, ওয়ারকারস পার্টি, মারক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর. সি. পি. আই। এই ফ্রন্টের জন্মের পরে সৃষ্টি হয় পি. ইউ. এল. এফ—পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টে ছিলেন সি. পি, আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বলশেভিক পার্টি। প্রধানত দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঝগড়া এবং সিট ভাগাভাগির বিরোধ থেকেই এই দুই ফ্রন্টের জন্ম।

পরে অবশ্য অনেকে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু "কংগ্রেস হারবেই" নির্বাচনের আগে একথা দৃঢ়ভাবে বলতে শুনেছি মাত্র দুজন অ-কংগ্রেসী নেতাকে। তাঁদের একজন হুমায়ুন কবির, আর একজন সি. পি. এমের প্রমোদ দাশগুপ্ত। দুজনেরই মূল অনুমান ঠিক হয়েছিল। কিন্তু নিজেরা ক'টা আসন পাবেন সে সম্পর্কে দুজনেরই অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়। প্রমোদবাবু তো ধরেই নিয়েছিলেন, পি. ইউ. এল. এফের ভরাডুবি হবে।

সেইদিনই অর্থাৎ বাইশেই কবির সাহেব এবং অশোকবাবু আরও কতগুলি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন। অশোকবাবু তখনই অবশ্য আমাকে সে সব কথা বলেননি। পরে বলেছেন। অশোকবাবুর নিজেরই ভাষায় : প্রথম দিনই আমি বললাম, কবির সাহেব, তিনটা প্রস্তাব আছে আমার। (এক) অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। (দুই) সি. পি. এমকে সরকারে নিতে হবে—ওঁরা শুধু বাইরে থেকে সমর্থন জানালেই চলবে না। এবং, (তিন) সরকার গঠনের প্রথম আনুষ্ঠানিক আলোচনায় সি. পি. এম, সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর. এস. পিকে ডাকতে হবে। কবির সাহেব আমার সব ক'টা প্রস্তাবেই রাজী হলেন। মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রশ্নে তিনি নিজেই বরং বললেন : ডঃ ঘোষ সবাইকে নিয়ে চলতে পারবেন না। তাই তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা উচিত হবে না।[২]

বাইশেই স্থির হয়েছিল, পরদিন পিপলস ইউনাইটেড লেফট ফ্রণ্টের নেতারা অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্তারা একত্রে ঘরোয়াভাবে এ নিয়ে কিছুটা কথা বলে নেবেন। কিন্তু তা আর হল না। অজয়বাবু সুশীল ধাড়াও সেদিন কলকাতা ছিলেন না। সি. পি. আই নেতারাও যে যাঁর নিজ নিজ নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

আরও একটা ব্যাপার, কবির সাহেব নিজেও পাঁচদলের প্রথম বৈঠকের আগে তিন দলের 'ঘরোয়া' আলোচনায় তেমন উৎসাহী ছিলেন না। শুনেছি, তাঁর আশংকা ছিল, এই রকম কোনও আলাদা মিটিং হলে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাবে—সি. পি. এমের মনে অহেতুক কতকগুলি আশংকা দেখা দেবে।

তেইশ তারিখ সন্ধ্যায় আরও বহু কেন্দ্রের ফলাফল জেনে কবির সাহেবের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ইতিমধ্যেই বহু কেন্দ্রে কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের খবর এসেছে। ওই দিন আরামবাগ কেন্দ্রেরও ফল বের হল—প্রফুল্ল সেন পরাজিত, অজয়বাবু বিজয়ী। একেবারে হই হই পড়ে গেল।

সন্ধ্যার মধ্যেই টেলিফোনে টেলিফোনে কবির স্থির করে ফেললেন, পরদিন অর্থাৎ চব্বিশে সকালে সেণ্ট্রাল গভরনমেণ্ট হস্টেলে পাঁচ পার্টির প্রতিনিধিদের বৈঠক বসবে। অজয়বাবু, সুশীলবাবু তখনও কলকাতায় পৌঁছননি। বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে কবির সাহেব একাই এগিয়ে চলেছেন। চব্বিশে সকাল এগারোটার মধ্যে অজয়বাবু কলকাতা পৌঁছবেন বলে আশা করা গিয়েছিল। আরামবাগ থেকে

---

২ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

ফেরার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় মিছিলের ধাক্কায় তিনি দুপুরের আগে কলকাতা পেঁছতেই পারলেন না।

সকলের মনেই কিন্তু তখনও সি. পি. এম সম্পর্কে বেশ কিছুটা সন্দেহ ছিল। সি. পি. এম কী করবেন? তাঁরা কি কোনও সর্বদলীয় অ-কংগ্রেসী সরকারে যোগ দিতে রাজী হবেন?

সন্দেহটা অমূলকও ছিল না। কারণ, দিন তিন চার আগেই দলের সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে কতকগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন।

ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরই আমি বহু দলের নেতার সঙ্গে কথা বলি। প্রমোদবাবুর সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। প্রমোদবাবু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন, কংগ্রেস হারবেই। তিনি এও বলেছিলেন, ওরা ১২০-টার মত আসন পাবে।

আমি তারপরই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাহলে কি এবার পশ্চিমবঙ্গে সম্মিলিত বামপন্থী সরকার হবে?

প্রমোদবাবু জবাব দিয়েছিলেন : তা ধরে নেওয়া যায় না। যাঁরা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ছেড়ে এসেছেন এখন তাঁরা আবার কংগ্রেসে ফিরে যেতে পারেন। প্রফুল্ল সেনকে কোথাও একটা রাজ্যপাল করে সরিয়ে দেওয়া হবে। তখন অশোক সেনের মত কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করেই কংগ্রেসী সরকার হতে পারে।

পরদিন প্রমোদবাবুর এই বক্তব্য আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরও হল। তাই দেখে সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তাহলে কংগ্রেস হারলেও প্রমোদবাবু সে সুযোগ নিতে চান না!

পি. ইউ. এল. এফ-ইউ. এল. এফ ঝগড়ার রেশ তখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। পি. ইউ. এল. এফের লোকেদের ঝালটা আবার সবচেয়ে বেশি প্রমোদবাবু সম্পর্কে। সোমনাথ লাহিড়ির জামানত জব্দ করে দেব—প্রমোদবাবু এরকম একটা মন্তব্য করায় সি. পি. আই-ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন।

পি. ইউ. এল. এফ-ইউ. এল. এফের তিক্ত সম্পর্ক, প্রমোদবাবুর বক্তব্য—এইসব মিলিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল, শেষ পর্যন্ত সি. পি. এম এই সরকারে যোগ দিতে রাজী হবেন কিনা। সন্দেহটা কবির সাহেবের মনেও ছিল। তাই তিনি এ ব্যাপারে ত্রিদিব চৌধুরীর সাহায্য নিলেন। ত্রিদিববাবুর পারটি আর. এস. পি নির্বাচনে সি. পি. এমের সঙ্গে ছিলেন। ত্রিদিববাবুর সঙ্গে কবির সাহেব এবং জ্যোতিবাবু দুজনেরই ভাল ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তেইশ তারিখেই কবির সাহেব ত্রিদিববাবুর সঙ্গে কথা বলেন। ত্রিদিববাবুর কাছে কবির সাহেব অনুরোধও জানালেন, যেন চব্বিশের বৈঠকের আগেই তিনি জ্যোতিবাবুকে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলেন। কবির সাহেবের ভয় ছিল, যদি প্রথমেই একটা কিছু নিয়ে জট পাকিয়ে যায় তো সে জট ছাড়ানো কঠিন হবে। তিনি তাই সবকিছু চটপট করে ফেলতে চাইছিলেন। তিনি তাই সব দিকে লক্ষ্য রেখে এগোচ্ছিলেন।

পরে সি. পি. এম নেতারাও আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে সরকারে যোগদান নিয়ে প্রথমে তাঁদের মধ্যে সত্যিই কিছুটা মতভেদ ছিল।

বাইশ তারিখ সকাল থেকেই সি. পি. এম নেতারা ঘরোয়া ভাবে এ নিয়ে

আলোচনা সুরু করেন। গোড়ায় দুটো মত ছিল তাঁদের মধ্যে। প্রথম মত, বাইরে থেকে অ-কংগ্রেসী সরকারকে সমর্থন জানানো যায়—কিন্তু সরকারে যোগ দেওয়া অত্যন্ত ভুল হবে। দ্বিতীয় মত, সরকারে যোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। জ্যোতিবাবু অবশ্য বাইশে রাত্রেই আমাকে বলেছিলেন, "আমরাও সক্রিয়ভাবে অ-কংগ্রেসী সরকারে যোগ দিতে রাজী।" আসলে কিন্তু তখনও তাঁর পারটিতে এ সম্পর্কে কোনও সিন্ধান্ত হয়নি।

চব্বিশ তারিখ পাঁচ পারটির মিটিং-এর আগে তাই সি. পি. এম রাজ্য সম্পাদক-মণ্ডলীর বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে পারটির সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরায়াকেও উপস্থিত থাকতে বলা হল। সুন্দরায়ার উপস্থিতিতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সিন্ধান্ত নিলেন : পারটি অ-কংগ্রেসী সরকারকে সমর্থন জানাবে। কিন্তু সরকারে যোগদানের ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখাবে না। তবে, প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে এবং সক্রিয়ভাবে সরকারে যোগ দেবে। আর, এমন যেন মানুষের ধারণা না হয় যে সি. পি. এমের জন্যই অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের প্রচেষ্টা বাধা পাচ্ছে! এবং, সরকারে যোগদানের আগে ন্যূনতম কর্মসূচী স্থির করে নিতে হবে।

প্রমোদবাবু এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার দুজনেই পরে আমাকে বলেছেন : এই বৈঠকেই আমরা সিন্ধান্ত করেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নাম উঠলে কিছুতেই রাজী হব না। আমরা বরং অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথা বলব।

দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এই বৈঠকে আরও স্থির করলেন যে, জ্যোতিবাবু কেরল যাবেন না, পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের আলাপ আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায়ই থেকে যাবেন। পঁচিশে থেকে ত্রিভান্দ্রমে সি. পি. এম পলিটব্যুরোর (পি. বি) বৈঠক সুরু হল। পি. বি-র সামনে সেই সময় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেরলে সরকার গঠন। কেরলে সরকার গঠন নিয়ে তখন নানা রকমের ফ্যাঁকড়া দেখা দিয়েছে। চব্বিশে বিকালেই প্রমোদবাবুরা ত্রিভান্দ্রম যাত্রা করলেন। জ্যোতিবাবু থেকে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের আলোচনা চালাবার জন্য।

চব্বিশ তারিখ সকালে এগারোটা নাগাদ সেণ্ট্রাল গভরনমেণ্ট হস্টেলের চার নম্বর ঘরে পাঁচ পারটির বৈঠক বসল। কবির সাহেব কলকাতা এলে ওই ঘরেই থাকতেন। মিটিং-এ ছিলেন সি. পি. এমের জ্যোতিবাবু ও নিরঞ্জন সেন, বাংলা কংগ্রেসের হুমায়ুন কবির ছাড়া জাহাঙ্গীর কবির ও ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, সি. পি. আই-এর সোমনাথ লাহিড়ি, ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু, অশোক ঘোষ ও অমর চক্রবর্তী এবং আর. এস. পি-র ত্রিদিব চৌধুরী ও যতীন চক্রবর্তী।

দীর্ঘ তিক্ততার পর এই প্রথম দুপক্ষে বৈঠক। জ্যোতিবাবুই প্রথম আবহাওয়াকে সহজ করে তুললেন। নিজে থেকেই বললেন, আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অনেক খারাপ কথা বলেছি। এখন জনগণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। এবার একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আপনাদের মধ্যে কোনও পারটির যদি সি. পি. এম সম্পর্কে আপত্তি থাকে তো আপনারা মন্ত্রিসভা করুন, আমরা ফ্রণ্টের মধ্যে থেকেই সমর্থন জানাবো।

উপস্থিত সবাই বললেন, না, না, তা হয় না। আপনাদের সরকারে থাকতেই হবে।

হুমায়ুন কবির প্রস্তাব করলেন, দুটো ফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে বিধানসভায় একটা ফ্রন্ট করা হোক। সবাই এ প্রস্তাবকেও স্বাগত জানালেন।[৩]

তখনও সব ফল বের হয়নি। কিন্তু যতটা জানা গিয়েছে তাতেই বেশ পরিষ্কার যে, কংগ্রেস আর পশ্চিমবঙ্গে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছেন না। সেই দিন সকালেই কাগজে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু দের বিবৃতিও বেরিয়েছে। সে বিবৃতির মোদ্দা বক্তব্য : কংগ্রেস বিধানসভায় গরিষ্ঠতা পায়নি। তাই কংগ্রেস বিরোধী আসনেই বসতে চায়। কংগ্রেস যে এম. এল· এ ভাঙিয়ে বা অন্য কোনও দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়ার চেষ্টা করবেন না, এই বিবৃতিতে তা পরিষ্কার হয়ে গেল।

প্রথম দিন পাঁচ পার্টির মিটিং বেশিক্ষণ চলল না। এই মিটিংয়েই মোটামুটি স্থির হয়ে গেল, অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সি. পি· এমও সোৎসাহে অজয়-বাবুর নামই সমর্থন করলেন। ডঃ ঘোষের নামই উঠল না।

এরপর কবির সাহেব বললেন, মন্ত্রিসভা ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মোটামুটি সাতজনের—সি. পি. এম ও বাংলা কংগ্রেস দুই করে, সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর. এস. পি এক করে। ছোট দলগুলি থেকে মন্ত্রী নেওয়া হবে না।

উপস্থিত সবাই সে প্রস্তাবকেও স্বাগত জানালেন।[৪]

বৈঠকের শেষে পাঁচদলের নেতারা একটি ছোট্ট বিবৃতিও প্রচার করলেন, "সকলে এক হয়ে জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি সরকার গঠনের যে পবিত্র দায়িত্ব আমাদের উপর পড়েছে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দু-একদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারব।" বিকালে এই বিবৃতিতে অজয়বাবু এবং ডঃ প্রফুল্ল ঘোষও সই করলেন।

সকালের বৈঠকে কাজ বেশ ভালই এগোলো।

গোটা পশ্চিমবঙ্গে তখন প্রচণ্ড বিজয়োল্লাস চলছে। ট্রামে, বাসে, হাটে, মাঠে, অফিসে, কাছারিতে বামপন্থীরা, কংগ্রেস বিরোধীরা খুশিতে টগবগ করছেন। তাঁদের বহুদিনের আশা এবার সফল হতে চলেছে। কংগ্রেস পরাজিত, বাম-পন্থীরা সরকার গঠনে উদ্যোগী। অজয়বাবুকে নিয়ে বিরাট মিছিল বের হল হাওড়া স্টেশন থেকে। হাজার হাজার মানুষ যোগ দিলেন সেই মিছিলে। আনন্দে মিছিলের একাংশ মাইলের পর মাইল নাচতে নাচতেই এগিয়ে গেল।

বামপন্থী নেতারা, ফলাফল বের হবার পর থেকে এতক্ষণ নাচতে নাচতেই এগোচ্ছিলেন। সকালে পাঁচ দলের বৈঠকের সাফল্য তাঁদের আরও উৎসাহিত করে তুলল। বিবৃতিতে সবাই পরম আগ্রহে সই দিলেন। ছোট মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাবও 'উত্তম' বলে মেনে নিলেন।

কিন্তু রাত্রি নাগাদ একটু খটকা লাগল। দুই ফ্রন্টের নেতারাই আলাদা আলাদা

---

৩ জ্যোতি বসু। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০।

৪ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

আলোচনায় বসে দেখলেন, সব ঠিক হয়নি। কিছুটা ভুল হয়ে গিয়েছে। ইউ. এল. এফ-এ অর্থাৎ সি. পি. এম প্রভাবিত ফ্রন্টে "ভুলটা" ধরিয়ে দিলেন "ছোট" দলগুলি। সকালের মিটিং-এর বিবরণ শুনে তাঁরা তো চটেই আগুন : এ কেমন কথা! মন্ত্রিসভায় শুধু বড় দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন? এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত! ছোট দলগুলি কি বানের জলে ভেসে এসেছে?

পি. ইউ. এল. এফ-এর অবশ্য এ সমস্যা দেখা দিল না। কারণ, কবির সাহেবের ফরমুলা অনুসারে বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক তিন দলের ভাগেই মন্ত্রিত্ব জুটেছে। তাঁদের চতুর্থ ভাই বলশেভিক পারটির কোনও এম. এল. এ-ই নির্বাচিত হননি। সুতরাং, তাঁদের দলের কাউকে মন্ত্রী করার সমস্যাই নেই।

এদের নৈশ বৈঠকে নূতন ফ্যাকড়া তুললেন সি. পি. আই। তাঁদের নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জী বললেন, আমাদের পারটি মনে করে সবচেয়ে বড় দলের নেতা হিসাবে জ্যোতিবাবুরই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত। কারণ, জনগণ তাঁদের উপরই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব দিয়েছে। বিশ্বনাথবাবু আরও যুক্তি দেখালেন, সি. পি. এমকে সবচেয়ে বেশি কাজের দায়িত্ব দিয়ে আটকাতে না পারলে পরে নানা গণ্ডগোল দেখা দেবে। এমন ব্যবস্থা করা চাই-ই যাতে ওরা সরকারে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।[৫]

বিশ্বনাথবাবুর কথা শুনে অশোক ঘোষ তো থ। প্রচণ্ড বাধা দিলেন। বললেন : সে কী কথা, সকালেই তো ঠিক হয়ে গিয়েছে অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তারপর এসব কথা ওঠে কী করে! এ প্রস্তাব আমরা এখন আলোচনা করতেও রাজী নই। অজয়বাবু ছাড়া আর কারও নামে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে।

এই বৈঠকে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে হাজির ছিলেন অজয়বাবু এবং জাহাঙ্গীর কবির সাহেব। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনে অজয়বাবু চুপ করে বসে রইলেন। একটা কথাও বললেন না। দলের পক্ষে কথা বললেন জাহাঙ্গীর কবির। তাঁরও একই কথা : না, অজয়বাবুই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

দুই শরিকের এই ঘোর আপত্তির মুখে বিশ্বনাথবাবু বললেন : তাহলে আপনারা আপত্তি করছেন। কিন্তু সব দলের বৈঠকেও আমরা আমাদের এই প্রস্তাব রাখব। এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। তাই, প্রস্তাবটা আমাদের সর্বসমক্ষে রাখতেই হবে।[৬]

পরদিন সর্বদলীয় বৈঠক বসল বৌবাজারের ভারতসভা হলে। বারটি দলের কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত। পি. ইউ এল. এফ এবং ইউ. এল. এফের এগার দল আর প্রজাসমাজতন্ত্রী পারটি।

কবির সাহেব টেলিফোনে এবং সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব ঠিকই

---

[৫] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০। বিশ্বনাথ মুখার্জী বলছেন, "এরকম প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম কিনা আমার ঠিক মনে নেই।" সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০।

[৬] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

করে রেখেছিলেন। একটা মেজাজী ভাই-ভাই আবহাওয়ায় বৈঠক সুরু হল। সবাই খুশিতে ডগমগ। পি. ইউ. এল. এফ-ইউ. এল. এফের ঝগড়ার রেশ মাত্র নেই। খুব ঝটপট কাজ হয়ে গেল। স্থির হল, দুই ফ্রণ্ট তুলে দিয়ে বিধান-সভায় একটা ফ্রণ্ট হবে। সেই ফ্রণ্টের নেতা হবেন অজয়বাবু। কবির সাহেবের পরামর্শমত আনুষ্ঠানিকভাবে অজয়বাবুর নাম প্রস্তাব করলেন হেমন্ত বসু আর সমর্থন করলেন জ্যোতিবাবু। প্রচণ্ড জয়োল্লাসে এবং হাততালিতে ভারতসভা হল কেঁপে উঠল। বাইরে বৌবাজার স্ট্রীটে বহু লোক জড় হয়েছিল। তাঁরাও আনন্দে জিন্দাবাদ বলে ধ্বনি দিলেন।

এরপরই উঠলেন বিশ্বনাথ মুখার্জী। বললেন : আমরা মনে করি বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে জ্যোতিবাবুরই ফ্রণ্টের নেতা হওয়া উচিত। কিন্তু দেখলাম তাতে অনেক দলের আপত্তি আছে। তাই আমি প্রস্তাব করছি জ্যোতিবাবু ফ্রণ্টের ডেপুটি লিডার হোন, অর্থাৎ তিনি হবেন সরকারের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার।[৭] একমাত্র পি. এস. পি-র সমর গুহ ছাড়া সবাই এই প্রস্তাব বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করলেন।[৮] তবে, এবার হাততালি ঠিক তেমন আর শোনা গেল না।

বৈঠকে আরও স্থির হল, নতুন ফ্রণ্টের একটা কর্মসূচী তৈরী করা হবে এবং সরকার গঠনের আগেই সেই কর্মসূচী "বাঙলার সংগ্রামী মানুষকে" জানানো হবে।

কবির সাহেব এতটুকু সময় নষ্ট করতে রাজী ছিলেন না। তাঁর এবং অন্যান্য বামপন্থী নেতারও ভয় ছিল, বিলম্বে গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ ভাবছিলেন, নির্মলেন্দু দের বিবৃতি সত্ত্বেও কংগ্রেস লোক ভাঙিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করবে। সি. পি. এমের কোনও কোনও নেতার আশংকা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গের মত শিল্পপ্রধান রাজ্যে বামপন্থী সরকার হতে দেবে না। কবির সাহেব আবার মনে করেছিলেন, দেরি হলে নিজেদের মধ্যেই না কিছু নিয়ে ঝগড়া সুরু হয়ে যায়।

কবির তাই পঁচিশের বৈঠকেই প্রস্তাব করলেন, আজই রাজ্যপালকে জানিয়ে দেওয়া হোক, আমাদের নেতা অজয়বাবু, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা সরকার গড়তে চাই। তখনও কিন্তু চোদ্দ দল সমবেত হননি। এই সভায় গোর্খা লীগ এবং লোকসেবক সঙ্ঘের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। নির্দল সদস্যদের সকলেও উপস্থিত নেই। তা সত্ত্বেও সাংবাদিকদের কাছে কবির সাহেব দাবি করলেন, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজ্যপালকেও তাই জানান হল। যতীন চক্রবর্তী বললেন, কংগ্রেসী ১২৭ জন এম. এল. এ ছাড়া সবাই আমাদের সঙ্গে।

সেইদিনই এগার দলের এগারজন নেতা আলাদা আলাদা ভাবে রাজ্যপাল পদ্মজা নইডুকে চিঠি পাঠালেন : আমরা নব নির্বাচিত বিধানসভায় গরিষ্ঠ। মন্ত্রিসভা গঠনে ইচ্ছুক। সুতরাং আমাদের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়কে আপনি মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান।

---

[৭] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

[৮] বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০।

পরিস্থিতিটা যখন এই রকম তখন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু পরামর্শের জন্য দিল্লি গেলেন। ওই পঁচিশে ফেব্রুয়ারিই। রাজ্যপাল অবশ্য ইতিমধ্যেই টেলিফোনে দিল্লির সঙ্গে কিছু কথা বলেছিলেন। সাক্ষাতে বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য তাঁকে দিল্লি যেতে হল।

রাজ্যপালের দিল্লি যাত্রার খবর রটে যাওয়ায় অ-কংগ্রেসী মহলে আবার কিছুটা আশংকা দেখা দিল। আমার মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন বামপন্থী নেতা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : কি শুনছ, আমাদের সরকার করতে দেবে না?

কিন্তু রাত্রেই কলকাতায় খবর পেঁছে গেল, না, দিল্লির কর্তাদের জনতার রায় মেনে নিতে কোনও আপত্তি নেই। তাঁরা অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় বাধা দিতে চান না। রাজভবনে রাজ্যপালের সেকরেটারির কাছে হুকুম এল, সোমবার সকালে রাজ্যপাল অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। কালই চিঠি পাঠিয়ে দিন।

সেদিন শনিবার। রবিবার সকালেই অজয়বাবুর কাছে আমন্ত্রণ লিপি গেল। রাত্রে রাজ্যপাল কলকাতা ফিরলেন।

পরদিন অর্থাৎ সাতাশে সকালে কিন্তু অ-কংগ্রেসী নেতারা সবাই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন—রাজ্যপাল শুধু অজয়বাবু নন, বিভিন্ন দলের নেতার সঙ্গেই আলাদা আলাদা কথা বলতে চান। সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। টেলিফোনে টেলিফোনে আলোচনা হল। স্থির হল, সবাই চিঠিতে যা লিখেছেন মুখেও রাজ্যপালকে গিয়ে তাই বলবেন।

প্রথমে গেলেন অজয়বাবু। ১৪৬ জন এম. এল. এ-র নামের তালিকা রাজ্যপালের কাছে দাখিল কর বললেন, এরা আমায় সমর্থন করবে।

তারপর একে একে গেলেন জ্যোতিবাবু, সোমনাথবাবু, হেমন্তবাবু, ডঃ ঘোষ, সমর গুহ, মাখন পাল এবং অরুণ ঘোষ।

রাজ্যপাল সবাইকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি অজয়বাবুকে নেতা নির্বাচিত করেছেন? আপনারা কি সরকার গঠন করতে চান? সবাই বললেন, হ্যাঁ।

নেতারা পদ্মজার ব্যবহারে মহাখুশী। তাঁদের সব আশংকা দূর হল। এতদিনে সকলেই আশ্বস্ত হলেন, না, কেন্দ্র তাহলে পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনে কোনও বাধা দেবেন না।

রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু সেদিন সব নেতাকে মোটামুটি একই কথা বলেছিলেন। শুধু অ-কমিউনিস্টদের বাড়তি সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন : পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত রাজ্য। নানা দিক থেকে এর বিশেষ গুরুত্ব। আপনারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সরকার গঠন করছেন। দেশবাসী আপনাদের কাছে বিশেষ সতর্কতা আশা করে।

সরকার হচ্ছেই—এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আঠাশে নেতারা আবার ভারতসভা হলে সমবেত হলেন। এই বৈঠকে চোদ্দ দলই হাজির। হাজির অনেক নির্দল সদস্যও।

এই বৈঠকেই স্থির হল, বিধানসভায় সম্মিলিত অ-কংগ্রেসী দলের নাম হবে যুক্তফ্রন্ট। আর স্থির হল, এই যুক্তফ্রন্টের একটি কর্মসূচী রচিত হবে। কর্মসূচী

রচনার জন্য সব দলের লোক নিয়ে একটা আলাদা বৈঠক বসল ডঃ নলিনাক্ষ সান্যালের বাড়িতে।

ভারতসভা হলের এই দিনের বৈঠকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠন। স্থির হল, বাইরে চোদ্দ দলের কাজকর্মে সংহতি রক্ষার জন্য এবং সরকারের সঙ্গে (দলীয় পর্যায়ে) জনগণের যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে সব দল থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। আরও ঠিক হল, এই কমিটিই সরকারের মূল নীতি নির্ধারণ করে দেবেন। কমিটির দুজন আহ্বায়ক হলেন দুই সর্বকনিষ্ঠ পারটি থেকে—বলশেভিক পারটির বরদা মুকুটমণি এবং আর· সি পি. আই-র সুধীন কুমার।

এই বৈঠকের আরও একটি সিদ্ধান্ত—প্রথমে মাত্র ছয়জন মন্ত্রী শপথ নেবেন। বাংলা কংগ্রেসের অজয়বাবু এবং জাহাঙ্গীর কবির, সি. পি. এমের জ্যোতিবাবু, সি. পি আই-র সোমনাথ লাহিড়ি, ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু এবং নির্দল ডঃ ঘোষ।

মন্ত্রী বাছাই এবং দফতর বণ্টন নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পারটি আলাপ আলোচনা সুরু করে দিয়েছেন।

প্রায় সব দলের মধ্যেই মন্ত্রী বাছাই নিয়ে কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি হল। ব্যাপারটা সবচেয়ে খারাপ আকার নিল বাংলা কংগ্রেসে। যতক্ষণ ঠিক ছিল বাংলা কংগ্রেস থেকে মাত্র দুজন মন্ত্রী হবেন ততক্ষণ অবশ্য তেমন কোনও গণ্ডগোল ছিল না। দুটো নাম অতি সহজেই পাকা হয়ে গেল। হুমায়ুন কবিরই স্থির করে ফেললেন—অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হবেন, আর মন্ত্রী হবেন জাহাঙ্গীর কবির।

ইতিমধ্যে মাত্র সাতজনের মন্ত্রিসভা করার মূল সিদ্ধান্তও গিয়েছে পাল্টে। সবাই বুঝেছেন, সাতজনে সামলানো যাবে না। অন্তত ষোলজন না হলে বিভিন্ন দলের ভেতরে বিপ্লব হয়ে যাবে। তাছাড়া, শুধু বড় দলগুলি থেকে মন্ত্রী করার প্রস্তাবে ছোট দলগুলিও একেবারে খাপ্পা। সুতরাং, পঁচিশে ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় সকলেই ধরে নিলেন, মন্ত্রিসভা ষোলর ঊর্ধ্বে হবে এবং দুই বড় শরিক, অর্থাৎ সি. পি. এম এবং বাংলা কংগ্রেসের ভাগে তিনটি করে মন্ত্রিত্ব জুটবে।

এই তৃতীয় মন্ত্রীর নাম নিয়েই বাংলা কংগ্রেসে জোড় লড়াই সুরু হয়ে গেল—অনেক প্রার্থী আসরে নেমে পড়লেন। এলেন সুশীল ধাড়া, ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, হরিদাস মিত্র প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত লড়াইটা চলল সুশীল ধাড়া এবং নলিনাক্ষ সান্যালে। সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সুশীল ধাড়ার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা সোজাসুজি বললেন, না, সুশীল ধাড়াকেই মন্ত্রী করতে হবে। ঘুরিয়ে জানালেন, নলিনাক্ষ সান্যালের যা রেপুটেশন তাতে তাঁকে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী করা চলে না। ওদিকে সুকুমার রায় এবং নির্মল মুখোপাধ্যায়ও তখন সুশীলবাবুর পক্ষে। সুশীলবাবু তাঁদের সাহায্য চেয়েছিলেন।[১] তাঁরা দলের বিভিন্ন জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের সই-সহ এক চিঠি দিলেন অজয়বাবুর হাতে : সংগঠনের স্বার্থে সুশীল ধাড়াকে মন্ত্রী করতে হবে।

---

[১] সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০।

সুশীল ধাড়াকে মন্ত্রী করতে অজয়বাবুর কোনও দিনই আপত্তি ছিল না। এই চিঠি তাঁর হাতে আরও শক্তি জোগালো। তিনিও রায় দিলেন, সুশীলই আমাদের পার্টির থার্ড মন্ত্রী।[১০]

কিন্তু নলিনাক্ষ সান্যাল অত সহজে ছাড়ার পাত্র নন। একদিন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে তিনি রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। সব দলের নেতাদের উদ্দেশ করে বললেন, যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা আছে তাঁদের কেন মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে? পরে এইসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারী বের হলে সবাইকার মুখ থাকবে কোথায়? ডঃ সান্যালের বিস্ফোরণ দেখে সকলেই থ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই তাঁর বক্তব্যকে তেমন আমল দিলেন না। সবাই বুঝলেন, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি অজয়বাবু সুশীল ধাড়াকেই চান। সুতরাং, সুশীল ধাড়াই মন্ত্রী হলেন।

আগেই বলেছি, মন্ত্রিত্ব নিয়ে প্রায় সব পার্টিতেই কিছু না কিছু গণ্ডগোল ছিল। কিন্তু কোথাও ব্যাপারটা বেশি দূর এগোতে পারল না। কারণ, মন্ত্রিসভাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

দফতর বণ্টন নিয়েও ১৯৬৭ সনে খুব বেশি ঝামেলা হতে পারেনি। তারও একটা বড় কারণ দ্রুততা। দ্বিতীয় কারণ, কোনও দলেরই তখন রাইটারস বিল্ডিংস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁরা কেউই বড় একটা জানতেন না, কোন্ দফতরের গুরুত্ব কতটা।

কবির সাহেব প্রথমেই জ্যোতিবাবুকে বলেছিলেন, স্বরাষ্ট্র দফতর মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই থাকবে। সি. পি. এমও সেবার স্বরাষ্ট্র পাবেন বলে আশা করেননি।[১১] ফরওয়ার্ড ব্লকের দাবি ছিল, হোম অজয়বাবুর হাতেই রাখতে হবে।[১২] সি. পি. এম দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকেই স্থির করে ফেলেছিলেন, তাঁদের দল থেকে মন্ত্রী হবেন জ্যোতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু এবং আবদুল্লাহ রসুল। তাঁরা আরও সিদ্ধান্ত করেছিলেন, জ্যোতিবাবুর জন্য অর্থ এবং হরেকৃষ্ণবাবুর জন্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর চাওয়া হবে।

সি. পি. এম তাই চাইলেন। পেয়েও গেলেন। সি. পি. এমকে অর্থ দফতরও দেওয়া উচিত, নয়, এমন একটা কথাও কেউ কেউ বললেন। কিন্তু এ আপত্তিকে বড়রা কেউই আমল দিল না। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দফতরের উপর বিশ্বনাথবাবুর একটু লোভ ছিল। কিন্তু হরেকৃষ্ণবাবু দাবিদার দেখে তিনিও বললেন, "কেষ্ট যখন নেবে, তখন আমার কিছু বলার নেই—ও ভূমি সমস্যা ভালই বোঝে।"[১৩]

এদিকে তখন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দফতরের আর একজন জোর দাবিদার হয়ে উঠেছেন। তিনি এস. ইউ. সি-র সুবোধ ব্যানার্জী। কিন্তু সুবোধবাবু ছোট

---

১০ সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০।

১১ হরেকৃষ্ণ কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৬-৭০।

১২ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

১৩ হরেকৃষ্ণ কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৫-৭০।

পার্টির নেতা। তাই অন্য কেউই তাঁর দাবি সমর্থন করলেন না। জোর করে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল শ্রমদপ্তর। শ্রমদপ্তর নিতে তখন কেউই রাজী নন। আর. এস. পি-র ননী ভট্টাচার্যকেও শ্রমদপ্তর নিয়ে ঝোলাঝুলি করা হল। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাতে রাজী হলেন না।

আরও একটা দপ্তর নিতে কেউই রাজী ছিলেন না। সেটা খাদ্য। সকলেরই ভয় ছিল, ওই দপ্তর নিলে আনপপুলার হতে হবে। ডঃ ঘোষ কিন্তু প্রথমেই খাদ্য চাইলেন। কবির সাহেব ডঃ ঘোষকে বললেন, "আপনি মুখ্যমন্ত্রী হন এটাই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনেকেই তাতে রাজী নন। আপনি যে কোনও পোর্টফোলিও বেছে নিন।" ডঃ ঘোষ ভেবে দেখার জন্য একদিন সময় চাইলেন এবং পরদিন জবাব দিলেন, "ফার্স্ট প্রেফারেন্স ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার; সেকেন্ড, এডুকেশন।"

ডঃ ঘোষ স্বেচ্ছায় খাদ্য নিতে রাজী জেনে বড় বড় পার্টির নেতারা হাঁফ ছাড়লেন। কিন্তু তাঁরা সেই সঙ্গে তাঁকে কৃষি দিতে অ-রাজী। ডঃ ঘোষ বললেন, "শুধু খাদ্য নিয়ে আমি দুর্নামের ভাগী হতে চাই না। আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে অর্থাৎ তণ্ডুল, ফল, মাছ, দুধ, শাকসব্জিতে স্বাবলম্বী হতে পারে। কৃষি দপ্তর হাতে নিয়ে এই জিনিসটা দেখিয়ে দিতে চাই। হয় আমাকে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার দাও। না হয়, শিক্ষা দাও।"

খাদ্য নিতে কেউই রাজী নন অথচ শিক্ষা দপ্তরের উপর অনেকেরই লোভ; সুতরাং সব দলই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডঃ ঘোষকে খাদ্যের সঙ্গে কৃষি দপ্তর ছাড়তে বাধ্য হলেন।

শিক্ষা চাইলেন সি. পি. এম। বললেন, আমরা সত্যপ্রিয় রায়কে শিক্ষামন্ত্রী করতে চাই। কয়েকটি দল ঘোরতর আপত্তি জানালেন। তাঁদের বক্তব্য, হারা ক্যান্ডিডেটকে মন্ত্রী করা অনুচিত। সত্যপ্রিয়বাবু সেবারই লোকসভায় দাঁড়িয়ে হেরেছেন। সুবোধবাবুর জন্য শিক্ষা চাওয়া হল। কিন্তু তাতে সি. পি. এমের আপত্তি। নানা কারণে সি. পি. এম অনিলা দেবীর নাম "পুশ" করলেন না। শেষ পর্যন্ত শিক্ষা পেলেন ওয়ার্কার্স পার্টির জ্যোতি ভট্টাচার্য। সবাই বললেন, ভালই হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে শিক্ষামন্ত্রী করা উচিত সিদ্ধান্ত।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর নিয়ে জাহাঙ্গীর কবির এবং সুশীল ধাড়াতে কিছুটা মন কষাকষি হল। শেষ পর্যন্ত কবির যখন দেখলেন তিনি বিরাট উন্নয়ন দপ্তরটা পেয়ে যাচ্ছেন, তখন খুশিই হলেন। সুশীলবাবুও শিল্প-বাণিজ্য পেয়ে সন্তুষ্ট।

সি. পি. এম স্বাস্থ্যও চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য আর নেওয়া হল না। কারণ, ডঃ নারায়ণ রায় কিছুতেই মন্ত্রী হতে চাইলেন না। জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু সবাই গিয়ে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু নারায়ণ রায়কে রাজী করানোই গেল না।[১৪] শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর পেলেন ননী ভট্টাচার্য। তবে, আর. এস. পি স্বাস্থ্য দপ্তর নেওয়ায় মোটেই উৎসাহী ছিলেন না।

আগেই বলেছি, রসুল সাহেব মন্ত্রী হবেন বলে সি. পি. এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী স্থির করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে মন্ত্রী হয়ে

[১৪] হরেকৃষ্ণ কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৫-৭০।

গেলেন নিরঞ্জন সেন। ব্যাপারটা খুব মজার। হরেকৃষ্ণবাবু ঘটনার যে বিবরণ দেন তা এই রকম : চূড়ান্ত পর্যায়ে দপ্তর বণ্টনের আলোচনা করতে করতে দেখা গেল, অর্থ এবং ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ছাড়া আমাদের হাতে যে দপ্তরটি পড়ছে তা হল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন। তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলের ছাতে মিটিং হচ্ছিল। সব দলের লোকই উপস্থিত। ওইখানেই আমি এবং জ্যোতিবাবু আড়ালে গিয়ে একটু আলোচনা করে নিলাম। আমাদের মনে হল, পার্টির রসুল সাহেব সম্পর্কে যত উঁচু ধারণাই থাক না কেন উদ্বাস্তুরা সবাই হয়ত একজন মুসলমানকে তাঁদের দপ্তরের মন্ত্রী করাটাকে ভাল ভাবে নেবেন না। তাই ওইখানেই আমরা স্থির করলাম, নিরঞ্জনদা মন্ত্রী হবেন। পরে অবশ্য আমরা ভেবে দেখেছি, এ আশংকা অহেতুক ছিল। আমরা তখন ভুল করেছিলাম।[১৫] জ্যোতিবাবু অবশ্য বলেছেন যে, গোড়া থেকেই তাঁদের ঠিক ছিল নিরঞ্জন সেন মন্ত্রী হবেন।[১৬]

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ,দপ্তর বণ্টনের ব্যাপারটা নির্ঝঞ্ঝাটেই হল। সেটা নিয়ে জোর গণ্ডগোল হল তা স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারসিপ।

ডঃ নলিনাক্ষ সান্যালের যখন মন্ত্রী হওয়া হল না তখন তিনি স্পীকার হতে চাইলেন। তাঁর এই দাবি সমর্থন করলেন কবির সাহেব, জ্যোতিবাবু এবং ত্রিদিব চৌধুরী। জ্যোতিবাবুর যুক্তিটা ছিল : খুব স্টর্মি হাউস হবে। ওসব বিজয় ব্যানার্জী সামলাতে পারবেন না। নলিনাক্ষ সান্যালকে স্পীকার না করলে হাউস চলবে না।[১৭] সি. পি. আই এবং ফরোয়ার্ড ব্লক স্পীকার পদে বিজয় ব্যানার্জীর নাম করলেন। বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়ারাও নলিনাক্ষ সান্যালের নামে আপত্তি জানালেন।

বেশ কয়েকদিন নেপথ্যে এবং প্রকাশ্যে বহু আলাপ আলোচনার পর স্থির হল, হ্যাঁ, বিজয়বাবুই স্পীকার হবেন। এই ব্যাপারে সি. পি· আই-এর অবদান বোধহয় সবচেয়ে বেশি।

তখন প্রশ্ন উঠল, ডেপুটি স্পীকার কাকে করা?

ফরোয়ার্ড ব্লক চাইলেন, অপূর্ব মজুমদারকে ডেপুটি স্পীকার করতে। অপূর্ববাবু মন্ত্রিত্ব না পেয়ে চটে ছিলেন। দলের নেতারা তাঁকে ডেপুটি স্পীকার করে খুশী রাখতে চাইলেন। অপূর্ববাবু কিন্তু প্রথমে ডেপুটি স্পীকার হতে রাজী হলেন না। বহু অনুরোধ উপরোধ চলল। জ্যোতিবাবুও তাঁকে অনুরোধ জানালেন। জ্যোতিবাবু তাঁকে বললেন : দেখছেন তো, বিজয়বাবু স্পীকার হবেন। আপনি ডেপুটি স্পীকার না হলে যে হাউসই চালানো কঠিন হবে।[১৮]

শেষ পর্যন্ত অপূর্ববাবু যখন রাজী হলেন তখন দেখা গেল বাংলা

---

[১৫] সাক্ষাৎকার ২৫-৫-৭০।

[১৬] সাক্ষাৎকার ২-৫-৭০।

[১৭] সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০। জ্যোতিবাবু পরে আমাকে বলেছেন, "এটা আমার রাজনৈতিক জীবনের একটা বড় ভুল। তখন আমার বক্তব্য অনুসারে সিদ্ধান্ত হলে পরে বাংলাদেশের রাজনীতি অন্যভাবে এগোতো।" সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০।

[১৮] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

কংগ্রেসেরও একজন প্রার্থী আছেন। তাঁদেরও একই সমস্যা। মন্ত্রী না হওয়ায় হরিদাস মিত্র ক্ষুব্ধ। দল থেকে অর্থাৎ সুশীলবাবুরা চেষ্টা করলেন তাঁকে ডেপুটি স্পীকার করে খুশী রাখতে। তাই ডেপুটি স্পীকার পদে তাঁর নামও এল।

অনেক আলাপ আলোচনার পরও কোনও পক্ষই দাবি ছাড়তে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত তাই ভোটাভুটি হল। ভোটে হরিদাসবাবু জিতলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক তখন দুজন মন্ত্রী এবং চিফ হুইপ পদ পেয়ে গিয়েছেন। এর উপর তাঁদের আবার ডেপুটি স্পীকারী দিতে অনেক দলেরই আপত্তি ছিল। যুক্তফ্রণ্টে এই প্রথম ভোটাভুটি।

মন্ত্রীদের নাম এবং এবং দপ্তর বণ্টন চূড়ান্ত হওয়ার আগেই কিন্তু ছ'জন মন্ত্রী শপথ নিয়ে নিলেন। সেদিন ২রা মার্চ। আমার এখনও মনে আছে, রাজভবনের সামনে এবং রাইটার্স বিল্ডিংসে কি বিরাট ভিড়। হাজার হাজার মানুষ ছুটে এলেন নতুন মন্ত্রীদের দেখতে। তাঁদের চোখে মুখে আশা, ভরসা, উদ্দীপনা। সকলেরই এক কথা—এবার বাঙলা দেশের ভাল হবে। মঙ্গল হবে।

রাজভবনে শপথ নিয়ে রাইটার্সে এসে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে সবাই বসলেন। আমি সেদিন টেপ রেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলাম। ছ'জন মন্ত্রীকেই একে একে জিজ্ঞেস করলাম, কি করতে চান বলুন। কেমন লাগছে শুনতে চাই।

সবাই বললেন : আমরা বাঙলাদেশের ভাল করতে চাই। আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। আমরা সংঘবদ্ধভাবে জনগণের মঙ্গলের চেষ্টা করব।

৪ঠা আরও দশজন মন্ত্রী শপথ নিলেন।

৬ই যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক বসল। প্রথম প্রধান আলোচ্য বিষয় খাদ্য।

সেই সুরু।

যাত্রা সুরু

প্রথম প্রথম একেবারে ভাই-ভাই ভাব। দলে দলে, মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে, ভেতরে ও বাইরে মধুর সম্পর্ক। বাইরে থেকে দেখেশুনে মনে হতে লাগল, এই জোট পাঁচ বছর কেন, অনায়াসে দশ বছর টিকে যাবে। প্রথম ব্যাচের মন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার আগের দিন কলকাতায় মণ্টুমেণ্টের নীচে বিরাট জনসভা হল। জনগণের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নেতারা সবাই একে একে প্রতিশ্রুতি দিলেন : অনেক ঝগড়াঝাঁটি করেছি। আর নয়। এখন থেকে সকলে এক হয়ে চলব। বাঙলা দেশের মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের চেষ্টা করব।

যুক্তফ্রণ্ট ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুমায়ুন কবির ইউরোপ চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বন্ধুবান্ধবদের বলে গেলেন, “আজ বাংলা দেশে যা করে দিয়ে গেলাম ভবিষ্যতে ভারতেও তাই হবে। এই সুরু হল যুক্তফ্রণ্ট রাজনীতির যুগ। সমগ্র ভারতবর্ষ এই রাজনীতিকে অনুসরণ করবে।”

অজয়বাবুর মনেও বিরাট আশা। মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি সহ যেদিন প্রথম তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন সেদিন রাত্রেই আনন্দবাজার পত্রিকার একজন রিপোর্টার তাঁর সঙ্গে স্পেশাল ইণ্টারভ্যু নিলেন। অজয়বাবু বললেন, “নীতিগত বিরোধ ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমরা সবাই জনগণের মঙ্গল-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। করবও তাই।”

দিন কতক পরে[১] অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু এবং ডঃ ঘোষ দিল্লি গেলেন। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কর্ণধাররূপে সেই তাঁদের প্রথম দিল্লি গমন। দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন হল। সাংবাদিকরা দলে দলে সমবেত। অজয়বাবু ঘোষণা করলেন : যুক্তফ্রণ্ট যে সব দল নিয়ে গঠিত হয়েছে সবাই কয়েকটি লক্ষ্যের ব্যাপারে একমত হয়েছি। সেইসব লক্ষ্যের প্রতিটিকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। এই ঐকমত্য ফ্রণ্টের শরিকগুলির অনুসৃত আদর্শের ঊর্ধ্বে। এই ঐকমত্যের কাছে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের স্থান দ্বিতীয়। আমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে এইসব লক্ষ্যে পেঁছতে না পারি ততক্ষণ আমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটবার কোনও কারণ দেখা দেবে না। এবং লক্ষ্যে পেঁছবার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ বাধা হবে না।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা পাঁচ বছর টিকে থাকবই।[২]

এই সাংবাদিক বৈঠকে জ্যোতিবাবু এবং ডঃ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। অজয়-বাবুর বক্তব্যকে তাঁরা পুরোপুরি সমর্থন জানালেন।

---

[১] ২৩-২-৭০।

[২] আনন্দবাজার পত্রিকা।

সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিরাট আশা ভরসা। অনেকেই মনে করলেন, এবার বাংলা দেশের ভাল হবে। ধরে নিলেন, এখন থেকে বড়লোকের কর্তৃত্ব কমবে, গরীবের মর্যাদা বাড়বে, দুর্নীতি বন্ধ হবে, জিনিসপত্রের দাম কমবে এবং সব মিলিয়ে বেশ একটা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করা যাবে।

যাঁদের জনগণ বলা হয় অর্থাৎ ট্রামে বাসে, অফিসে কাছারিতে যাঁরা গলা ফাটিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন, তাঁরা তো আহ্লাদে একেবারে আটখানা। বীরদর্পে বলে বেড়াতে লাগলেন : এবার পাপ বিদায় হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে স্বর্গ-রাজ্য কায়েম হল বলে!

এতদিন যাঁরা উঠতে বসতে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের শ্রাদ্ধ করেছেন, বলেছেন, দেশের সব দুঃখ দুর্দশার জন্য কংগ্রেসই দায়ী, তাঁরাও সকলেই ধরে নিলেন এবার তাঁদের প্রত্যেকেরই ভাল হবে—প্রতিটি মানুষের অভাব অভিযোগ মিটে যাবে। অ-কংগ্রেসী দলগুলির দীর্ঘদিনের কথাবার্তাও সেই ধারণার সৃষ্টি করেছিল।

এই রকম একটা পরিবেশের মধ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কাজ সুরু হল। পরিবেশটা একদিক দিয়ে খুব ভাল। আর এক দিক দিয়ে মারাত্মক। জনগণ সরকারের সঙ্গেই। কিন্তু সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা খুব বেশি। লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করছেন, যুক্তফ্রণ্ট সরকার তাঁদের সব দুঃখের অবসান ঘটাবে। অথচ, সরকার ও জনগণ কেউ জানেন না কী করে তা করবেন!

যাঁরা সরকার চালাতে বসলেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও প্রায় শূন্য। অজয়বাবু এবং ডঃ ঘোষ ছাড়া আর কেউই এর আগে প্রশাসন ব্যবস্থাকে দেখেননি। রাইটার্স বিল্ডিংস কী বস্তু তা একেবারেই জানেন না। বিরোধী পক্ষে থাকতে থাকতে তাঁদের এমন কতকগুলি ধারণা হয়ে গিয়েছিল, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁরা সেইসব ধারণা নিয়েই গদীতে বসলেন এবং প্রথম প্রথম সেইসব ধারণামতই কথাবার্তা বলে চললেন।

মন্ত্রীরা প্রথম ধাক্কা খেলেন খাদ্য নিয়ে। প্রথম ক্যাবিনেটেই খাদ্য প্রধান আলোচ্য বিষবস্তু। আলোচনায় বসেই মন্ত্রীরা দেখলেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে। কিন্তু ছাড়বার পাত্র তাঁরা নন। মনে বিরাট উৎসাহ। টাটকা টাটকা প্রতিশ্রুতিগুলি তখনও কানে বাজছে। সবাইকে ভরপেটা ভাত খাওয়াতে কোনও অসুবিধা হতে পারে না, একথা তাঁরা বছরের পর বছর বলে এসেছেন। আর এখন? এখন কিনা অফিসাররা বলে রেশনে চাল কমাতে হবে! আগের সরকারের আমলে যে খাদ্যনীতি ছিল মোটামুটি তাই অনুসরণ করে চলতে হবে!

মন্ত্রীরা চটে উঠলেন। বললেন, হতেই পারে না!

পরদিনই আবার মন্ত্রিসভা বসল। আবার প্রধান আলোচ্য বিষয় খাদ্য। অনেক আলোচনা হল। কিন্তু তবু ফ্রণ্টের নেতাদের প্রতিশ্রুতি মত ঢালাও চাল দেওয়ার বা নতুন বৈপ্লবিক খাদ্যনীতি ঘোষণার কোনও পথই পাওয়া গেল না। অগত্যা

মন্ত্রীরা ঠিক করলেন, থাক, এখন এ ব্যাপারে কিছুই বলা হবে না। খাদ্য নিয়ে আরও আলোচনা হবে।

দ্বিতীয় দিনের বৈঠকেই কিন্তু মন্ত্রীরা হাততালি পাওয়ার মত দুটো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। প্রথম সিদ্ধান্ত, মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস। এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, মন্ত্রীদের ঘর থেকে ঠাণ্ডি যন্ত্র অপসারণ। ঠিক হল, যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী ৭০০ টাকা মাইনে নেবেন, আর অন্যান্য মন্ত্রীরা নেবেন ৫০০ টাকা। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে কোনও রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন না। সবাই পূর্ণমন্ত্রী।

জনগণ আবার জয়ধ্বনি দিল। মন্ত্রিসভার ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

এটা সাতই মার্চের ঘটনা। পরদিন রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন সুরু হল। সেখানেও আর একচোট প্রতিশ্রুতির বন্যা বইল। মন্ত্রিসভার পক্ষে রাজ্যপাল প্রতিশ্রুতি দিলেন: সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য এ সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এদিকে কিন্তু তখন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা বেশ টনটনে হয়ে উঠছে। একে সেবার ফসল ভাল হয়নি। তার উপর "নির্বাচনের মুখে কাউকে চটাবো না" নীতিতে চলে কংগ্রেস সরকারের প্রোকিওরমেণ্ট সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। করডনের কড়াকড়িও হয়নি। তাতে গ্রাম থেকে হু হু করে কলকাতায় চাল চলে এসেছে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকেই বিভিন্ন জেলা থেকে চাল গমের হাহাকারের খবর আসা সুরু হয়ে গেল। এই অবস্থায় নেতারা স্থির করলেন, সমগ্র পরিস্থিতিটা রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করতে হবে। সেইমত অবিলম্বে যুক্তফ্রণ্ট কমিটির মিটিং ডাকার ব্যবস্থা হল। সে মিটিং বসল ১০ই বিকালে। এইটাই যুক্তফ্রণ্ট কমিটির প্রথম বৈঠক।

বৈঠক বসল, দীর্ঘ আলোচনাও হল—কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না। বাস্তব অবস্থা ভয়ঙ্কর। বিরাট বিশাল কিছু করাও সম্ভব নয়। কিন্তু নেতারা এত শীঘ্র এই শোচনীয় পরিস্থিতির কথা জনগণকে জানাতে চাইলেন না। ঠিক হল, আবার আলোচনা হবে।

পরদিন আবার যুক্তফ্রণ্টের বৈঠক বসল। কিন্তু বহু আলোচনা করে এইদিনও কমিটি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না।

পনেরোই মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হল। নেতারা বললেন, রাজনৈতিক পর্যায়ে তো খাদ্য নিয়ে অনেক আলোচনাই হল। এবার সরকারী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। আর দেরি করা নয়। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ক্যাবিনেট মিটিং চলল। কিন্তু তাতেও মন্ত্রীরা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। শুধু এইটুকু স্থির হল, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। বাড়তি চাল গম চাইবেন। এবং তাঁদের আলোচনার পটভূমিকায় রাজ্যের খাদ্যনীতি চূড়ান্ত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী দিল্লি গেলেন বাইশে মার্চ। গিয়েই তাঁরা খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। খাদ্যমন্ত্রী তখন জগজীবন রাম। কংগ্রেসের রাজনীতিতে বাবুজী বলে পরিচিত। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা বলায় ভারতের রাজ-

নীতিতে বাবুজীর তুলনা নেই। বাবুজী পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। বিশেষ খাতির করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত বললেন: আমিও কলকাতারই ছেলে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে আমার চিরকালই একটা বিশেষ টান আছে। লেকিন কেন্দ্রের হাতে মজুত খাদ্যের অবস্থা খুব খারাপ। গত বছর কেন্দ্রীয় মজুত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন খাদ্য দেওয়া গিয়েছিল। এ বছর মাসে ৭০ হাজার টনের বেশি দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

বাবুজীর কথা শুনে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা তো একেবারে থ। তাঁরা কোথায় আরও বেশি চাইতে এসেছিলেন, আর খাদ্যমন্ত্রী বললেন কিনা আরও কম দেবেন! সবাই গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রীও একই কথা শোনালেন—কেন্দ্রের খাদ্যভাণ্ডারের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। যতটা পারব আমরা নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ।

•

•

খাদ্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো সমস্যা সৃষ্টি হল পশ্চিমবঙ্গে। মন্ত্রীরা গদীতে বসতে না বসতেই সে দুটো সমস্যাও প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। এর একটা ছাঁটাই, ক্লোজার এবং ঘেরাও-র সমস্যা। আর একটা জমি ও বাড়ি জবর দখলের সংকট। সরকার একেবারে সুরু থেকেই এই তিন সমস্যা নিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে উঠলেন।

গোটা ভারতেই তখন প্রচণ্ড শিল্প মন্দা। বিশেষ করে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে। পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। এর অধিকাংশই বাঙ্গালী। মালিকরা মন্দা দেখিয়ে ছাঁটাই সুরু করলেন। প্রথমে কম কম। তারপর বেশি বেশি। শ্রমিকরা তো মহা খাপ্পা। এত বড় স্পর্ধা, যুক্তফ্রণ্ট আমলেও ছাঁটাই! সুরু হল পাল্টা মার। শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন না, বিক্ষোভ মিছিলও বের করলেন না—তাঁরা ঘেরাও করলেন। ঘেরাও জিনিষটা এর আগেও যে বাঙ্গলা দেশে ছিল না তা নয়। তবে কম হত এবং সাধারণত বোনাস নিয়েই হত। ঘেরাও হতও বড় জোর চার-পাঁচ ঘণ্টার জন্য। কিন্তু এবার যে ঘেরাও হল তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল। প্রধানত হল কলকারখানায়। এর আগে ঘেরাও হত সাধারণত হেড অফিসগুলিতে। এবারের ঘেরাও-এ কোথাও কোথাও শ্রমিকরা অফিসারদের চড়-চাপড়ও বসিয়ে দিলেন। ঘেরাও থেকে বেরিয়ে বাথরুম পর্যন্ত যেতে দিলেন না। পুলিশও গেল না। কারণ, যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় বসেই ঘোষণা করেছেন, তাঁরা শ্রমিক-মালিক বিরোধে পুলিশ নিয়োগ করবেন না। শ্রম-মন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জী হুকুম দিয়েছেন: আমাকে না জানিয়ে কোনও শ্রমিক-মালিক বিরোধে পুলিশ যাবে না।

মালিকরাও ছাড়ার পাত্র নন। তাঁরাও মোক্ষম পাল্টা মার সুরু করে দিলেন। তাঁরা ঘেরাওয়ের জবাব দিলেন ক্লোজার দিয়ে। কারখানাকে কারখানা বন্ধ হওয়া সুরু হল।

এইভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার হপ্তা দু'তিনের মধ্যেই ছাঁটাই, ঘেরাও এবং ক্লোজার নিয়ে একটা প্রচণ্ড হইচই সুরু হয়ে গেল।

মালিকরা বললেন: শিল্পে প্রচণ্ড মন্দা। আমরা তাই কিছু কিছু ছাঁটাই

করতে বাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কলকারখানা চালাতে চাই। শ্রমিকরাই তা দিচ্ছে না। মারধর করছে। পুলিশকে জানিয়ে কোনও ফল হচ্ছে না। এ অবস্থায় কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

শ্রমিকরা বললেন: মালিকরা অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করছে। ওরা আসলে আমাদের এবং আমাদের সরকারকে জব্দ করতে চায়। ছাঁটাই বা ক্লোজারের সংগত কোনও কারণ নেই। সরকারের মধ্যে যাঁরা বিশেষ বামপন্থী তাঁরা মোটামুটিভাবে শ্রমিকদের হয়েই কথা বললেন। তবে, সংগে সংগে স্বীকার করলেন, শিল্পমন্দা আছে। কিন্তু বললেন, তার সমাধান ছাঁটাই বা ক্লোজার নয়। সরকারের মূল সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকল—শ্রমিক-মালিক বিরোধে শ্রমমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া পুলিশের হস্তক্ষেপ বন্ধই রইল।

মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা ততটা উগ্রবামপন্থী নন, তাঁরা একটু গুঞ্জন সুরু করলেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও ঘরোয়া আলাপ আলোচনায় বলা সুরু করলেন, একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! ঠিক এই সময় শ্রমমন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জী একটা বিবৃতি দিলেন: শ্রমিকদের সংযত হতে হবে। তাঁরা যেন কোনও প্ররোচনার ক্রীড়নক না হন। একতরফা ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তাঁরা যেন শ্রমদফতরের সংগে যোগাযোগ করেন।[৩]

কিন্তু তাতেও তেমন ফল হল না। ছাঁটাই, ঘেরাও এবং ক্লোজার চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলল। সুবোধবাবুর বিবৃতি বের হওয়ার তিনদিন পরেই ইনজিনিয়ারিং শিল্পমালিকদের এক প্রতিনিধিদল এলেন মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করতে। অজয়-বাবু আলোচনার সময় সোমনাথ লাহিড়িকে ডেকে নিলেন। কয়েকটা সিদ্ধান্ত হল এই বৈঠকে। প্রথম সিদ্ধান্ত, শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য শীঘ্রই সরকার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আয়োজন করবেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার আগে মালিকরা কোথাও ছাঁটাই, লক আউট বা ক্লোজার করবেন না। তৃতীয় সিদ্ধান্ত, হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থা নেবেন।

এই বৈঠক হল বিশে। তেইশেই আবার বিভিন্ন বণিকসভা ও শিল্পসংস্থার মালিকরা রাইটারস বিলডিংসের রোটাণ্ডা হলে শ্রমমন্ত্রীর সংগে এক আলোচনা বৈঠকে বসলেন। সুবোধবাবু মালিকদের কাছে প্রস্তাব দিলেন: আপনারা কথা দিন সরকারকে না জানিয়ে ছাঁটাই বা লে-অফ করবেন না। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি ঘেরাও কমে যাবে।

বণিকসভার প্রতিনিধিরা শ্রমমন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

পশ্চিমবংগের ঘেরাও-র ব্যাপারটা নিয়ে ততদিনে গোটা দেশে হইচই সুরু হয়ে গিয়েছে। শিল্পপতিরা একেবারে গেল গেল রব তুলে দিয়েছেন। দিল্লির কর্তারাও খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। সুবোধবাবু যেদিন কলকাতায় শিল্প-পতিদের সংগে আলোচনা করছেন সেইদিনই মুখ্যমন্ত্রীরূপে অজয়বাবু দিল্লিতে প্রথম প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। জ্যোতিবাবু এবং ডঃ ঘোষও সেই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। স্বভাবতই রিপোরটাররা সেখানে ঘেরাও নিয়ে

---

[৩] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭-৩-৬৭।

অজয়বাবুকে নানা প্রশ্ন করলেন। মুখ্যমন্ত্রী ফ্রন্ট সরকারের শ্রমনীতি ব্যাখ্যা করে বললেন: আমরা চাই না, শ্রমিক বা মালিক কেউই নিজের হাতে আইন নিক, অথবা অবস্থার অবনতি ঘটাবার মত কিছু করুক। সালিশ এবং আপস ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার এই সমস্যা সমাধানে ব্রতী হবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বললেন, অরডারের অভাবে ইনজিনিয়ারিং শিল্পে যে মন্দা দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন।

যুক্তফ্রন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা যেমন মনে করলেন 'আমাদের রাজত্ব' সুরু হয়ে গিয়েছে, তেমনি শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের নানা ধরনের মানুষেরও বদ্ধমূল ধারণা হল তাঁরা সত্যিকারের 'স্বরাজ' পেয়ে গিয়েছেন। এই 'স্বরাজপ্রাপ্তির' উৎসাহে বিভিন্ন এলাকায় একদল লোক যার তার বাড়িঘর জমিজমা দখল করা সুরু করে দিলেন। স্বনামী জমি দখল হল, বেনামী জমি দখল হল, সরকারী জমি দখল হল, বে-আইনী জমি দখল হল, মায় কলকাতা শহরে ইমপ্রুভমেনট ট্রাস্টের ফ্লাট পর্যন্ত দখল সুরু হল।

তখনও কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্ত মত "লুকনো জমি উদ্ধার" অভিযান সুরু হয়নি। যাঁরা যা করছিলেন প্রধানত ব্যক্তিগত উৎসাহে এবং মতলবে। সরকার এই ঘরবাড়ি-জমিজমা দখলের উৎসাহের বন্যা দেখে প্রমাদ গণলেন। তাঁরা বুঝলেন, এ জিনিস সুরুতেই বন্ধ না হলে কেলেঙ্কারী হবে। ফ্রন্টের ভেতরের বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকেও চাপ এল।

বাধ্য হয়ে পঁচিশে মার্চ মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেওয়া হল, "কলকাতা, ২৪ পরগণা ও রানাঘাট প্রভৃতি এলাকা থেকে খবর আসছে যে সরকারী কিংবা সাধারণ লোকের ও কলকাতা ইমপ্রুভমেনট ট্রাসটের বাড়ি ও জমি কতকগুলি লোক জবরদখল করছেন বা করার চেষ্টা করছেন। আমাদের অনুরোধ, কেউ যেন এরকম বে-আইনী কাজ না করেন। আইনসঙ্গতভাবে কারু কোনও দাবি থাকলে আমাদের কাছে জানালে আমরা তার সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। কিন্তু বে-আইনীভাবে জবরদখল করলে আইনের ও পুলিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব।...যারা ভুল বুঝে বা অন্য কোনও কারণে জবরদখল করেছেন তাঁরা যেন অবিলম্বে এরূপ বাড়ি বা জমি ছেড়ে দিয়ে যান।"[৪]

কিন্তু বহু আলাপ আলোচনা, আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট সরকার কোনও ফ্রন্টে তেমন কোনও সুরাহা করতে পারলেন না। বরং খাদ্যসংকট এবং ছাঁটাই ঘেরাও ক্লোজারের সমস্যা দিন দিনই তীব্র হয়ে উঠল।

মন্ত্রীরা এবং দলগুলিও ক্রমে ক্রমে দেখলেন, বাইরে থেকে রাজ্য চালনা যত সহজ বলে মনে হয় আসলে ব্যাপারটা মোটেই তত সহজ নয়। মনে ভাবলেই বা করব বললেই যে কোনও কাজ করা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে যাকে খুব

[৪] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬-৩-৬৭।

সহজ বলে মনে হয়, কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় তা-ই অত্যন্ত কঠিন।

ইতিমধ্যে জনগণের মনেও নানা রকমের প্রশ্ন দেখা দিল। বলব না, মাস দেড় দুই-র মধ্যেই তাঁরা সরকার সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তবে, এটা বোধহয় নির্ভয়েই বলা চলে যে, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা বুঝে গেলেন যে যতটা আশা করা গিয়েছে এই সরকার ততটা করে উঠতে পারবেন না। সোনার বাংলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা খুব ধীরে ধীরে বিলীন হতে আরম্ভ করল।

দিল্লি থেকে ফিরেও মন্ত্রীরা এবং ফ্রন্টের নেতারা বার বার খাদ্য নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু চালের দর বৃদ্ধি আটকাতে পারলেন না। হু হু করে দর বেড়েই চলল। বিভিন্ন অঞ্চলে বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে গেল। প্রথমে কতকগুলি এলাকায় জনগণ নিজেই সরকারকে "সাহায্য" করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা নিজে থেকেই "গোপন মজুত" উদ্ধারের অভিযানে নেমে পড়লেন। মন্ত্রীরা কেউ কেউ প্রথম প্রথম জনগণের এই অভিযানে বেজায় খুশী হলেন। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, এর ফলে ধানচাল আরও উধাও হয়ে যাচ্ছে। ফলে, উদ্ধার অভিযান আরও ব্যাপক হল এবং সাধারণত এসব ব্যাপারে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হল— মফঃস্বলে মজুত-উদ্ধার এবং চোরাই চালান বন্ধের নামে কিছু কিছু লুঠতরাজ এবং ব্যাপক হারে ধানচালের চলাচল অবরোধ সুরু হল। এইবার মন্ত্রীরা এবং যুক্তফ্রন্টের নেতারা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে উনত্রিশে মার্চ ডঃ ঘোষ বিধানসভায় সরকারের নতুন খাদ্যনীতি ঘোষণা করেছেন। লেভি ও আন্তর্জেলা করডন তুলে দেওয়া হয়েছে। ধানচালের সংগ্রহ মূল্য বাড়ানো হয়েছে। এবং, সরকার ভরতুকি দিয়ে রেশনে চালের দর অপরিবর্তিত রাখবেন বলে স্থির করেছেন।

তার কয়েকদিন পরেই মন্ত্রীরা জেলায় জেলায় ধানচাল সংগ্রহে বের হলেন। ডঃ ঘোষ ঘোষণা করলেন, "এটাই হবে আমাদের পপুলারিটির টেষ্ট।" তাতেও কিছু হল না। সে টেষ্টে মন্ত্রীরা ফেল করলেন। তখন সরকার কড়া হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আঠারই এপ্রিল ঘোষণা করা হল: চাল কলের উৎপাদনের সবটাই নিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু তাতেও বেশি কিছু হল না। কারণ, চাল কলে ধানচাল পাওয়াই গেল না। সাতদিন পরে আবার হুকুম বের হল: বি. ডি. ও বা খাদ্য দফতরের আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পঁচিশ মণের বেশি ধানচাল নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কিছুতেই কিছু হল না। ধানচালের দর এবং হাহাকার বেড়েই চলল। সঙ্গে সঙ্গে ডাল, তেল, তরিতরকারির দরও বাড়ল। বিভিন্ন এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। পার্টিগুলির আঞ্চলিক কমিটির লোকজনেরাও কর্তাদের চাপ দিতে লাগলেন। এই অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট কমিটি সরকারকে একেবারে মিলিটারি মেজাজে হুকুম দিলেন: মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করুন। গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ করুন।

কিন্তু করুন বললেই যে সব কাজ করা যায় না, ততদিনে মন্ত্রীরা তা বুঝে গিয়েছেন। তাঁরা অফিসারদের সঙ্গে বার বার আলোচনা করলেন। তারপর নিজেদের মধ্যেও বহু তর্ক বিতর্ক চলল এবং অবশেষে এগারই মে ঘোষণা হল

৮৬'০৬
সেন
2883.

যে, সরকার রাজ্যব্যাপী ব্যাপক মজুত উদ্ধার আন্দোলন চালাবেন। লুকনো সব ধানচাল বের করে আনা হবে এবং এ ব্যাপারে নবগঠিত খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি অফিসারদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তাঁরা মজুতের খবর অফিসারদের জানাবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে বিভিন্ন জেলার খাদ্য ও ত্রাণ কমিটি নিজেদের মধ্যেই একমত হতে পারলেন না। একদল যাঁর নাম দেয়, আর একদল তাঁকেই সাধু বলে সার্টিফিকেট দেয়!

তাই তাতে তেমন কিছুই হল না। সর্বপ্রকার চেষ্টা করে ফ্রন্ট সরকার মাস চারেকের মধ্যে মাত্র লাখ বার টাকার লুকনো ধানচাল ধরতে পারলেন!

ততদিনে কিন্তু রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রামাঞ্চলে চাল আটার হাহাকার পড়ে গিয়েছে। চালের কিলো পাঁচ টাকা। বিভিন্ন এলাকায় লুঠতরাজ সুরু হয়েছে। ফ্রন্টের দলগুলিই খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো সুরু করেছেন। বিভিন্ন এলাকায় ট্রেন, যানবাহন আটক করা হচ্ছে। মন্ত্রীদের ছুটে গিয়ে গিয়ে আশ্বাস দিয়ে দিয়ে সেইসব অবরোধ তুলতে হচ্ছে।

এই যখন অবস্থা তখন কয়েকটি দলের নেতারা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তাঁরা প্রথমে মৃদুভাবে এবং পরে কড়া সুরে খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করে দিলেন। বলতে চাইলেন, এই খাদ্য সংকটের জন্য ডঃ ঘোষই দায়ী। তাঁরা এমনও বললেন যে, ডঃ ঘোষই চোরাকারবারীদের ধরছেন না। (যদিও তখন স্বরাষ্ট্র দফতর অজয়বাবুর হাতে এবং আঞ্চলিক খাদ্য ও ত্রাণ কমিটিগুলি ধানচালের চোরাই মজুতদারদের কোনও তালিকা দেয়নি।) ফ্রন্টের অনেকেই প্রফুল্ল ঘোষকে নন্দ ঘোষ সাজাতে চাইলেন!

ডঃ ঘোষের উপর তাঁরা আরও একটা কারণে চটেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, ডঃ ঘোষ বলুন যে, কেন্দ্র ষড়যন্ত্র করে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য দিচ্ছে না, তাই এই সংকট। কিন্তু ডঃ ঘোষ তা বলতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "তা কেন কমু"।

ডঃ ঘোষ-বিরোধী এই প্রচার অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন সি. পি. এম। তাঁদের সভা, শোভাযাত্রায় ডঃ ঘোষ-বিরোধী শ্লোগান শোনা যেতে লাগল। দলীয় মুখপত্রে সরকারী খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা সুরু হল। এবং শেষপর্যন্ত পঁচিশে মে দলের সর্বভারতীয় নেতা পি. সুন্দরায়া দার্জিলিং-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলে বসলেন, "ডঃ ঘোষের পদত্যাগ করা উচিত, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।"

ব্যস, আর যায় কোথায়! এতদিনে সব মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিটা বেশ গরমই হয়েছিল। সুন্দরায়ার এই মন্তব্যে একেবারে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। অজয়বাবু তখন উত্তরবঙ্গে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে অজয়বাবুও জবাব দিলেন, "সুন্দরায়া ডঃ ঘোষের পদত্যাগ দাবি করার কে? ডঃ ঘোষ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী। এবং যুক্তফ্রন্টের আস্থাভাজন বলেই তিনি মন্ত্রিসভায় আছেন।"[৩]

জবাব দিতে ডঃ ঘোষও ছাড়লেন না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর মত অতটা কড়া

---

[৩] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯-৫-৬৭।

ভাষা তিনি প্রয়োগ করলেন না। তিনি বললেন, "সুন্দরায়ার উক্তি অসংগত। এই খাদ্যনীতি যুক্তফ্রন্টের অঙ্গীভূত সকল দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে। সকল দলেরই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং এর দায়িত্ব কোনও এক ব্যক্তি বা দলের একক নীতি নয়।"[৬]

এদিকে ছাঁটাই-ঘেরাও-ক্লোজার নিয়েও ততদিনে পরিস্থিতিটা বেশ সঙ্গীন। বার বার আলাপ আলোচনা হল। সরকারে শ্রমিকে, মালিকে সরকারে, সরকারে শ্রমিক মালিকে—নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথা হল। কিন্তু আসলে কিছুতেই কিছু হল না। যতবার আলোচনা হয়, যতবার সাময়িক চুক্তি হয়, ততবারই তা ভেঙ্গে যায়। মালিকরা বললেন, শ্রমিক পক্ষ চুক্তি না মেনে অহেতুক ঘেরাও করছে, মারধরও চালাচ্ছে। শ্রমিকরা বললেন, মালিকরা চুক্তি ভেঙ্গে ছাঁটাই, লক-আউট, ক্লোজার পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে।

ফলে সব মিলিয়ে ছাঁটাই, ঘেরাও এবং ক্লোজার ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলল।

এদিকে সরকারের মূল নীতিটি কিন্তু তখনও অটুট। কোনও শিল্পবিরোধে শ্রমমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া পুলিশ যাবে না—সরকার এই সিদ্ধান্তে অবিচল।

এই সিদ্ধান্তটি প্রথম ভাঙ্গলেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরপাড়ায় পাশাপাশি দুটি কারখানায় শ্রমিকরা ছ'জন অফিসারকে পর পর ছ'দিন আটক রাখার পর মুখ্যমন্ত্রী নিজে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন: ওদের উদ্ধার করে নিয়ে এস।[৭]

কিন্তু তখনও এটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। তখনও ঘেরাও থেকে উদ্ধার করতে পুলিশ যায় না।

এই অবস্থায় মালিকরা একেবারে ত্রাহি রব ছাড়লেন। এবং, বড়লোকের বড় চিৎকার বলে সেই রবে গোটা ভারত কেঁপে উঠল। মালিকরা বললেন, এ যা হাল হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে আর বসবাসই করা যাবে না। এ রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ল বলে। পশ্চিমবঙ্গের ঘোরতর দুর্দিন অনিবার্য।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। চিন্তিত হলেন অন্যান্য মন্ত্রীরাও। সবাই মিলে চেষ্টা তদবির করে তেরই এপ্রিল রোটাণ্ডায় এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বসালেন। সেই বৈঠকে স্থির হল: লে-অফ, ছাঁটাই এবং বন্ধের সমস্যা বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হবে। কমিটি নিয়োগ সাপেক্ষে এই রাজ্যে শিল্পবিরোধের ক্ষেত্রে সাময়িক শান্তি পালিত হবে। এই সময় একদিকে যেমন কোনও ছাঁটাই, লে-অফ হবে না, অন্যদিকে তেমনি ঘেরাও-ও হবে না।

কিন্তু তবু কিছু হল না। ছাঁটাই এবং ঘেরাও দুই-ই চলল। চব্বিশে এপ্রিল চারটি চেম্বার্স অফ কমার্সের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জরুরী চিঠি দেওয়া হল: ছাঁটাই ও লে-অফের ঘটনাগুলি পরীক্ষা করার জন্য অবিলম্বে একটি কমিটি গঠন করুন। তাঁরা আরও বললেন, তেরোই-র চুক্তির পরও একুশটি ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটেছে—যদিও এর উনিশটির সঙ্গে ছাঁটাই বা লে-অফের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

চৌঠা মে আবার ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বসল। মূল আলোচ্য বিষয় সেই কমিটি

৬ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯-৫-৭০।

৭ ২৭-৩-৬৭।

গঠন। কিন্তু এই বৈঠকে কমিটির গঠন এবং তার ক্ষমতা নিয়ে শ্রমিক ও মালিকে জোর মতবিরোধ দেখা দিল। ফলে কিছুই হল না। ছাঁটাই-ও চলল, ঘেরাও-ও চলল।

ইতিমধ্যে কিন্তু ঘেরাও নিয়ে ফ্রন্ট এবং মন্ত্রিসভার মধ্যেও বেশ কিছুটা মতভেদ দেখা দিয়েছে। এবং সেই মতবিরোধ প্রকাশ্যেও বেরিয়ে পড়েছে। ঘেরাও-ও আর শুধু প্রাইভেট সেকটরে সীমাবদ্ধ নেই। পাবলিক সেকটরেও চলে এসেছে। স্কুল কলেজকেও ঘেরাও তখন স্পর্শ করেছে।

এইসময় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে সুশীল ধাড়া অজয়বাবুকে এক চিঠি দিলেন, "সরকারী কলকারখানাগুলিতে যেন ঘেরাও না সহ্য করা হয়।" যেদিন খবরের কাগজে এই চিঠির খবর বের হল সেইদিনই সেই সঙ্গে এ সংবাদও প্রকাশিত হল যে, পি. এস. পি-র জাতীয় পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের ঘেরাও অভিযানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম মন্ত্রী নিশীথ কুন্ডুও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনটা হয়েছিল বাঙ্গালোরে। পরদিন স্বয়ং নিশীথ কুন্ডুও বাঙ্গালোরে প্রেস কনফারেনস করে বললেন: আমি ব্যাপারটা কেবিনেটে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব। দলগুলি ঘেরাওয়ের মাধ্যমে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করছে।[৮]

তখনও সরকারী পর্যায়ে শিল্পে শান্তি আনার চেষ্টা চলছে। ষোলই মে রাইটারস বিলডিংসে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে মন্ত্রীরা দফায় দফায় বৈঠক করলেন। সরকার আবার প্রস্তাব করলেন, ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট ইত্যাদি বিবেচনার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করা হোক। একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হোন। কমিটির ক্ষমতাবলী সম্পর্কেও সরকার কতকগুলি প্রস্তাব দিলেন। মালিকরা বললেন, সাতদিনের মধ্যে তাঁরা লিখিতভাবে মতামত জানাবেন।

এই সাতদিনের মধ্যেই কিন্তু গঙ্গার জল অনেক দূর বয়ে গেল। উনিশে মার্চ চবন সাহেব কলকাতা এলেন। সেইদিনই তিনি বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় ঘেরাওয়ের বিরুদ্ধে কড়া কড়া কথা বললেন। পরদিন একেবারে প্রেস কনফারেনসেই মন্তব্য করলেন, "ঘেরাওয়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে এবং নিরাপত্তা-বোধের অভাব দেখা দিয়েছে।"

পরদিনই পাঁচটি চেম্বার একযোগে মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীকে জানালেন: আগে ঘেরাওকে বে-আইনী ঘোষণা করুন। তারপর অন্যকথা।

প্রধানমন্ত্রী ঘেরাও সম্পর্কে প্রকাশ্যে তাঁর মতামত জানালেন এরই পরদিন। দিল্লিতে তিনি দলের এম. পি-দের এক বৈঠকে বললেন, "ঘেরাও অরাজকতা সৃষ্টি করছে, শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে। চবন পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম থেকে ফিরে এলে কি করা যায় তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।"[৯]

অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হল। শ্রমিকরাও ছাড়বে না, মালিকরাও দমবে

---

[৮] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮-৫-৬৭।

[৯] আনন্দবাজার পত্রিকা ২২-৫-৬৭।

না। ঘেরাও ততদিনে কলকারখানা অফিস-কাছারি ছাড়িয়ে মালিকদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিক্ষুব্ধ। তাঁর দল বিক্ষুব্ধ। অন্য আরও কয়েকটি দলও ঘেরাওয়ের বাড়াবাড়ি নিয়ে খাপ্পা। ঘেরাও সংকট বেশ ভাল ভাবেই যুক্তফ্রন্টকে স্পর্শ করল। নেতারা দেখলেন, একটা কিছু করতেই হয়।

দোসরা মে যুক্তফ্রন্ট শুধু ঘেরাও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন। একদিনে দু' দফা বৈঠক হল। কিন্তু তাতেও সর্বসম্মত কোনও সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া গেল না।

এইভাবে খাদ্য সংকট এবং ঘেরাও নিয়ে যখন ফ্রন্ট সংকট বেশ ঘনিয়ে এসেছে তখন বর্ষা প্রায় এসে গেল। জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় এল। কতগুলি অঞ্চলে বেশ জোরদার জমি দখল আন্দোলন সুরু হল। চব্বিশ পরগণায়ই ঝামেলাটা হল সবচেয়ে বেশি। কিছু কিছু খুন-খারাপিও আরম্ভ হল।

তারপরই এল নকশালবাড়ি। ইতিমধ্যে তপশিলী মন্ত্রী নিয়োগ নিয়েও ফ্রন্টে বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। অজয়বাবু চাইছিলেন তপশিলীদেরও একজনকে মন্ত্রী করতে। এস. এস. পিও সেজন্য এরকম একটা আলটিমেটামই দিয়ে বসেছিল। প্রশ্নটা যখন চূড়ান্ত ভাবে এল তখন সি. পি. এম বললেন, মন্ত্রী বাড়ানো চলবে না। অন্য অনেকে বললেন, না, একজন তপশিলী মন্ত্রী নিতেই হবে। ভোট হল ফ্রন্টে। সি. পি. এম হেরে গেলেন। তপশিলী মন্ত্রী নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল।

চব্বিশে মে প্রথম নকশালপন্থীরা পুলিশের উপর আক্রমণ চালালেন। চারজন পুলিশ আহত হল। পরদিন এদের মধ্যের একজন অফিসার মারা গেলেন। সেইদিনই পুলিশ গিয়ে নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে গুলি চালাল। পাঁচজন নারী এবং একজন শিশু মারা গেলেন।

পরদিন অজয়বাবু উত্তরবঙ্গ গেলেন। সেদিন আমিও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর ট্যুর কভার করতে। অজয়বাবুর সঙ্গে প্লেনে কিছু কথা বললাম। একেবারে ভেঙ্গে পড়া মানুষ। বললেন, দেখ, চেষ্টা তো করছি, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। পারব কিনা তাও জানি না।

সেইদিন রাত্রেই উত্তরবঙ্গের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা (দেওপ্রকাশ রাই, কমল গুহ, সুনীল দাশগুপ্ত প্রভৃতি) দার্জিলিংয়ে অজয়বাবুকে বললেন: আপনি যদি দৃঢ়হাতে হাল না ধরেন তাহলে উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। অজয়বাবু তাঁদের কথা দিলেন, তিনি আইন ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সব ব্যবস্থা নেবেন।

সাতাশে অজয়বাবু খোদ নকশালবাড়িতে জনসভা করে একই কথা আরও কড়া ভাষায় বললেন, "প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, ধন ও সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার আছে।...জমির মালিক গরিব বা বড় চাষী হোন, জবরদস্তি করে জমি দখল করা সমাজবিরোধী কাজ বলেই গণ্য হবে।"[১০]

---

[১০] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮-৫-৬৭।

অজয়বাবু ততদিনে বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর অভিযোগ প্রধানত সি. পি. এম সম্পর্কে। অজয়বাবু তখন কতটা উত্তপ্ত তাঁর সেই সময়কার একটা মন্তব্য থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী তখনও উত্তরবঙ্গে। প্রমোদবাবুও একদিন আগে ওই উত্তরবঙ্গে বসেই নকশালবাড়িতে পুলিশের গুলি চালনার নিন্দা করে এক কড়া বিবৃতি দিয়েছেন। এবং সেই বিবৃতির একটা অংশে বলেছেন যে, এর মধ্যে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র আছে। প্রমোদবাবুর এই মন্তব্য সম্পর্কে সাংবাদিকরা অজয়বাবুর বক্তব্য জানতে চাইলেন। মুখ্যমন্ত্রী খুব রেগে উত্তর দিলেন, "ওরা তো দুনিয়ার সব কিছুতেই ষড়যন্ত্র দেখেন। আমি তা দেখি না।"[১১]

নকশালবাড়ি নিয়েই মন্ত্রিসভায় প্রথম বড় রকমের মতভেদ দেখা দিল। কীভাবে নকশালী হামলার মোকাবিলা করা তা নিয়ে নানা দলের নানা মন্ত্রী নানা কথা বললেন। অজয়বাবু চাইলেন স্রেফ আইন ও শৃংখলার সমস্যা হিসাবে ব্যাপারটাকে দেখতে। সি. পি. এম, সি. পি. আই এবং আরও অনেকের তাতে ঘোরতর আপত্তি। অজয়বাবুর সমর্থক গোর্খা লীগ, এস. এস. পি, পি. এস. পি প্রভৃতি। সি. পি. আইর আবার ইচ্ছা ছিল, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে হইচই করানো। কারণ, আসলে নকশালপন্থী আন্দোলনের ব্যাপারটা সি. পি. এমেরই অন্তর্বিরোধ।

সরেজমিন তদন্তের জন্য দু-দুবার মন্ত্রী মিশন গেল নকশালবাড়িতে। সেই মিশনের সদস্যদের মধ্যেও হল জোর ঝগড়া। দুদল দুরকম রিপোর্ট দিলেন। দু দল দু রকম পথ বাতলালেন। মন্ত্রিসভায়ও এ নিয়ে অনেক অনেক আলোচনা হল। দারজিলিং-এর এস. পি. এবং ডি. এমের কাছে হরেকরকম নির্দেশ যেতে লাগল।

কাগজেপত্রেও তা বের হওয়া সুরু হল। জ্যোতিবাবু এবং সোমনাথ লাহিড়ি প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে মন্ত্রিসভায় নকশালবাড়ি নিয়ে সত্যিই মতভেদ আছে। যদিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বললেন, "যুক্তফ্রন্ট যুক্তই আছে।"[১২]

এইরকম যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অবস্থা ঠিক সেই সময় ধর্মবীর কলকাতা এলেন রাজ্যপাল হয়ে। নতুন রাজ্যপাল যেদিন শপথ নিলেন সেই দিনটি ১লা জুন।

---

[১১] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯-৫-৬৭।

[১২] আনন্দবাজার পত্রিকা ১-৬-৬৭।

লো ভে পা প

এবার আসনে আমরা একবার খোঁজ নিই, এতদিনে কংগ্রেস ভবনের কী অবস্থা। একাদিক্রমে কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর হঠাৎ ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেসীদের পরিস্থিতিটা কী?

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, কংগ্রেসীরা এ পরাজয় ভাবতেও পারেননি। তাঁরা সবাই বুঝেছিলেন, অবস্থা ভাল নয়। বিশেষ করে, ১৯৬৬ সনের রাজ্যব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভের পর কংগ্রেসী নেতারা বেশ কিছুটা আশংকিতই হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের মুখে যখন তাঁরা দেখলেন যে, রাজ্যের অ-কংগ্রেসীরা একজোট হতে পারলেন না তখন মনে করলেন, অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও দুই অ-কংগ্রেসী ফ্রন্টের ভোট ভাগাভাগির ফলে এবারও শেষ পর্যন্ত জিতেই যাবেন।

যেদিন গোটা রাজ্যে ভোট নেওয়া হল সেদিন বিকেলেই আমি ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন দলের নেতার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। প্রথমেই গিয়েছিলাম কংগ্রেস ভবনে। গিয়ে দেখি প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ দুজনেই উপস্থিত। তখন কংগ্রেস ভবনে প্রফুল্লবাবুর জন্য কোনও ঘর ছিল না। তিনি এসে অতুল্যবাবুর ঘরেই বসতেন। বরাবর দেখেছি প্রফুল্লবাবু এলে অতুল্যবাবু তাঁর নিজের চেয়ার ছেড়ে পাশের চেয়ারে এসে বসতেন এবং তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসতেন প্রফুল্ল সেন। এদিনও তাই হয়েছিল। অতুল্যবাবুর ঘরে দুজনে বসে।

. জিজ্ঞেস করলাম, কী মনে হচ্ছে? ফলাফল কিরকম হবে?

প্রফুল্ল সেন চিরকালই একটু হাল্কা ভঙ্গিতে কথা বলেন। হেসে বললেন, লিখে দাও, এবারও কংগ্রেস জিতবে। ভাল ভাবেই জিতবে।

প্রফুল্লবাবু থামতে না থামতে অতুল্যবাবু বলে উঠলেন: এই সঙ্গে আরও একটা কথা লিখো, আমি বলেছি বলেই লিখতে পার, এবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

এর দুদিন পরেই কিন্তু কংগ্রেস নেতারা ভালভাবে জানতে পারলেন, তাঁদের অনুমান কত ভুল। একের পর এক পরাজয়ের খবর আসতে লাগল। অভাবনীয় সব পরাজয়। তারপর এল অতুল্যবাবুর পরাজয়ের খবর। তারপর স্বয়ং প্রফুল্ল সেনের ব্যর্থতা। সেদিন তেইশে ফেব্রুয়ারি।

সন্ধ্যে নাগাদ গোটা রাজ্যের ফলাফলই পরিষ্কার হয়ে গেল। কারণ, ততক্ষণে অ-কংগ্রেসীরা ১৪০টি আসনে জিতে গিয়েছেন। বিধানসভায় মোট আসন ২৮০। সুতরাং, তখন বুঝতে কারুরই বাকি রইল না যে কংগ্রেস এবার আর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেলেন না। ততক্ষণে এটাও বেশ জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে হুমায়ুন

কবিরের উদ্যোগে বামপন্থীরা বিকল্প সরকার গঠনের আলাপ আলোচনা সুরু করেছেন।

সেদিন গোটা শহরে জনগণের যেমন বিরাট বিজয়োল্লাস, কংগ্রেস ভবনে তেমনি অদ্ভুত শোকের ছায়া। সব চুপচাপ। কারু মুখে কথাটি নেই। যে যার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ ওর মুখের দিকে চাইছেন। নেতারা সবাই অতুল্যবাবুর ঘরে বসে। গমগমে কংগ্রেস ভবনে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব। এমনকি বেয়ারাদের ডাকার জন্যও কেউ বেল বাজাচ্ছিলেন না।

সেদিন একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন সিদ্ধার্থবাবু ও তাঁর স্ত্রী মায়া রায়। সিদ্ধার্থবাবুর ভোটগণনা ছিল সেদিনই। সন্ধ্যে হয়ে গেল ফল বের হতে। সিদ্ধার্থবাবু জিতলেন। জিতেই তিনি ছুটে এলেন কংগ্রেস ভবনে। মায়া রায়ের হাতে দু বাক্স কেক। বড় ঘরের দরওয়াজা ঠেলে সিদ্ধার্থ রায় ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, জিতেছি, আমি জিতেছি, মায়া কেক নিয়ে এসেছে।

আমি তখন সেই ঘরে উপস্থিত ছিলাম। সবাই চুপ। কেউ কোনও কথা বললেন না। সিদ্ধার্থবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন স্বয়ং প্রফুল্ল সেন, "বাঃ, বাঃ, তুমি জিতেছ, খুব আনন্দের খবর। দাও মায়া, সবাইকে কেক দাও।"

আরও একটু রাতে সিরিয়াস আলোচনা সুরু হল। কী করা এখন? কর্তারা প্রায় সবাই সমবেত। প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, রবীন্দ্রলাল সিংহ, সিদ্ধার্থ রায়, শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, অশোক সেন, বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু দে ইত্যাদি, ইত্যাদি। সব ফলাফল না বের হলেও এটা ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে, অ-কংগ্রেসীরা ১৪০টি আসনে জিতে গিয়েছেন। কংগ্রেসের যে আর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সে সত্যটাও ততক্ষণে জলের মত পরিষ্কার।

সুতরাং, কংগ্রেসের সামনে তখন তিনটে পথ খোলা: (১) ব্যালট বাক্সের রায় মেনে নিয়ে বিরোধী দলের আসনে বসা। (২) অন্যদল থেকে লোক ভাংগিয়ে এনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করা। এবং (৩) আর কোনও দলের সংগে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা।

নেতারা সবাই রায় দিলেন, না, প্রথমটাই শ্রেষ্ঠ পথ—সেই পথেই চলা উচিত। তখন কথা হল, তাহলে সিদ্ধান্তটা সংবাদপত্রকে জানিয়ে দেওয়া যাক। সবাই আবার স্থির করলেন, হ্যাঁ, তাই ভাল। একটা বিবৃতির খসড়া তৈরী হল। ছোট্ট বিবৃতি। খসড়াটা তৈরী করলেন সিদ্ধার্থ রায়[১]। সবাই কিছুটা কিছুটা পরিবর্তনের সাজেশন দিলেন। কিছু গৃহীত হল। কিছু হল না। চূড়ান্ত খসড়াটা পড়া হল। সবাই বললেন, ঠিক আছে।[২] তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। প্রফুল্ল সেন বাড়ি চলে গিয়েছেন। টেলিফোনে তাঁকেও পড়ে শোনান হল চূড়ান্ত বিবৃতিটা। প্রফুল্লবাবুও বললেন, ঠিক আছে।[৩]

---

[১] অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০।
[২] অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০।
[৩] অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

এবার প্রশ্ন উঠল কার নামে বিবৃতিটা যাবে। দলপতি প্রফুল্ল সেন পরাজিত। দলের সেকরেটারি অশোক দত্তও পরাজিত। হাইকোরটের ইনজাংশনে তখন প্রদেশ কংগ্রেসের কোনও সভাপতি নেই। ভেবেচিন্তে স্থির হল, তাহলে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু দের নামেই বিবৃতিটা যাক।[৪] তাই হল। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় নির্মলেন্দু দে আমাকে টেলিফোন করলেন: একটা ছোট্ট বিবৃতি আছে, নেবে নাকি?

আমি প্যাড টেনে নিয়ে বললাম, বলুন।

সেই বিবৃতির মূল বক্তব্য, "কংগ্রেস বিধানসভায় গরিষ্ঠতা পায়নি। তাই কংগ্রেস এবার বিরোধী দলেই বসতে চায়।" চব্বিশে সকালে সব কাগজেই এ খবর বের হল।

একদিকে এই খবর, আর একদিকে হুমায়ুন কবিরের অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনের উদ্যোগ আয়োজনের খবর। গোটা রাজ্যে হইহই পড়ে গেল। রাম নাম সং হ্যায়-রা একেবারে মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন—তব্ কিয়া কমুনিস্ট লোগই আ যা রহা?

সকাল হতেই খগেন দাশগুপ্ত, বিজয় নাহার, শৈল মুখার্জী ছুটলেন প্রফুল্ল সেনের বাড়িতে। গিয়েই চার্জ। বদু এই বিবৃতি কেন দিল? কে ঠিক করল কংগ্রেস সরকার করবে না? কে সিদ্ধান্ত নিল কংগ্রেস কোয়ালিশন করতে চাইবে না। প্রফুল্লবাবু তাঁদের পরিস্থিতিটা বোঝালেন। তাঁরা বললেন, না, তা হয় না, এভাবে সব ছেড়ে দেওয়া যায় না।

আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল অশোক সেনকে ধরা হবে। অশোক সেন গিয়ে অজয়বাবুকে বলবেন যে, হয় তিনি কংগ্রেসে ফিরে এসে সরকার করুন, না হয় কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করুন। অথবা, কংগ্রেসের সমর্থনে একাই সরকার করুন। এই প্রস্তাব নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশ মজুমদার গেলেন অশোক সেনের বাড়িতে।

কিন্তু অশোক সেন তাঁদের হতাশ করলেন। বললেন: এ হয় না। এক নম্বর, কংগ্রেসের কিছুদিন পাওয়ারে না থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা উচিত। দু নম্বর, অজয়বাবু কংগ্রেস বিরোধিতার ভিত্তিতে নির্বাচন করেছেন। তিনিও হুট করে এখন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইবেন না। ব্যোমকেশবাবু বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন।

তবু চেষ্টার বিরাম নেই। বিকালে কংগ্রেস ভবনে গিয়ে দেখি, কলকাতার সব চাঁই চাঁই শিল্পপতিরা লাইন দিয়ে টুলের উপর বসে। একজন করে অতুল্যবাবুর ঘরে ঢুকছেন, আর বেরিয়ে আসছেন। কালো শুকনো মুখ। ব্যর্থতার পরিষ্কার ছাপ।

সবাই যখন বিদায় নিলেন, তখন অতুল্যবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একা বসে। ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন, কতক্ষণ এসেছ? বললাম, অনেকক্ষণ। দেখছিলাম,

---

[৪] অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

চলল। একটা কাজ প্রকাশ্যে, আর একটা গোপনে—তলে তলে।

এই গোপন কাজটার প্রধান দায়িত্ব নিলেন আশু ঘোষ। নেতাদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললেন খগেন দাশগুপ্ত এবং বিজয় নাহার।

আশু ঘোষ তখনও কংগ্রেসী এম. এল. সি—যদিও কংগ্রেসী রাজত্বকালেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের মামলা করেছিলেন। কিন্তু তবু প্রয়োজনে কংগ্রেসী নেতারা আশু ঘোষের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হলেন না।

আশু ঘোষ নিজে অবশ্য বলেন যে, সাতাশে ফেবরুয়ারিই তিনি কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে অতুল্য ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবটা ছিল এইরকম: দাদা, আমরা তো ১২৭। আর ১৫।১৬ জন হলেই তো হয়ে যায়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি একটু চেষ্টা করে দেখি। আশু ঘোষ বলেন, অতুল্যবাবু বলেছিলেন, চেষ্টা করে দেখ না।[৮] অতুল্যবাবু বলছেন, এরকম কোনও কথা তিনি আশু ঘোষকে বলেননি। তিনি গোড়া থেকেই দল ভাঙিয়ে সরকার ভাঙার বিরুদ্ধে। সবাইকে বরাবর এই কথাই বলেছেন।

এতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই যে, যে পাঁচজন কংগ্রেসে এলেন তাঁদের জোগাড় করেছিলেন আশু ঘোষই। স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ এইসব এম. এল. এ-কে তিনি নিজের বাড়িতেও এনে রেখেছিলেন। যখন এই পাঁচজন এম. এল. এ-র নাম ঘোষিত হয়ে গিয়েছে, তখন আশুবাবুর হাতে আরও কয়েকজন এম. এল. এ ছিলেন। আশুবাবু বলেন, কংগ্রেসী নেতাদের পরামর্শেই তিনি তখন তাঁদের নাম ঘোষণা করেননি।[৮]

একমাত্র জগন্নাথ কোলে ছাড়া আর কোনও কংগ্রেসী নেতা কিন্তু প্রকাশ্যে দল ভাঙিয়ে সরকার ভাঙার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করলেন না। জগন্নাথবাবু তখন দলের চিফ হুইপ। তিনি এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। অবশ্য আবার বিশেষ অনুরোধে পদত্যাগপত্র তুলেও নিলেন।

কংগ্রেস নেতারা তখন শুধু দল ভাঙিয়েই যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত কিভাবে কী করবেন সে ছবি তখনও তাঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। খগেনবাবু এবং বিজয়বাবুর ইচ্ছা ছিল, এইভাবে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে নিজেই মন্ত্রিসভা গঠন করুক। অবশ্য ১৫।১৬ জন এম. এল. এ ভাঙিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁরা খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

এই সময় প্রতাপ চন্দ্র তাঁদের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন। প্রতাপবাবু তখন দলের সম্পাদক। প্রস্তাবটা প্রতাপবাবুর নিজের ভাষায় এই রকম: ডঃ ঘোষ আমাকে মাঝেমধ্যে ডাকতেন, খাদ্যসমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তিনি মনে করতেন, বিরোধী দলের লোকদের সঙ্গেও মন্ত্রী হিসাবে খাদ্য নিয়ে তাঁর আলোচনা করা উচিত।...আমি একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার মত লোক কি করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছেন।

---

[৮] আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৬৭।

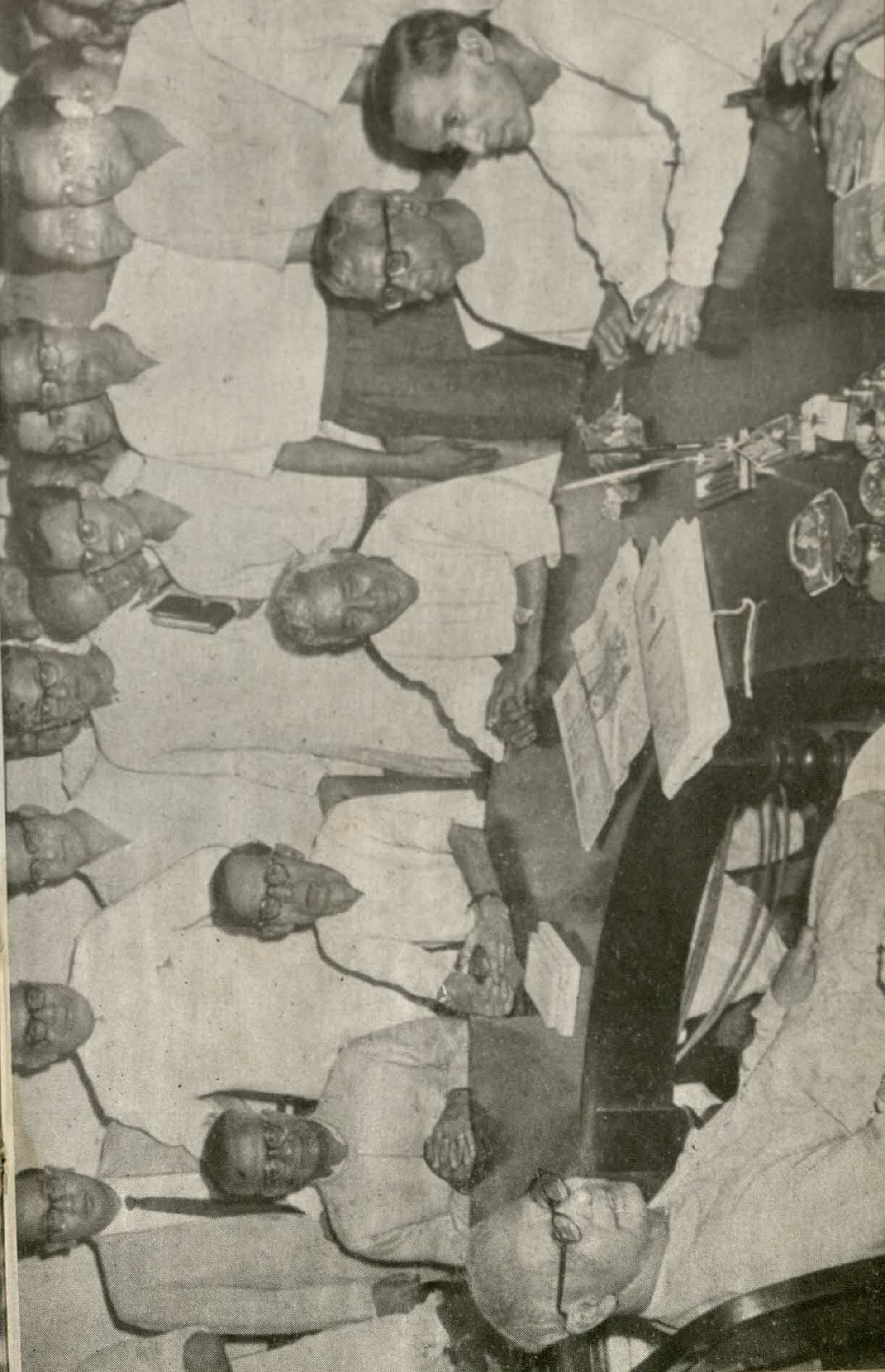

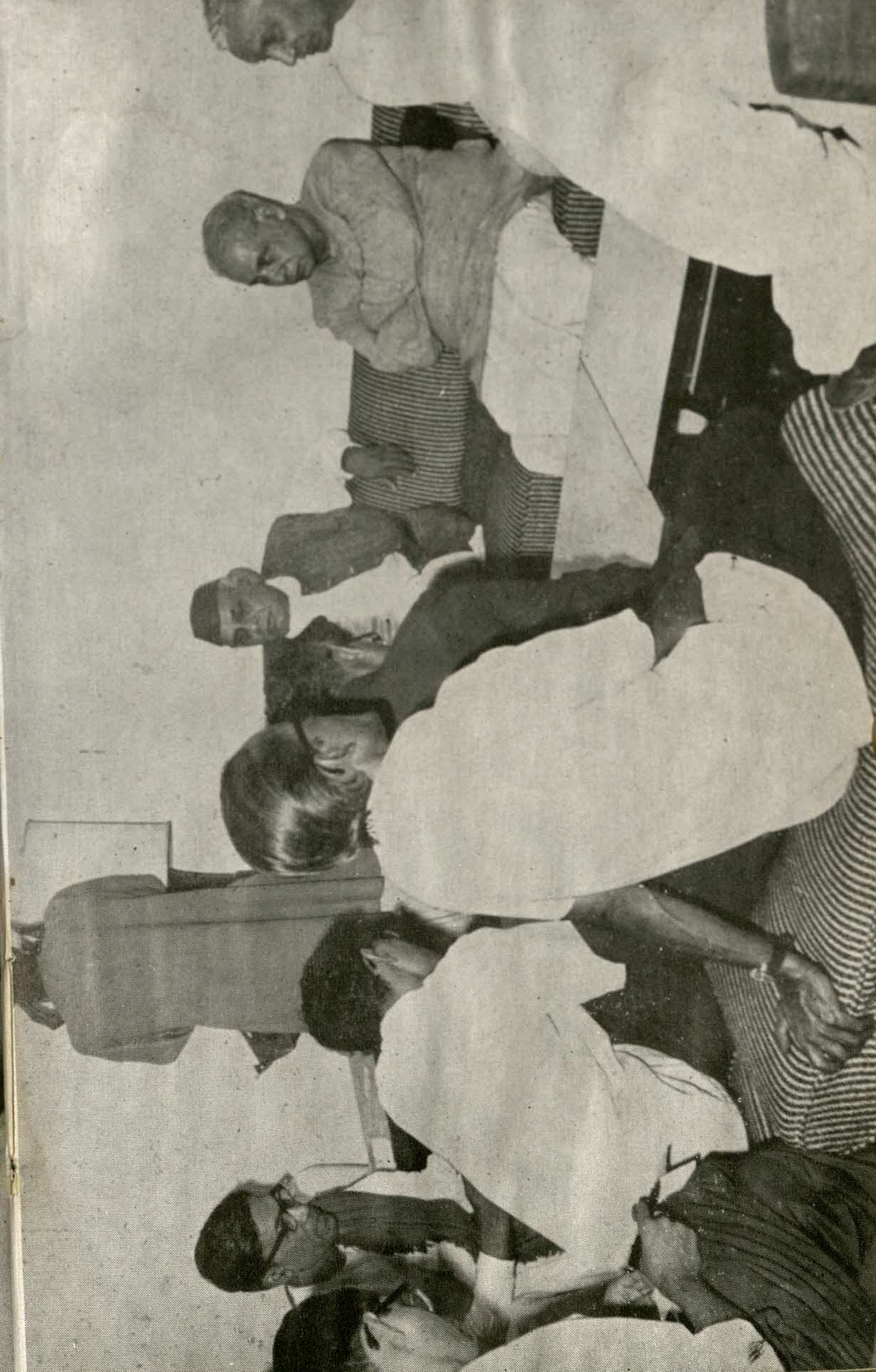

কমিউনিস্টরা তো দেশটাকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে চায়। আপনার মত জাতীয়তাবাদী কি করে ওদের সঙ্গে কাজ করছেন? প্রথমে উনি কিছু বলতেই চাইলেন না। তারপর দু-তিনবার জিজ্ঞেস করতে স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে কাজ করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কমিউনিস্টদের কাগজগুলি পর্যন্ত গালিগালাজ করছে। বাস্তবিক ওদের সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। কিন্তু কি করব, এখন তো আর বেরিয়ে আসা যায় না।"[৯]

ডঃ ঘোষের বিরুদ্ধে তখন ফ্রণ্টের কয়েকটি শরিক দল, বিশেষ করে সি. পি. এম পূর্ণ জেহাদ ঘোষণা করে দিয়েছেন। তাঁদের সভা শোভাযাত্রায় খাদ্যমন্ত্রী-বিরোধী ধ্বনি উঠছে। বিভিন্ন এলাকায় খাদ্যের দাবিতে ট্রেন আটক সুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপবাবু ডঃ ঘোষের বক্তব্য খগেনবাবু এবং বিজয়বাবুকে জানালেন। তারপর তাঁরা তিনজনে একদিন ডঃ ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। সেই বৈঠক সম্পর্কে প্রতাপবাবুর বিবরণ : আমরা তাঁকে সব অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করি। তখন ডঃ ঘোষ বললেন, আমি তো আর এমনি বেরিয়ে আসতে পারি না। যদি অন্যদিকে মেজরিটি হয়ে সরকার গঠন করা যায় তাহলে হয়তো হতে পারে। তখন তিনি বিজয়বাবুকে বললেন, আপনি তো বলছেন, অনেকে আপনার সঙ্গে আসতে চায়, তাহলে তাঁদের নিয়ে আসুন।

খগেনবাবু এবং বিজয়বাবু অতি উৎসাহে কাজ সুরু করে দিলেন। আশু ঘোষ তাঁদের বললেন, সব রেডি, সময়মত পনেরো যোলজন নয়, উনিশজন হাজির হয়ে যাবে।

সেইমত রাজ্যপালকে সব জানানো হল। রাজ্যপালও সব উদ্যোগ আয়োজন করলেন। দিল্লিতেও খবর দেওয়া হল। রাজ্যপাল মানেকশকে ডেকে বললেন, প্রস্তুত থেকো। মানেকশ আই. জি উপানন্দ মুখার্জি এবং কমিশনার পি. কে. সেনকে ডেকে বললেন, প্রস্তুত হও।

দিন ধার্য হল ছাব্বিশে জুলাই। পরিকল্পনাটা এইরকম: ডঃ ঘোষ এবং আরও জনা পনেরো সদস্য ফ্রণ্ট ছেড়ে চলে আসবেন। বিধানসভার ভেতরই তাঁরা ফ্রণ্ট ত্যাগের কথা জানাবেন। সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে। নতুন মন্ত্রিসভা হবে। ডঃ ঘোষ হবেন মুখ্যমন্ত্রী।

পঁচিশে জুলাই-ই আমি টের পেলাম একটা কিছু ঘটছে। কংগ্রেস পক্ষ থেকে সব সদস্যকে হাজির থাকতে বলা হল। বুঝলাম, ছাব্বিশে জুলাই কংগ্রেস চরম শক্তিপরীক্ষায় নামবে। কাগজে তা লিখলামও।[১০] ফ্রণ্টের নেতারাও কিছুটা কিছুটা টের পেলেন। তাঁরাও সচেষ্ট হলেন।

ছাব্বিশে সকালে কংগ্রেস ভবনে সভা বসল। সেই সভা সম্পর্কে অতুল্যবাবুর

---

৯ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।
১০ আনন্দবাজার ২৬-৭-৬৭। "আজ শক্তিপরীক্ষা।"

বিবরণ : পঁচিশে অনেক রাত্রে বিজয় নাহার আমাকে ফোন করে তার পরদিন কংগ্রেস ভবনে যেতে বললেন। মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা-গড়ার যে খেলা চলছিল তাতে আমার মত ছিল না। তাই তাতে অংশ নিতুম না। স্বাভাবিকভাবেই ভাবলুম, সংগঠন নিয়ে বোধহয় কোনও আলোচনা হবে। তাই গেলুম। গিয়ে দেখি প্রফুল্লদা, বিজয়বাবু, শৈলবাবু, খগেনবাবু, সিদ্ধার্থ, প্রতাপ, পূরবী প্রভৃতি উপস্থিত। ওঁরা আমাকে বললেন, ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে বেরিয়ে আসবে। এতে আমার নীতিগত আপত্তি ছিল। তবু যখন সবাই বার বার বলছিলেন কথাগুলি, তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, কারা কারা আসছে। এর আগেই ঘরের ভেতরে কে একজন যেন বলেছিলেন, যাঁরা ডঃ ঘোষের সঙ্গে বেরিয়ে আসবেন তাঁরা প্রোটেকসন চান। আমি বার বার নামগুলি জানতে চাইলুম। কেউই নাম বলতে পারলেন না।”[১১]

কয়েকজন যুক্তফ্রণ্ট এম. এল. এ অবশ্য সত্যিই সেদিন ফ্লোর ক্রস করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা বিজয়বাবু এবং আশুবাবুকে কথাও দিয়েছিলেন যে ছাব্বিশে জুলাই বিধানসভায় ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। তাঁদের প্রধান দাবি ছিল, হাউসের ভেতরে প্রোটেকসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তাঁরা কিছু করতে রাজী নন। সেদিন যুক্তফ্রণ্টের একটা বড় মিছিল বিধানসভায় আসার কথা ছিল। তাতে তাঁরা আরও ভয় পেলেন। মনে করলেন, ভোটে ফ্রণ্ট সরকার হেরে গেলে এদের বিধানসভা ভবনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। এইসব এম. এল. এ-র আর একটা অনুরোধ ছিল, সব কাজ হয়ে যাওয়ার আগে নাম প্রকাশ করবেন না। সম্ভবত সেইজন্যই কংগ্রেস ভবনের সভায় বিজয়বাবু যখন দেখলেন যে তাঁদের প্রোটেকসনের কোনও ব্যবস্থা করা গেল না, তখন তিনি নামগুলিও চেপে গেলেন।

এদিকে কথামত ডঃ ঘোষ কিন্তু ছাব্বিশেই পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। এই খবরে সকাল থেকেই যুক্তফ্রণ্ট মহলে একেবারে হইচই পড়ে গেল। একাধিক মন্ত্রী ছুটলেন ডঃ ঘোষের বাড়িতে। ডঃ ঘোষ তাঁর বিক্ষোভের কারণও সবাইকে বললেন। তাঁরা সকলেই ডঃ ঘোষের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু বললেন, এইভাবে আপনি মন্ত্রিসভা ছেড়ে চলে গেলে কমিউনিস্টদের লাভ হবে। সবাই অনুরোধ জানালেন, তা করবেন না। চূড়ান্ত কথাটা বললেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী : ছাড়বেন তো আপনি একা ছাড়বেন কেন, আমরা সবাই একসঙ্গে ছাড়ব। ব্যস্ততার কিছু নেই।

কংগ্রেস ভবনের বৈঠকের পরই সিদ্ধার্থ রায়কে পাঠানো হল ডঃ ঘোষের কাছে শুধু এই বলতে যে, আজকে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। বিধানসভায় এসে বিজয়বাবু, খগেনবাবু সম্ভাব্য দলত্যাগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা আবার বললেন, ওরে ব্বাবা, আজ কিছুতেই না। তখন বিধানসভার দক্ষিণ দিকে বিরাট বামপন্থী মিছিল দেখা যাচ্ছে।

---

[১১] অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

কংগ্রেস পক্ষ থেকে বিধানসভা ভবনেই আবার ডঃ ঘোষকেও জানান হল, আজ সম্ভব হচ্ছে না। খাদ্যমন্ত্রী সেদিন যথারীতি বিধানসভায় তাঁর ঘরে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ ঘোষ লোক মারফৎ প্রতাপ চন্দ্রের কাছে খবর পাঠালেন : এখন যখন বিকল্প সরকার করা সম্ভব হচ্ছে না তখন কি তাঁর পদত্যাগ করা উচিত? প্রতাপবাবু সিদ্ধার্থ রায় মারফৎ জবাব পাঠালেন : যখন বিকল্প সরকার গঠন সম্ভব হচ্ছে না তখন আর মিছিমিছি পদত্যাগ করে লাভ নেই। প্রতাপবাবু নিজে গেলেন না, কারণ তখন তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। প্রতাপবাবুর ভয় ছিল, পদত্যাগের খবরের সংগে সংগে যদি বিধানসভা ভবনেই তিনি ডঃ ঘোষের সংগে কথা বলতে যান তাহলে নানা ভুল-বোঝাবুঝি হবে।[১২]

তিনটে নাগাদ আমরা সাংবাদিকরা চূড়ান্তভাবে জানলাম, না, খাদ্যমন্ত্রী পদ-ত্যাগ করছেন না। আড়াইটা পর্যন্ত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরও ভয় ছিল। ওই রকম সময় বি-পি-এন-টি-ইউ-সির কালী মুখার্জী গিয়েছিলেন অজয়বাবুর সংগে দেখা করতে। তখন তাঁর সংগে অজয়বাবুর খুব ভাব। অজয়বাবু তাঁকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন খাদ্যমন্ত্রীর ঘরে, বুঝিয়ে বলার জন্য যে, এখন এভাবে পদত্যাগ করা ভুল। বুঝিয়ে বলায় কালিবাবু চিরকালই বেশ পটু। কালিবাবু বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরে চূড়ান্তভাবে জানা গেল, ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করছেন না।

সেদিন বিকালেই সোমনাথ লাহিড়ির ঘরে গোপন পরামর্শ বসল। সোমনাথ-বাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারলেন। বুঝলেন, আজ বেঁচেছেন, কিন্তু অবস্থা যা তাতে বিধানসভা চলতে থাকলে যে কোনও দিন ফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটতে পারে।

সেইদিনই ঘোষণা করা হল, বিধানসভা সাতই আগস্ট পর্যন্ত মুলতুবী।

পয়লা আগস্ট আবার একটা ঘোষণা প্রকাশিত হল : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শেষ হল। এ যাত্রায় আর বৈঠক বসবে না।

কংগ্রেসী নেতারা বুঝলেন বিধানসভার ভোটে হারিয়ে ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে সরাতে হলে আরও প্রায় ছ'মাস তীর্থের কাকের মত বসে থাকতে হবে।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-27

[১২] প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

উত্তাপ বৃদ্ধি

একটা বড় ফাঁড়া কাটল।

কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের ভেতরের অবস্থা তখন এমনই পর্যায়ে পেঁাছেছে যে ফাঁড়া কাটলেও বিপদ কিছুতেই দূর হয় না। একটার পর একটা বিপদ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এগিয়ে আসতে লাগল। একটা মাথার ওপর দিয়ে যেতে না যেতেই আর একটা এসে হাজির হয়।

নকশালবাড়িতে পুলিশী অ্যাকশন নিয়ে, তপশিলী মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে, আসানসোলে বি. পি. ঝা-র হত্যা নিয়ে, জমি দখল, ধান লুঠ, ট্রেন আটক, ঘেরাও ইত্যাদি প্রভৃতি হাজারো প্রসঙ্গে তখন যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি একটা অদ্ভুত পর্যায়ে পেঁাছেছে। পারস্পরিক গালিগালাজ প্রায় চূড়ান্তে। গোর্খা লীগ এক আলটিমেটাম দিয়ে বসে আছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গে আইন শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হলে তাঁরা তাঁদের মন্ত্রী প্রত্যাহার করবেন। এস. এস. পি-র নেতারা বি. পি. ঝা-র হত্যাকান্ড নিয়ে ভীষণ বিক্ষুব্ধ। তাঁদের রাজ্য কমিটির কর্তা ভূপাল বোস দিল্লিতে গিয়ে এক প্রেস কনফারেন্স করে বললেন : পশ্চিমবঙ্গে আর টেকাই মুশকিল। ডাঙ্গে সাহেব কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন : কংগ্রেসীরা এবং সি. পি. এমের লোকজন ফ্রণ্ট সরকারের পতনের চেষ্টা করছে।

এসব দেখে মানুষও একেবারে থ। তার ওপর জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য তো আছেই। কয়েকটা জেলায় একেবারে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। গ্রামে গ্রামে চালের জন্য হাহাকার। কলকাতায়ও রেশনে চালের বরাদ্দ ৭৫০ থেকে কমে ৫০০ গ্রামে গিয়ে দাঁড়াল। পথে ঘাটে যুক্তফ্রণ্টের সমালোচনা শোনা যেতে লাগল।

এই পরিস্থিতিতে এল ছাব্বিশে জুলাই। ছাব্বিশের ফাঁড়াটা কাটিয়ে ফ্রণ্টের নেতারা বললেন, না, এবার সত্যিই একটা কিছু করতে হয়—না হলে এ সরকার আর টিকবে না।

পরদিন যুক্তফ্রণ্টের বৈঠক বসল। নেতারা বললেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। এই মিটিং-এ নেতারা প্রায় সবাই স্বীকার করলেন যে, পারস্পরিক দোষারোপের ফলে আবহাওয়া খুব বেশি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে এবং অবিলম্বে এটা বন্ধ করা দরকার। ফ্রণ্ট স্থির করলেন, শরিক দল, মন্ত্রী এবং যুক্তফ্রণ্ট এম. এল, এ সবার জন্যই আচরণবিধি তৈরী করা হবে। সবাই প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাঁরা মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করবেন। আবহাওয়া বিষাক্ত করার মত কোনও কাজ কেউই করবেন না।

দু'তিন দিন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাটল। কিন্তু তারপরই আবার সুরু হল। সুরু করলেন সি. পি. এম নেতা সুন্দরায়া সুদূর ত্রিভেন্দ্রামে। কেরলের রাজধানীতে

তিনি বললেন : অজয়বাবু ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে নকশালবাড়িতে পুলিশী জুলুম চালাচ্ছেন।

কাগজে সুন্দরায়ার এই বক্তব্য পড়ে অজয়বাবু মহা খাপ্পা। তিনি সরকারের প্রচার দফতর মারফৎ এক বিবৃতি পাঠালেন খবর কাগজের অফিসে অফিসে।[১] সে বিবৃতির বক্তব্য : সুন্দরায়া সব অসত্য কথা বলেছেন। পুলিশ বা আমি নকশালবাড়ির ব্যাপারে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিনি।

আবার, সেইদিনই কয়েকজন রিপোর্টার মুখ্যমন্ত্রীর সেই বিবৃতি সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতামত জানতে চাইলেন। কোঙার সাধারণত চাঁছাছোলা কথা বলেন। তিনি জবাব দিলেন, "মন্ত্রিসভার নির্দেশ লঙ্ঘন করে নকশালবাড়িতে যে পুলিশী জুলুম চলছে আমাদের দলের কার্যকরী সমিতি তার প্রতিবাদ করেছে। আমরা তিনজন মন্ত্রী, অর্থাৎ আমি, জ্যোতিবাবু এবং নিরঞ্জনবাবুও সেই মতই পোষণ করি।"

পরদিন বোমা ফাটালেন স্বয়ং প্রমোদ দাশগুপ্ত। কড়া কথা তেতো করে বলায় তাঁর জুড়ি নেই। তিনি সোজাসুজি বলে বসলেন : মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন না।

তখন সি. পি. এমের রাজ্য কমিটির বৈঠক চলছিল। শেষ হল চৌঠা আগস্ট। রাজ্য কমিটি প্রস্তাব নিলেন, "স্বরাষ্ট্র এবং খাদ্য দফতর যুক্তফ্রন্টের আঠারো দফা কর্মসূচী পালন করছে না এবং এই দুই দফতর রাজ্যে এক সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।... এ আমলেও জোতদার, পুঁজিপতি এবং কালোবাজারীরাই বেশি লাভবান হয়েছে।" এই সঙ্গে প্রমোদবাবু আরও জানালেন : তাঁর দল এখন খাদ্যনীতির ব্যর্থতা, পুলিশী অত্যাচার এবং ভূমি বণ্টনে বিলম্বের বিরুদ্ধে এবং অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন সুরু করবেন। প্রমোদবাবু একথাও বলতে ছাড়লেন না যে, "ফ্রন্ট ও ফ্রন্ট সরকার দুর্বল হচ্ছে পি. এস. পি, এস. এস. পি এবং বাংলা কংগ্রেসের জন্য।"

ব্যস. সুরু হয়ে গেল একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়।

একটা কথা ইতিমধ্যে বলা হয়নি। জুন মাসেই সি. পি. এমের পলিটব্যুরো এবং রাজ্য কমিটি স্থির করে ফেলেছেন, এ যুক্তফ্রন্ট সরকার আর চলতে পারে না—অন্তর্বর্তী নির্বাচন করতেই হবে। সুতরাং, তখন থেকেই তাঁরা সেইভাবে চলছিলেন।

এই সময় থেকেই ঘটনা-প্রবাহ খুব দ্রুত গতিতে এগোতে থাকে। পাঠকের সুবিধের জন্য আমি আমার নোট থেকে পর পর কতকগুলি ঘটনা তুলে দিচ্ছি।

২রা আগস্ট

মুখ্যমন্ত্রীর কামরার সামনে একদল সরকারী কর্মীর হাতে আর একদল সরকারী কর্মী লাঞ্ছিত। যাঁরা লাঞ্ছিত হন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

---

১ ৩১-৭-৬৭।

ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন। তাঁদের রক্ষা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রীও এক-আধটা ধাক্কা খান। রাইটারস বিলডিংসে অভূতপূর্ব ঘটনা। জ্যোতি বসু পাশের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বেরিয়ে আসেননি।

বাম কমিউনিস্টদের নীতি আত্মঘাতী—ফরওয়ার্ড ব্লক মুখপত্রে অভিযোগ। "বাম কমিউনিস্টদের আচরণে শুধু ডঃ ঘোষ বা শ্রীঅজয় মুখাজী নন, ফ্রণ্টের অন্যান্য দলও ক্ষুব্ধ।"

৪ঠা আগস্ট

কলকাতায় প্রেস কনফারেনসে এস. এস. পি নেতাদের অভিযোগ : ফ্রণ্টের ভেতরের কিছু দলের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টার জন্যই ফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হচ্ছেন।

৫ই আগস্ট

বেতন কমিশন নিয়ে জটিল পরিস্থিতি। অর্থমন্ত্রী জ্যোতিবাবু বেতন কমিশন গঠন করে তা গেজেট হিসাবে প্রেসে ছাপতে পাঠান। মুখ্যমন্ত্রী গেজেট ছাপা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। অজয়বাবুর আপত্তির কারণ, মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করেই জ্যোতিবাবু কমিশন গঠন করেছেন।

বাম কমিউনিস্টদের রাজ্য কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য : ক্যাবিনেটের মধ্যে থেকে পুরো দায়িত্ব পালনের যে রীতি আছে সেকথা অস্বীকার করে ওরা চিরাচরিত অভ্যাস মত অযথা অন্যের নিন্দা করছে।

নিশীথনাথ কুণ্ডু আরও ক্ষুব্ধ। তাঁর মন্তব্য : বাম কমিউনিস্টরা যদি মনে করেন মন্ত্রিসভায় গৃহীত নীতি তাঁদের নীতি নয়, তাহলে তাঁদের একমাত্র কর্তব্য মন্ত্রিসভা থেকে দলীয় প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করে নেওয়া।

৬ই আগস্ট

প্রমোদ দাশগুপ্তের জবাব : অজয়বাবু বেতন কমিশনের গেজেট ছাপা বন্ধ করে দিয়েছেন, তাতে আর তেমন কি হয়েছে। সকালে কাগজ দেখেই বুঝেছি নিশীথ কুণ্ডু ও সোমনাথ লাহিড়ীরা চাইছেন আমরা মন্ত্রিসভা ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ওদের খুশী করতে পারছি না।

ঠিক এই সময় মুখ্যমন্ত্রী গেলেন দিল্লিতে। সরকারীভাবে প্রধান আলোচ্য বিষয় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা। কিন্তু আসল লক্ষ্য, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে গোপন আলোচনা। ইন্দিরা গান্ধীও এই আলোচনায় খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি যে অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে অত্যন্ত আগ্রহী, মুখ্যমন্ত্রীকে সে খবরও জানানো হয়েছিল। সাতই আগস্ট একঘণ্টা আলোচনা হল। মোটামুটি একটা পরিকল্পনা তৈরী হল। প্রধানমন্ত্রীই মূল পরিকল্পনাটা দিলেন। স্থির হল সেইভাবেই এগোনো হবে।

সেইদিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্টের তিন প্রধান দলের তিন পথে হাঁটা সুরু হল। সি. পি. এম তখন চাইছেন যুক্তফ্রণ্টকে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিকে

ঠেলে নিতে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, যুক্তফ্রন্টের সব কমিউনিস্ট দলকে বর্জন করে কংগ্রেসের সহযোগিতায় নতুন মন্ত্রিসভা গড়তে। সি. পি. আই চেষ্টা করছেন, যেকোন ভাবে জোড়াতালি দিয়ে সি. পি. এম এবং বাংলা কংগ্রেস—দু'দলকেই একটু ঠান্ডা রেখে যুক্তফ্রন্ট ও সরকার চালিয়ে যেতে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পাকা কথা হওয়ার পরই দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা স্থির। তিনি সি. পি. এমের আচার আচরণে তখনও ক্ষুব্ধ এবং উত্তপ্ত। কিন্তু আগের মত চট করে তা প্রকাশ করলেন না। তখন তাঁর ভাবটা, দেখাচ্ছি মজাটা!

এদিকে সি. পি. এম-ও তখন বেতন কমিশনের থাপ্পর খেয়ে বুঝে গিয়েছেন

যে মুখ্যমন্ত্রী এবার আর শুধু মুখে জবাব দেবেন না, হাতে মারবেন। তাঁরা এও বুঝলেন যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা হলেও আইনত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে প্রচুর ক্ষমতা। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনও মন্ত্রীকে নাস্তানাবুদ করতে পারেন। সি. পি. এম-ও তাই তখন একটু সমঝে চলার চেষ্টা সুরু করেছেন।

তাই বিশ্বনাথ মুখার্জী যখন বেতন কমিশন সম্পর্কে জ্যোতিবাবুর কাছে একটা রফার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন তখন অর্থমন্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করলেও বললেন যে, মন্ত্রিসভা যা বলবে তাই তাঁরা মেনে নেবেন। জ্যোতিবাবু কমিশন করেছিলেন তিনজনকে নিয়ে। মন্ত্রিসভা বাড়িয়ে সদস্য সংখ্যা করলেন সাত।

এ নিয়ে দস্তুরমত ভোটাভুটি হল ক্যাবিনেটে। দু-দুবার ভোট হল। একবার ভোট হল কমিশন সম্প্রসারণ নিয়ে। ১০ : ৬ : ১। পক্ষে; অজয়বাবু, সুশীলবাবু, চারুমিহির সরকার, হেমন্ত বসু, অমর চক্রবর্তী, নিশীথ কুন্ডু, বিভূতি দাশগুপ্ত, দেওপ্রকাশ রাই, বিশ্বনাথ মুখার্জী এবং ডঃ ঘোষ। বিপক্ষে : জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, নিরঞ্জন সেন, ননী ভট্টাচার্য, সুবোধ ব্যানার্জী, জ্যোতি ভট্টাচার্য। নিরপেক্ষ রইলেন, সি. পি. আই-র সোমনাথ লাহিড়ী।

সি. পি. আই-র দুই নেতা দুরকম ভোট দিয়ে দুপক্ষকেই খুশি রাখলেন।

দ্বিতীয়বার ভোট হল চারটে নতুন নাম নিয়ে। নামগুলি প্রস্তাব করলেন বিশ্বনাথ মুখার্জী। আর সবাই ঠিক রইলেন। শুধু প্রথম দলের বিভূতি দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীয় দলের জ্যোতি ভট্টাচার্য এবার এসে সোমনাথবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে নিরপেক্ষর দল ভারি করলেন।

মন্ত্রিসভার আর দুই সদস্য জাহাঙ্গীর কবির এবং কাশীকান্ত মৈত্র সেদিন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না।

এই সময় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসংকট চরমে। মন্ত্রীরাই স্বীকার করছিলেন যে কতকগুলি জেলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে! দিকে দিকে যানবাহন অবরোধ প্রচণ্ড বেগে বেড়ে চলেছে। ট্রেন চলাচল প্রতিদিন বাধা পাচ্ছে। জনগণ রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়াও সার্চ করছে। লুঠতরাজ পুরোদমে সুরু হয়ে গিয়েছে।

সি. পি. আই নেতারা তখন এক ভাল বুদ্ধি বের করলেন। তাঁরা ভাবলেন যদি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন সুরু করা যায় তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। সাধারণ মানুষকে বোঝানো যাবে যে, কেন্দ্রের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে এত হাহাকার, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গো-ভাঙ্গো ফ্রন্টকে জোড়া লাগানো যাবে। তাই তাঁরা প্রস্তাব দিলেন খাদ্যের দাবিতে একটা কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন সুরু করা যাক। তার একটা অংশ চলবে দিল্লিতে—মন্ত্রীরা গিয়ে রাজধানীতে ধরণা দেবেন। আর একটা অংশ চলবে পশ্চিমবঙ্গে—সাধারণ ধর্মঘট পর্যন্ত ডাকা হবে!

যুক্তফ্রণ্টে প্রস্তাবটা রাখা হল। বাংলা কংগ্রেস এবং পি. এস. পি ছাড়া সবাই অতি উৎসাহে প্রস্তাবটা মেনে নিলেন।

সেইমত বিরাট ধুমধাম সহকারে ছয়জন মন্ত্রী একুশে আগস্ট দিল্লি গেলেন। তাঁরা প্রথমেই গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন : আমি তো আপনাদের সমস্যা বিশেষ সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করে দেখছিই। ধরণা দেওয়ার প্রয়োজন কি। আপনারা ধরণা প্রত্যাহার করুন। হরতালটাও আর করবেন না।

দিল্লি-কলকাতায় টেলিফোনে টেলিফোনে বেশ কিছুটা আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, ধরণা হবে না, তবে হরতালটা হবেই। চব্বিশে পশ্চিমবঙ্গে সেই হরতাল হল।

মুখ্যমন্ত্রী তখন কলকাতায়। অসুস্থ। তিনি নেতাদের কাছে অনুরোধ জানালেন, ধরণা যখন বন্ধ থাকল তখন হরতালটাও আর করবেন না। হরতাল কিন্তু তবুও হল। মুখ্যমন্ত্রী আরও চটলেন।

চব্বিশে বাড়তি খাদ্যের দাবিতে যুক্তফ্রণ্ট হরতাল করলেন। আর ছাব্বিশে মন্ত্রিসভা রেশনে একশ গ্রাম চাল কমালেন।

এই চাল কমানো নিয়ে যুক্তফ্রণ্টে আবার একটা দক্ষযজ্ঞ সুরু হল। সি. পি. এমের মন্ত্রিরা তখন দলের সম্মেলন উপলক্ষে বাইরে। দলের পক্ষ থেকে কলকাতায়

বাংলা বন্ধ—
কাদের কাছে ?
বাংলা
কংগ্রেস

ঘোষণা করা হল, আমাদের মন্ত্রিরা কেউ মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং আমরা রেশন হ্রাসের কোনও দায়িত্ব নেব না।

আরও মজা করলেন আর. এস. পি-র ননী ভট্টাচার্য এবং এস. ইউ. সি-র সুবোধ ব্যানার্জী। তাঁরা ক্যাবিনেটের ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন। বৈঠকের সিদ্ধান্তও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাইরে গিয়ে বললেন, আমরা রেশন হ্রাসের বিরুদ্ধে।

তাই শুনে ডঃ ঘোষ তো খাপ্পা। তিনি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন : অজয়, হয় এরকম ব্যাপার বন্ধ কর, না হয় আমাকে রেহাই দাও।

সেদিন উনত্রিশে আগস্ট।

পরদিনই মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন। ধর্মবীরও তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে কলকাতা ফিরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনাটা রাজ্যপালও পুরোপুরি জেনেছেন। তাঁকে সেইমত সব ব্যবস্থাও করতে বলা হয়েছে।

এদিকে তখন হুমায়ুন কবিরও ক্ষুব্ধ। তিনি প্রায় সকলের উপরই চটা। মুখ্যমন্ত্রীর উপর তাঁর ক্ষোভের কারণ, অজয়বাবু কোনও ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করছেন না। ক্রান্তি দল নিয়েও তখন কবির-মুখার্জী বিরোধ চরমে। কবিরের উৎসাহে একদল মন্ত্রী সহ উনিশজন এম. এল. এ পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তি দল গঠন করলেন।

অজয়বাবু কিন্তু এক বিবৃতি দিয়ে বললেন : পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তি দলের সংগঠন কমিটি গড়ার অধিকার একমাত্র বাংলা কংগ্রেস ছাড়া কারু নেই। আমার সঙ্গে এই তথাকথিত কমিটির কোনও যোগাযোগ নেই। আমি এটা মানি না।

কবির সাহেব তখন ফ্রণ্টের ক্রিয়াকলাপেও ক্ষিপ্ত। ততদিনে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছে, কমিউনিস্টরা শৃংখলা চায় না, লুঠতরাজ চায়।

চোদ্দ তারিখ দিল্লি যাওয়ার আগে কবির সাহেব প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে দেখা করলেন। কবির তাঁকে বললেন : আমি এ মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবই। প্রফুল্লবাবু বললেন : ভালই তো, দেখুন না।

কংগ্রেস যে তখন অজয়বাবুর সঙ্গে অনেকদূর এগিয়েছেন, প্রফুল্ল সেন কিন্তু সেকথা কবির সাহেবকে জানতেই দিলেন না।

কংগ্রেসী নেতারা কথাটা তখন গোপন রেখেছিলেন ডঃ ঘোষের কাছ থেকেও।

পনেরোই চরম বিক্ষুব্ধ ডঃ ঘোষ প্রফুল্ল সেনকে ডেকে বললেন : একটা কিছু কর না।

প্রফুল্ল সেন তাঁকেও এড়িয়ে গেলেন। বললেন : আপনি লিডারসিপ নিন। সবাইকে সংঘবদ্ধ করুন। আমরা আছি।

আসলে কিন্তু প্রফুল্ল সেন তখন অজয়বাবুর সঙ্গে বিকল্প মন্ত্রিসভার প্ল্যান করছেন।

দোসরা অকটোবর

সাধারণত প্রতিদিনই দুপুর তিনটে সাড়ে-তিনটে নাগাদ রাইটারস বিলডিংসের প্রেস কর্ণারে রিপোরটারদের ভিড় জমে। একে একে বহু রিপোরটার এসে ওই ঘেরা জায়গায় হাজির হন। তারপর সুরু হয় রাউন্ড আর আড্ডা। রাউন্ড, অর্থাৎ মন্ত্রী এবং অফিসারদের ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ অভিযান। যেদিন রাউন্ডের বেশি কিছু থাকে না সেদিন প্রধানত চলে আড্ডা। আবার যেদিন কাজ বেশি থাকে সেদিন দুদন্ড এক ঠাঁই দাঁড়াবারও সুযোগ মেলে না।

তখন রাজ্যের রাজনীতিটা বেশ উত্তপ্ত। সুতরাং কাজ প্রচুর। আড্ডা কম, রাউন্ড বেশি। দুপুর তিনটে নাগাদ প্রেস কর্ণারে গিয়ে দেখি শূন্য, শুধু এককোণে বসে আছেন টাইমস অব ইন্ডিয়ার শংকর ঘোষ। শংকর ঘোষ আমাদের মধ্যে জ্ঞানে গুণে সিনিয়র। সবাই তাঁকে খাতির করে। জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার, আপনি একা বসে? শংকরবাবু জবাব দিলেন, সবাই রাউন্ডে গিয়েছে। আমি আর গেলাম না। তারপরই বললেন, শুনেছেন, অজয়বাবু আজ রাজভবনে প্রফুল্ল সেনের সংগে লাঞ্চ খেয়েছেন? আমাকে আতাউর রহমান খবরটা দিল।

আমি বললাম, না, শুনিনি। রাত্রে খবর নেব।

সেদিন ষোলই সেপ্টেম্বর। শনিবার।

অজয়বাবু যে তখন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এটা আমরা অনেকেই জানতাম। এও জানতাম, মুখ্যমন্ত্রী আর কমিউনিস্টদের সংগে একসংগে চলতে চাইছেন না। কিন্তু তিনি যে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসীদের সংগে, প্রধানমন্ত্রীর সংগে বেশ একটা মাষ্টার প্ল্যান করে ফেলেছেন এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী এগোচ্ছেন, সে খবরটা তখনও কেউ জানতে পারিনি। তাই, শংকরবাবুর কথাটা শুনে একটু চমকে উঠলাম। ভাবলাম, আতাউর রহমান হুমায়ুন কবিরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোক। নানা মহলের খবর রাখেন। তিনি যখন খবর দিয়েছেন তখন সেটা নিশ্চয়ই ভুল নয়।

কিন্তু কি করে জানা যায় লাঞ্চে কী হল? কে এই খবরটা দিতে পারেন?

অনেক ভাবলাম।...না, অজয়বাবু কিছুই বলবেন না।...প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞেস করাই বৃথা। তিনি হয়ত বলবেন, কোন্ অজয়ের কথা বলছ, আমাদের নর্থের অজয় ঘোষাল?...ধর্মবীর তো আরও-ই কিছু বলবেন না!

ভাবতে ভাবতে অফিসে ফিরলাম। শংকরবাবুকে বলে এলাম, কন্‌ফারম করতে পারলে জানাব।

অফিসে ফিরতেই বার্তা সম্পাদক বললেন, বাংলা কংগ্রেসের সমীর গাঙ্গুলী তোমায় খুঁজতে এসেছিল। না পেয়ে আমাকে বলে গিয়েছে, আজ নাকি অজয়বাবু এবং প্রফুল্ল সেন রাজভবনে লাঞ্চ খেয়েছেন। আমি বললাম, শুনেছি। কী হল জানবার চেষ্টা করছি।

আবার ভাবতে বসলাম, কে বলতে পারে কী হল লাঞ্চে? অনেক ভাবলাম। অনেকগুলি নাম মনে এল এবং মনে মনেই অনেকগুলি বাতিল করলাম।...এমন লোক চাই যাঁর কথা বিশ্বাস করা যায়। সেই লোক অজয়বাবু বা প্রফুল্লবাবু বা ধর্মবীরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠও হওয়া চাই। না হলে খবরটা সে জানবে কি করে! আবার সে লোক এ ব্যাপারে খুব বেশি জড়িত হলেও হবে না। কারণ তাহলে বলবেই না। ভাবতে ভাবতে প্রথম যে নামটা পছন্দ হল তাঁকেই ফোন করলাম। ভাল লোক। রাজনীতি করেন। কিন্তু তবু অত্যন্ত ভদ্র বলে পরিচিত। ভাবলাম, এ লোক মিছে কথা বলবেন না। ভাগ্য ভাল। এক ফোনেই পেয়ে গেলাম তাঁকে।[১] পেয়ে গেলাম খবরটাও। বললেন, "আমার নামটা আবার লিখে দেবেন না। আজকে ওদের কথা হল। বেশ ভালভাবেই কথা এগিয়েছে। অক্টোবরের প্রথম দিকেই নতুন সরকার হবে। সব ব্যবস্থা এবার থেকে ভালভাবেই এগোবে।"

পাকা খবর। এমন লোকের কাছ থেকে পাওয়া যে আর যাচাই নিষ্প্রয়োজন। রাত্রে সহকারী সম্পাদক সন্তোষ ঘোষ এবং বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরীকে জানালাম : অজয়বাবু প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে লাঞ্চে বসে ঠিক করে ফেলেছেন অক্টোবরের প্রথম দিকেই নতুন সরকার গড়বেন। এ সরকার আর চলবে না। সব ব্যবস্থা পাকা। খবরও পাকা। তবু সাবধানে লিখতে হবে। কারণ গোপন প্ল্যান। খবর বের হলে প্রতিবাদ আসবেই।

সন্তোষবাবু সাধারণত চটপট ডিসিসন নেন। বললেন, ঠিক আছে। লিখে ফেল। অমিতাভবাবুকে বললেন, অমিত, এইটাই লিড করে দাও আজ। এখন রাজনীতির বাজার গরম। এইটাই আজকের সবচেয়ে বড় খবর।

পরদিন সে খবর খুব বড় করেই বের হল এবং একমাত্র আমাদের কাগজেই বের হল। সেদিনটা রবিবার। বের হতেই বাজারে দারুণ হইচই।

রবিবার আমি অফিসে যাই না। রাতে সহকারী বার্তা সম্পাদক শান্তি মিত্র ফোন করলেন : ও বরুণ, অজয়বাবু যে ভীষণ কড়া কনট্রাডিকশন দিয়েছেন! বলেছেন, উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভট কাহিনী!

আমি বললাম, ঠিক আছে। কাল দেখা যাবে। আজকে আর কিছু লিখব না।

আরও রাত্রে শান্তিদা আবার টেলিফোন করলেন : বরুণ, ইউ এন আই বলছে অজয়বাবুর বিবৃতি কিল্‌ড। সুশীল ধাড়া একটা বিবৃতি দিয়েছে। তবে অনেক মাইল্ড।

আমি ততক্ষণে আবার সেই ভদ্রলোককে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছি। তিনি আশ্বস্ত করলেন, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। নিউজটা তিনি সকালেই পড়েছেন। তবে, অজয়বাবুকে তো বলতেই হবে খবর মিথ্যা। না হলে তিনি কি বলবেন খবর ঠিক? তা আর বলেন কী করে!

সোমবার সব কাগজে সুশীলবাবুর প্রতিবাদ বের হল। সি. পি. আইয়ের দৈনিক মুখপত্র 'কালান্তর' আবার অজয়বাবুর বিবৃতিও ছাপলেন এবং সবটা একটু রসিয়ে দেখাতে চাইলেন, যেন "এটা কংগ্রেসী এবং আনন্দবাজারী চক্রান্ত ছাড়া

---

[১] প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাঁর নামটা প্রকাশ করব না। তাই নামটা আজও জানাতে পারলাম না।

কিছুই নয়।"

দুপুরে প্রেস কর্ণারে গিয়ে দেখি আমার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। পি. টি. আই-র সুধীর চক্রবর্তী তো প্রায় তেড়ে মারতে এলেন : কি, তোমরা পেয়েছ কি? প্রত্যেকদিনই সরকার ফেলছ!...মন্ত্রীরাও বেজায় খাপ্পা। তাঁরা সবাই রায় দিলেন, আনন্দবাজার অত্যন্ত জঘন্য রোল প্লে করছে!

আমি সবাইকে একই জবাব দিলাম : বেশীদিন তো নেই, ধৈর্য ধরে দেখুন না কি হয়।

শুধু শংকরবাবু বললেন : গুড নিউজ, ঠিক আছে।

ব্যাপারটা সেদিন আমরা জানলাম এবং লোকে জানলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অজয়বাবুর মোটামুটি সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল আরও অনেক আগে। সেই সাতই আগস্ট। তারপর ধর্মবীরকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল দিল্লিতে। বিশে। তাঁকেও সব বুঝিয়ে বলা হয়েছিল। তিরিশে রাজ্যপালের সঙ্গে অজয়বাবু গোটা পরিকল্পনা নিয়ে কথা বললেন। তার দুদিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন অফিসারকে জানালেন তাঁর পরিকল্পনাটা।

তিনি তাঁদের সঙ্গে রাইটারস বিলডিংসে বসে কথা বলেননি। রাত দশটা নাগাদ ডেকে পাঠিয়েছিলেন বাড়িতে। চারজন অফিসারকে—চিফ সেক্রেটারি এম. এম. বসু, হোম সেক্রেটারি এস. বি. রায়, আই. জি. পুলিশ উপানন্দ মুখার্জী এবং পুলিশ কমিশনার পি. কে. সেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গোটা পরিকল্পনাটা জানিয়ে তাঁদের বললেন : এই আমার পরিকল্পনা। এখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আপনারা নিন।

অজয়বাবুর পার্টির লোকেরাও কিন্তু কেউ তখনও ব্যাপারটা জানতেন না। এমন কি সুশীল ধাড়াও না। প্রদেশ কংগ্রেসেরও জানতেন খুব কম লোক—প্রফুল্ল সেন, খগেন দাশগুপ্ত, বিজয় নাহার, অশোক সেন, তরুণকান্তি ঘোষ, পূরবী মুখার্জী প্রভৃতি সামান্য ক'জন। সিদ্ধার্থ রায়কে কিছুই জানান উচিত হবে না—এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওঁরা। তখন সিদ্ধার্থবাবু অতুল্যবাবুর অত্যন্ত অনুগত। যাঁরা সব করছিলেন তাঁদের ভয় ছিল, পাছে অতুল্যবাবু সব জেনে ফেলেন!

মূল পরিকল্পনাটা রচনা করেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। অশোক সেন এই পরিকল্পনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের যে বিবরণ দেন তা এইরকম : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অজয়বাবুর আলোচনার মূল কথা ছিল যে, প্রদেশ কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাতে হবে। পি. সি. সি-র আমূল পরিবর্তন চাই। তিনি বলেছিলেন যে, অতুল্যবাবুর দ্বারা যতদিন প্রদেশ কংগ্রেস পরিচালিত হবে ততদিন তার সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়।...প্রধানমন্ত্রীও ততদিনে অতুল্যবাবু সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ।...একটা সময়ে এসে স্থির হল এবং ওয়ার্কিং কমিটিও এটা পাশ করে দিলেন যে, নন্দজী গিয়ে তদন্ত করে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও রাজ্যের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে একটা পূর্ণ রিপোর্ট দেবেন। এবং তার ওপর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাস নির্ভর করবে।...তবে কলকাতায়ই অ্যাড হক কমিটি ঘোষিত হবে

আগে এটা কখনও ঠিক হয়নি।...নন্দজী কলকাতা আসার আগেই অবশ্য দিল্লিতে ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি রিপোর্টে বলবেন যে প্রদেশ কংগ্রেসকে গোষ্ঠী-শাসনের কবলমুক্ত করার জন্য অ্যাড হক করা প্রয়োজন।...অ্যাড হক হবে এবং অজয়বাবু চলে আসবেন।[২]

নন্দজী কলকাতা এলেন উনিশে সেপ্টেম্বর। কথা ছিল তিনি বদ্রী পোদ্দারের বাড়িতে উঠবেন। কিন্তু তরুণকান্তি ঘোষের পরামর্শে অশোক সেন স্থির করলেন নন্দজী উঠবেন বারাসতে শিশিরকুঞ্জে। যুক্তিটা হল, "বদ্রীর বাড়িতে অজয়দার সঙ্গে কথা বলায় নন্দজীর অসুবিধা হবে।"[৩] ততদিনে তরুণবাবু এই টপলিং গেমে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

যাতে কলকাতায় নন্দজীর কাজে কোনও অসুবিধা না হয় এবং যাতে তার আগে অজয়বাবুতে প্রফুল্লবাবুতে একটা মধুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়ে থাকে সেই উদ্দেশ্যেই ধর্মবীর যোলই-র লাঞ্চের ব্যবস্থা করলেন। নন্দজী কলকাতা আসার দুদিন আগে নির্বাচনের সময় থেকেই প্রফুল্লবাবু ও অজয়বাবুর সম্পর্কে বেশ তিক্ত হয়ে উঠেছিল। ধর্মবীরের লাঞ্চে সেই তিক্ততা পুরো কেটে গেল। সেই মধ্যাহ্নভোজে নিত্যানন্দ কানুনগোও উপস্থিত ছিলেন। তবে, খাওয়াটা হয়ে যাওয়ার একটু পরেই ধর্মবীর এবং কানুনগো অজয়বাবু ও প্রফুল্লবাবুকে নিভৃত আলোচনার সুযোগ দিয়ে উঠে গেলেন।

একথা সেকথার পর আসল প্রসঙ্গ এল—কবে পদত্যাগ করা এবং নতুন সরকার গঠন করা। দুদিন পরেই অর্থাৎ আঠারোই কলকাতায় কংগ্রেসের খাদ্য মিছিল বের হবার কথা ছিল। প্রফুল্লবাবু প্রস্তাব করলেন, তার আগেই করুন না। অজয়বাবু বললেন, না, অত তাড়াতাড়ি হয় না। দোসরা অক্টোবরের মধ্যে হবে। প্রফুল্লবাবু সেইদিনই অজয়বাবুকে কংগ্রেসে ফিরে আসার আমন্ত্রণও জানালেন। অজয়বাবু জবাবে বললেন, মার্চ পর্যন্ত দেখবেন। 'যদি ঠিকভাবে মিলেমিশে কাজ হয় তাহলে মার্চে কংগ্রেসে যোগ দেব'।[৪]

প্রফুল্লবাবু ফিরে এসে একান্ত বিশ্বস্ত ভাইদের সব কথা জানালেন। ভাইরা সবাই খুব আনন্দিত হলেন; সমস্বরে বললেন, তাহলে এতদিনে যুক্তফ্রন্টের গঙ্গা-যাত্রার পাকা ব্যবস্থা করা গেল!

এরপর থেকে দোসরা অক্টোবরের মধ্যে অজয়বাবুর সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর আরও চার বার গোপন বৈঠক হল। সে সব বৈঠকের বিবরণ একেবারে নাটক-নভেলের মত।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শুতে যাওয়ার আগে অজয়বাবু সিকিউরিটির

---

[২] অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০।

[৩] অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০।

[৪] প্রফুল্ল সেন। সাক্ষাৎকার ২৭-৫-৭০।

লোককে বলতেন, তুমি এবার যাও। আমি ঘুমতে যাব। আর দরকার নেই। সে চলে যেত। ফ্লাটের সব আলো নিভে যেত। বেলভেডিয়ার অঞ্চল এমনিতেই অত রাতে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

...তারপর একখানা গাড়ি ঢুকত বেলভেডিয়ারে সরকারী কোয়ার্টার্সে। সাধারণত কালো অ্যামবাসেডর। পত্রিকা হাউসের গাড়ি। সঙ্গে থাকতেন তরুণ-বাবুর কোনও জ্ঞাতিভ্রাতা বা কোনও একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী। গাড়ি অজয়-বাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে পাস করে যেত। চলন্ত অবস্থায়ই পর পর দুবার তাঁর ফ্লাটের সামনে হর্ন দিত। এবং তারপর ঘুরে গিয়ে দূরে দাঁড়াত।

তারও একটু পরে অজয়বাবু আপাদমস্তক চাদরে মুড়ে বেরিয়ে আসতেন। আস্তে সেই গাড়িতে গিয়ে বসতেন। গাড়ি তাঁকে নিয়ে সোজা ছুটত বারাসতে। শিশিরকুঞ্জে। তরুণবাবুর বাড়িতে। ততক্ষণে আরও একখানা গাড়ি এসে পেঁছে গিয়েছে। সে গাড়ি মিডলটন রো'র ফ্লাট থেকে তুলে নিয়ে এসেছে প্রফুল্ল সেনকে।

তিনজনে আলোচনা হত। সব প্ল্যান হত। খাওয়া-দাওয়া ঐখানেই সারতেন সবাই। তারপর দেড়টা দুটো নাগাদ আবার যে যাঁর বাড়ি ফিরতেন। আবার দুখানা অ্যামবাসেডর বারাসত থেকে কলকাতা ছুটত।

নন্দজী যখন কলকাতায় উপস্থিত তখনও এইরকম একটা মিটিং হল শিশির-কুঞ্জে। নন্দজীর সঙ্গে চূড়ান্ত কথা হল অজয়বাবুর : অ্যাড হক হবে এবং দোসরাই অজয়বাবু নতুন মন্ত্রিসভা করবেন। সেখানে তখন প্রফুল্ল সেনও উপস্থিত।[৫]

নন্দ কলকাতা এলেন উনিশে। তিনি তখন আর মন্ত্রী নন। কিন্তু তবু তাঁর চালচলন দেখে মনে হল, রাজা রাজ্যজয়ে এসেছেন।

তখন নন্দজীর বুক ফুলিয়ে চলারও কথা। অতুল্যবাবু তাঁর অনেক দিনের শত্রু। সেই অতুল্যবাবুকে তাঁর রাজ্যেই খতম করতে এসেছেন। পেছনে প্রধান-মন্ত্রী ও টাকার থলিরা। সামনে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। হাতের পাশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। নন্দ ধরাকে সড়াজ্ঞান করলেন।

চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত কলকাতা কাটালেন। প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত কর্মব্যস্ত। গোপনে, প্রকাশ্যে, একান্তে. টেলিফোনে আলোচনার পর আলোচনা হল। কংগ্রেস ভবনের কর্মীসভায় অবশ্য অতুল্যবাবুর সমর্থকরা বেশ কিছুটা বিষোদ্গার করলেন। কিন্তু নন্দ তাতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। পরদিনই অতুল্যবাবুর বিরোধীরা নন্দর জয়গান গাইলেন। নন্দ মহাখুশী।

নন্দ সেই যাত্রায় কলকাতায় শুধু একজনকে এড়িয়ে চলেছিলেন। সেই একজন অতুল্য ঘোষ। অতুল্য ঘোষ তখন প্রতিদিন কংগ্রেস ভবনেও যেতেন। নীচের তলায় হল-ঘরে নন্দ সভা করতেন, আর ওপর তলার বড় ঘরে বসে অতুল্যবাবু ভাইদের বলতেন, শক্ত হয়ে দাঁড়াও। নন্দ একবারও অতুল্যবাবুর সঙ্গে কথা বললেন না।

নন্দ যখন ধর্মবীর, অজয়বাবু, প্রফুল্লবাবু, খগেনবাবু, বিজয়বাবু, তরুণবাবু

---

[৫] প্রফুল্ল সেন। সাক্ষাৎকার ২৭-৫-৭০।

প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সব পাকা করে ফেললেন তখন একদিন প্রফুল্ল সেন অতুল্য ঘোষের মুখোমুখি বসলেন।

মুখোমুখি বসেই সোজাসুজি কথাটা বললেন প্রফুল্ল সেন : অতুল্য, এখানে অ্যাড হক কমিটি করতে হবে। নন্দজী অ্যাড হক ঘোষণা করবেন।

অতুল্য ঘোষ ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা আঁচ পেয়েছিলেন। রাগে ফুলছিলেন। এবার ফেটে পড়ার একটা সুযোগ পেলেন : কে নন্দ? নন্দ কে? কি অধিকারে নন্দ এখানে অ্যাড হক করবে?...না, তা হতে পারে না, তা হবে না, আমি থাকতে হবে না।

প্রফুল্ল সেনও রেগে উঠলেন : তুমি কি ডিকটেটর!

অতুল্যবাবু জবাব দিলেন : না, আমি ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বর, কংগ্রেসের একটা রীতিনীতি আছে। কতকগুলি নিয়মকানুনে কংগ্রেস চলে। খেয়ালখুশীতে চলতে পারে না। কংগ্রেসের কনস্টিটিউশন অনুসারে কোথাও অ্যাড হক করতে গেলে তার কতকগুলি কারণ চাই। ইমারজেনসিতে প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু নন্দ কে?...ইলেকসনে হেরেছি বলেই যদি পশ্চিমবঙ্গে অ্যাড হক করতে হয় তাহলে তো অন্য বহু রাজ্যেও সেই ব্যবস্থা নিতে হয়! কই, তা তো হয়নি? নন্দকে তো একাজে ওয়ার্কিং কমিটি কলকাতা পাঠায়নি। তাঁর দায়িত্ব ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের সংগঠন ও পরিষদীয় শাখায় ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করা। অ্যাড হকের কথা নন্দজী তুলছেন কি করে?[৬]

প্রফুল্ল সেন এবার একটু নরম হলেন : অতুল্য, অজয়বাবু কথা দিয়েছেন অ্যাড হক করা হলে তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে চলে আসবেন। তাই অ্যাড হক করতে হবে। তুমি রাজী হয়ে যাও।

অতুল্যবাবু এবার সবটা বুঝতে পেরে আরও খাপ্পা : যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসে অ্যাড হক! তা কিছুতেই হতে পারে না। এমন যুক্তিতে কোনও দিন কংগ্রেসে অ্যাড হক হয়নি; আজও হতে পারে না। আমি নীতিগতভাবে ষড়যন্ত্র করে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে ফেলার বিরুদ্ধে। আমি নীতিগতভাবে অ্যাড হক করারও বিরুদ্ধে। আমি দুটোই অপোজ করব।

প্রফুল্ল সেন নানাভাবে অতুল্য ঘোষকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পরদিন সকালে আবার আরও কয়েকজনে মিলে অনুরোধ জানালেন। পশ্চিমবাংলার স্বার্থ, কমিউনিস্টদের ভয়াবহ পরিকল্পনা, কংগ্রেসের ভবিষ্যত—নানা যুক্তি দেখিয়েও কিছু হল না। অতুল্যবাবু কিছুতেই রাজী হলেন না।

শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল সেনই বললেন, আচ্ছা, তুমি যখন আপত্তি করছ তা হলে এখন না হয় অ্যাড হক ঘোষণা করা হবে না। পরে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।[৭] সেদিন চব্বিশে সেপ্টেম্বর।

দুপুরে সবাই আবার নন্দজীর সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসে। টেলিফোনে আকারে ইংগিতে অজয়বাবুর সঙ্গেও কথা হল।

---

[৬] অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

[৭] অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

নন্দ বললেন, অ্যাড হক হবেই, কথা দিচ্ছি। অজয়বাবু বললেন, না এখনই প্রেসকে বলতে হবে যে অ্যাড হক হচ্ছে।[৮]

নন্দ অতুল্য ঘোষের মনোভাব জানতেন। তাই তাঁর মনে মনে বেশ ভয়ও হয়েছিল। একা সবটা ঝুঁকি নিতে সাহস পেলেন না। দিল্লিতে টেলিফোন করলেন। কিন্তু হায়, দিল্লিতে তখন প্রধানমন্ত্রীও নেই, কংগ্রেস সভাপতিও নেই! কংগ্রেস সভাপতি যে তখন মাদ্রাজের কোন্ গ্রামে ঘুরছেন দিল্লিতে বা মাদ্রাজ শহরে কেউ তা বলতে পারলেন না।

অশোক সেন তখন দিল্লিতে। অগত্যা নন্দ তাঁকে ধরলেন। বললেন: শুনেছি প্রধানমন্ত্রী আজই দিল্লিতে ফিরবেন। তুমি তাঁকে সব বুঝিয়ে বল। অ্যাড হক আজই ঘোষণা করতে হবে। না হলে সব দেরি হয়ে যাবে।

অশোক সেন জবাব দিলেন: এসব কথা সোজাসুজি হওয়াই ভাল। প্রধানমন্ত্রী বোধহয় বম্বেতে। আপনি তাঁকে সেখানে ফোন করুন। নন্দ তাই করলেন। প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েও গেলেন। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, ও-কে, এগিয়ে যাও।[৯]

তাই শুনে পত্রিকা ভবনে সবাই আনন্দিত। ও বাড়ির ছাতে অহোরাত্র নামসংকীর্তন হয়। নীচ থেকে হুকুম গেল, আরও জোরে নাম হোক!

খবরের কাগজে কাগজে খবর গেল, আজ বিকালেই নন্দজী কংগ্রেস ভবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্স করবেন।

আমরা কলকাতার বেশ কয়েকজন রিপোর্টার কিন্তু আগে থেকেই জানি ব্যাপারটা। নন্দ কী বলবেন, কেন বলবেন, মোটামুটি সবই জানা ছিল।

বিকেলে বহু রিপোর্টার কংগ্রেস ভবনে হাজির হলাম। প্রথমে এলেন প্রফুল্ল সেন। তাঁর পেছনে পেছনে খগেনবাবু, বিজয়বাবু, পুরবী মুখার্জী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রফুল্লবাবু বেশ খোসমেজাজে। খগেনবাবুরও বেশ হাসিখুশিভাব।

খগেনবাবুকেই জিজ্ঞেস করলাম: ছাব্বিশে জুলাই ব্যর্থতার পর এইটা তা হলে দ্বিতীয় অ্যাটেম্পট?

খগেনবাবু ছাব্বিশের কথা স্রেফ অস্বীকার করলেন: ছাব্বিশে আবার কী হয়েছিল?

আমি বললাম, কেন, সেই ডঃ ঘোষের ব্যাপারটা। যেটা ফেল করেছিল শেষ মুহূর্তে।

খগেনবাবু তবু বললেন, না, কিছুই ফেল করেনি।...

প্রফুল্ল সেনই তাঁকে বাধা দিলেন: কেন চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছেন খগেনবাবু। বলুন না, সেবার ফেল করেছিল, কিন্তু এবার ফেল করবে না!

আমি বললাম: যদি করে?

প্রফুল্লবাবু জবাব দিলেন: না, এবার আর করবে না, সব ব্যবস্থা পাকা।

---

৮ অজয় মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ৭-৬-৭০।

৯ অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০। প্রধানমন্ত্রীর জবাবটা অশোক সেন নন্দের কাছেই শুনেছিলেন।

ক্রুশ বহনকারী
অ্যাড হক কমিটি

ইতিমধ্যে নন্দ এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে তরুণকান্তি ঘোষ। নন্দ এসেই একটা টাইপ-করা কাগজ পড়ে গেলেন এবং তার কপি রিপোর্টারদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল। মর্মকথা: আমি এতদ্দ্বারা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে অ্যাড হক কমিটি করে যাচ্ছি। তবে, অ্যাড হকের নামগুলি দিল্লি থেকে ঘোষিত হবে।

রিপোর্টাররা সবাই নন্দকে প্রশ্ন করতে চাইলেন। নন্দ বললেন, কোনও প্রশ্নের জবাব দেব না। টাইপ-করা কাগজে যা বলা হয়েছে তার বেশি বলার কিছু নেই।

নন্দ রাজার মত ঢুকেছিলেন। রাজার মতই বেরিয়ে গেলেন এবং সেদিন রাত্রেই বিমানে দিল্লি পৌঁছে গেলেন।

পরদিন ভোরে দিল্লি গেলেন অজয়বাবু।

ততক্ষণে কাগজে কাগজে বেরিয়ে গিয়েছে অ্যাড হকের খবর। এও বেরিয়েছে যে অতুল্যবাবু এর ঘোরতর বিরোধী। তিনি একটা কড়া বিবৃতিও দিলেন। আনন্দবাজারে অ্যাড হকের সংবাদের সঙ্গেই খবর দিলাম : বিকল্প সরকার গঠনের আশায়ই অ্যাড হক করা হল। ১লা অক্টোবর নাগাদ নতুন সরকার হবে। অজয়বাবু কংগ্রেসের কাছে ফিরে যাবেন।[১০]

পরদিনই কিন্তু দিল্লি পৌঁছে নন্দ বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। তিনি ঘোষণা করে গিয়েছিলেন, দিল্লি থেকে পরদিনই অ্যাড হক কমিটি ঘোষণা করবেন। কিন্তু পারলেন না। বাধ সাধলেন কামরাজ। মাদ্রাজ থেকে তিনি টেলিফোনে কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সাদিক আলিকে অ্যাড হক কমিটির ঘোষণা বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন।

নন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী প্রমাদ গণলেন। ইন্দিরা নন্দকে মাদ্রাজে গিয়ে কামরাজের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।[১১] নন্দ অজয়বাবুকে বললেন, ভাববার কিছু নেই, সব ঠিক আছে। প্রধানমন্ত্রীও সুরেন ঘোষ মারফৎ অজয়বাবুকে একই কথা জানালেন। অজয়বাবুও বললেন, ঠিক আছে, সব ব্যবস্থা যথারীতি এগোচ্ছে।

নন্দ মাদ্রাজ গেলেন ঊনত্রিশ তারিখে। সেখানে কামরাজের উপস্থিতিতে সাংবাদিকদের কাছে তিনি ঘোষণা করলেন : কংগ্রেস সভাপতি পশ্চিমবঙ্গে অ্যাড হক কমিটি করার প্রস্তাবে রাজী। কামরাজ নিজে কিন্তু কিছুই বললেন না। ততদিনে তিনি অতুল্য ঘোষের চিঠিও পেয়ে গিয়েছেন। অতুল্যবাবু তাঁর বক্তব্য জানিয়ে কামরাজকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন।

---

১০ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫-৯-৬৭। হঠাৎ তখন নন্দ স্থির করেছিলেন ১লা অক্টোবরই নতুন সরকার হবে। সেইমত ১লা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের মিটিংও ডাকা হয়েছিল।

১১ অশোক সেন। সাক্ষাৎকার ৮-৬-৭০।

ইতিমধ্যে অজয়বাবু কলকাতা ফিরে এসেছেন। আটাশের সকালের প্লেনে কলকাতা ফিরে সোজা রাইটারস বিলডিংসে গেলেন। দফতরে পেঁছে প্রথমেই ডাকলেন নিশীথ কুন্ডুকে। সব বললেন। তারপর ডাকলেন হেমন্ত বসুকে। তাঁকেও সব বললেন। হেমন্তবাবুকে আরও বললেন : আপনারা আসছেন তো নতুন সরকারে? হেমন্তবাবু সেই প্রশ্ন শুনেই ছুটলেন পারটি অফিসে। গিয়ে অশোক ঘোষকে সব বললেন। অশোকবাবু জবাব দিলেন, না, তা হতে পারে না। আপনি স্রেফ বলে দিন অজয়বাবুকে, আমরা এব্যাপারে নেই। আমরা এর বিরুদ্ধে।

তারপরই মুখ্যমন্ত্রী একে একে ডাকলেন চারজন প্রধান অফিসারকে। তাঁদের জানালেন সব। দিল্লির কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার কথা। রাজনৈতিক পারট নয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অংশ।

তারপরই তাঁর ঘরে ঢুকলাম আমরা রিপোর্টাররা। অজয়বাবু একটা বড় কিছু করছেন, একথা তখনও কলকাতার অনেক রিপোর্টার বিশ্বাসই করতে রাজী নন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেদিন রিপোর্টারদের কথোপকথনের বিবরণটা বড় সুন্দর। কতকটা তুলে দিচ্ছি :

প্রশ্ন : শুনছি, রবিবার সকালে কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিজয় সিং নাহারের উপস্থিতিতে প্রফুল্ল সেন অতুল্য ঘোষকে বলেছেন যে, নতুন সরকার হবে এবং আপনি নাকি সেই সরকারের নেতৃত্ব করবেন?

মুখ্যমন্ত্রী : এসব কথা আপনাদের কে বলেছেন, প্রফুল্লবাবু?

রিপোর্টার : না।

মুখ্যমন্ত্রী : তাহলে কে বলেছেন? লিখে দিন কে বলেছেন। আমি প্রফুল্লবাবুর কাছে জানতে চাইব।

রিপোর্টার : আমরা আমাদের সংবাদসূত্র বলতে পারি না।

প্রশ্ন : যুক্তফ্রন্ট সরকারের বর্তমান অবস্থা কি চলতে থাকবে?

মুখ্যমন্ত্রী : কেন চলবে না?

প্রশ্ন : অ্যাড হক কমিটি কার্যকর হলে আপনি কি কংগ্রেসের কাছে ফিরে যাবেন?

মুখ্যমন্ত্রী : কোথায় আমি ফিরে যাব?

সেইদিনই কয়েকজন মন্ত্রীও অজয়বাবুর কাছে গিয়ে একথা সেকথার পর আসল কথাটা তুললেন : কাগজে কি সব বের হচ্ছে?

মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে সকলকে জবাব দিলেন : যেমন চলছে তেমনি চলবে, ওসব খবর ভিত্তিহীন।

পরদিন অজয়বাবু ভীষণ কর্মব্যস্ত। দুপুরে তিনি যথারীতি রাইটারস বিলডিংসে কাজ করলেন। অফিসারদের দফে দফে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রীদেরও অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন। একসময় জ্যোতিবাবুকে ধরে নিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ মুখার্জী। ছোড়দাকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলার জন্য। বিশ্বনাথবাবু অবশ্য তখনও জানেন না যে, অজয়বাবু কিভাবে এগোচ্ছেন। তবে, এটা তিনি

জানতেন যে সি. পি. এম সমর্থক সরকারী কর্মচারীদের হাঙ্গামার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি ও ব্যাপারে তাঁদের দিয়ে একটা বিবৃতি দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। জ্যোতিবাবু বিশ্বনাথবাবুকে কথাও দিয়েছিলেন যে, এ বিবৃতি তিনি ইস্যু করিয়ে দেবেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তা পারেননি। বিশ্বনাথবাবু সেই কথা বুঝিয়ে বলার জন্যই জ্যোতিবাবুকে ছোড়দার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১২] কিন্তু কাজ হল না। কারণ চিফ সেক্রেটারি এবং আই. জি এই সময়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের বসতে বললেন।

সন্ধ্যায় অজয়বাবু যথারীতি যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল খাদ্য। সেখান থেকে গেলেন রাজভবনে। ধর্মবীরের সঙ্গে কথা বলতে। তারপর বসলেন বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে। কবির গ্রুপের কেউ নয়; শুধু সুশীল ধাড়া, সুকুমার রায়, কানাই ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

তাঁর গোটা প্ল্যানটা তিনি তাঁদের বললেন। এই প্রথম। দিল্লির সঙ্গে কী কথা হয়েছে, কী কী ব্যবস্থা উনি ইতিমধ্যে নিয়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনে সবাই ট্যারা। আপত্তি জানালেন প্রায় সবাই। বললেন, এই সেদিনই তো ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. এস. পি, পি. এস. পি প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে বসে আমরা ঠিক করেছি যে, এই মন্ত্রিসভা চলবে। এখন আবার এসব কথা বললে...

অজয়বাবু সবাইকে থামিয়ে দিলেন : না, আমি ওদের যথেষ্ট ইংগিত দিয়েছি। ওরা যদি তাতেও না বোঝে কি করব। আর ওদের জন্য অপেক্ষা করা যায় না। সব ব্যবস্থা পাকা। যে আসতে হয় এস, না হয় আমি যাব। আমি কথা দিয়েছি। ...আমি আর সি. পি. এমের সঙ্গে চলে দেশের ক্ষতি করতে চাই না। তাতে যদি আমার ক্ষতি হয় তো হোক। ব্যক্তির চেয়ে দেশ বড়। আমি দেশের শত্রু সি. পি. এম-কে এভাবে প্রশ্রয় দিতে চাই না, দেব না। আমি এ সরকার ভেঙ্গে নতুন সরকার গড়বই। যার ইচ্ছা আসুন, না আসবেন আমি একাই যাব।[১৩]

সবাই চুপ করে রইলেন। শুধু সুশীল ধাড়া বললেন : যদিও এতে আমার মত নেই, যদিও আমি এটা ভুল বলে মনে করি, তবু আমি আপনার সঙ্গেই যাব। এতদিন সঙ্গে থেকেছি, আজও থাকব।

বৈঠক ভেঙ্গে গেল। তারপর গভীর রাত্রে এল সেই গাড়ি। সেই পর পর দুবার হর্ণ। অজয়বাবু চললেন বারাসতে শিশিরকুঞ্জে। সেখানে ততক্ষণে প্রফুল্ল সেনও পৌঁছে গিয়েছেন।

অজয়বাবু প্রথমেই প্রফুল্ল সেনকে বললেন, নতুন মন্ত্রিসভায় সি. পি. আই-কেও নিতে হবে। শুনে প্রফুল্ল সেন তো অবাক। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন, না, তা হয় না। কোনও কমিউনিস্টকে নিলে আমাদের সমর্থন পাবেন না।

এরপর অজয়বাবুর কাছে যা শুনলেন তাতে প্রফুল্ল সেনের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথাই বের হল না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন : আপনার প্রধানমন্ত্রীই তো তাই চাইছেন। আপনার আপত্তি কেন?

---

[১২] বিশ্বনাথ মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০।
[১৩] সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০।

প্রফুল্ল সেন বেজায় সামলে নিয়ে তারপরও বললেন : না, তা হয় না।[১৪]

কিন্তু এই প্রস্তাবনা বা প্রত্যাখ্যানের ফলে মূল পরিকল্পনার যে কোনও হেরফের ঘটল তা নয়। তারপরও আলোচনা হল, প্রথম দিন কে কে মন্ত্রী হবেন। কে কার কাছে প্রস্তাবটা দেবেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অজয়বাবু বললেন, প্রথম দিন তিনি, সুশীল ধাড়া, জাহাঙ্গীর কবির, চারুমিহির সরকার, ডঃ ঘোষ এবং দেওপ্রকাশ রাই শপথ নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী ততদিনে হেমন্ত বসু ও তাঁর দল ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছেন। কিন্তু নিশীথনাথ কুণ্ডু সম্পর্কে পুরোপুরি আশা ছাড়েননি।

সবচেয়ে মজার জিনিস, কে কে মন্ত্রী হবেন, কে কাকে খবর দেবেন এসব যখন ঠিক হচ্ছে তখন আসল লোকেরা অর্থাৎ যাঁরা মাথায় মুকুট পড়বেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুশীল ধাড়া ছাড়া আর কেউই কিচ্ছু জানেন না!

এদিকে ততক্ষণে কিন্তু বামপন্থী মহলে খবরটা ভালভাবেই পৌঁছে গিয়েছে। অজয়বাবুর মুখে সব শুনে সেই রাত্রেই সুকুমার রায় অশোক ঘোষকে সব জানিয়ে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কী কী বলেছেন, তাঁরা কে কী জবাব দিয়েছেন সব সব।

অশোক ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর মানসিক অবস্থাটা মোটামুটি জানতেন। বেশ কয়েকদিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ফ্রণ্টের অকমিউনিস্ট দলগুলিকে ডেকে গোপনে বলছিলেন[১৫] : সি. পি. এম, এস. ইউ. সি এদের নিয়ে আর চলা যাচ্ছে না, একটা কিছু করতে হবে। বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই কথা বলতেন অজয়বাবু। কিন্তু তিনি যে কংগ্রেসের সঙ্গেও এ নিয়ে কথাবার্তা বলছেন, তা একবারও এদের বুঝতে দেননি।

এইসব মিটিং-এ হাজির থাকতেন বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. এস. পি, পি. এস. পি এবং লোকসেবক সংঘ। সকলেই সি. পি. এমের আচরণে কম বেশি বিক্ষুব্ধ। কিন্তু কেউ ফ্রণ্ট ছাড়তে বা সরকার ভাঙতে উৎসাহী নন। একমাত্র নিশীথ কুণ্ডু এইসব বৈঠকে অজয়বাবুকে খুব জোরদারভাবে সমর্থন করতেন। তিনিও বলতেন, না, এদের সঙ্গে আর চলা যায় না। তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর মতই বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে জানাতেন : সি. পি. এম ব্যাপক হাঙ্গামা করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে।

এই পর্যায়ের শেষ বৈঠক হয় একুশে সেপ্টেম্বর। কানাই ভট্টাচার্যের বাড়িতে। শেষ বৈঠকে তিনটে সিদ্ধান্ত হল : (১) অ-কংগ্রেস অ-কমিউনিস্ট বিকল্প সরকার

---

[১৪] প্রফুল্ল সেন। সাক্ষাৎকার ২৭-৫-৭০। "১লা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এলেন। দুপুরে দমদম থেকেই টেলিফোনে বললেন : প্রফুল্লবাবু, প্রধানমন্ত্রীর একটা জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছি। এখুনি যাচ্ছি আপনার ওখানে। এসে বললেন, প্রধানমন্ত্রীর রিকোয়েস্ট সি. পি. আই-কে নতুন সরকারে নিতেই হবে। আমি বললাম, আমি তাতে কিছুতেই রাজী নই, সব কমিউনিস্টই সমান।"

[১৫] গোপন মিটিংগুলি হত বেশি রাত্রে। হয় মুখ্যমন্ত্রীর ফ্লাটে, না হয় বাংলা কংগ্রেসের ট্রেজারার কানাই ভট্টাচার্যের বাড়িতে চেতলায়।

গঠনের চেষ্টা করা অনুচিত। (২) কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এবং (৩) চোদ্দ দলের যুক্তফ্রন্ট সরকারই চলবে। তবে, অ-কমিউনিস্ট দলগুলি নিজেদের মধ্যে আরও যোগাযোগ রেখে চলবেন। তাঁদের মন্ত্রীরা সর্বদা মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়াবেন এবং অজয়বাবু শক্ত হাতে হাল ধরবেন।[১৬]

এই শেষ বৈঠকেও অজয়বাবু উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দল বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়া এবং সুকুমার রায়ও সোৎসাহে প্রস্তাবগুলি মেনে নিয়েছিলেন। যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি হল অজয়বাবু কিন্তু তখন মোটামুটি চুপচাপই ছিলেন।

কানাই ভট্টাচার্যের বাড়ি শেষ বৈঠকের পরে সবাই ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও ওই সব সিদ্ধান্তমত এগোবেন। অশোক ঘোষও তাই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম খটকা লাগে হেমন্ত বসুর কথা শুনে, আটাশে সেপ্টেম্বর : তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই কিছু করছেন? পরদিনই তাঁর সব সংশয় মিটিয়ে দেন সুকুমার রায়। অজয়বাবুর গোটা প্ল্যানটা তিনি অশোকবাবুকে জানিয়ে বললেন : আমরা ফেল করেছি, এবার আপনারা সবাই দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন।[১৭]

পরদিন ভোরেই অশোকবাবু প্রথমে ধরলেন বিশ্বনাথ মুখার্জীকে। কাক না ডাকতেই ফোন করলেন। বিশ্বনাথ মুখার্জী তখন ঘুমচ্ছেন। ফোন ধরলেন গীতা মুখার্জী। বললেন : মিস্টার এখন ঘুমচ্ছে। কাল অনেক রাত্রে ফিরেছে। একটু পরে ফোন করুন না।

অশোকবাবুর তখন অপেক্ষা করার মত অবস্থা নয়। বললেন, উনি তো ঘুমচ্ছেন, এদিকে যে সব যাচ্ছে! এখন যদি না তোলেন, তাহলে কিছুই আর রক্ষা করা যাবে না।

গীতা মুখার্জী এবার তাঁর মিস্টারকে তুলে দিলেন। অশোক ঘোষ সব বললেন। যা যা শুনেছেন।

ইতিবৃত্তান্ত শুনে বিশ্বনাথবাবুর তো চক্ষু চড়ক গাছে! বললেন : তাহলে?

অশোকবাবু জবাব দিলেন : এখন আর তাহলে-টাহলে নয়। ছুটুন বেলভেডিয়ারে। দেখুন আটকানো যায় কিনা।

বিশ্বনাথ গীতা দুজনেই ছুটলেন বেলভেডিয়ারে।[১৮]

অজয়বাবু কিন্তু তাঁদের তেমন কথা বলার সুযোগই দিলেন না। যতবার কথাটা তুলতে গেলেন তাঁরা ততবারই পাশ কাটিয়ে গেলেন। সেদিন ছিল রবিবার। তবু অজয়বাবু জরুরী কাজে রাইটার্স বিলডিংস-এ বেরিয়ে গেলেন। অফিসারদের সঙ্গে বসে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বললেন।

রাত্রে আবার বিশ্বনাথবাবু ছোড়দাকে ধরলেন। কিন্তু এবারও অজয়বাবু তাঁকে বেশি আমলই দিলেন না। বহু চেষ্টায়ও কিছু হল না। গভীর রাত্রে ব্যর্থ হয়ে বিশ্বনাথবাবু ফিরে এলেন।

---

[১৬] আনন্দবাজার ২২-৯-৬৭।

[১৭] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

[১৮] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

পরদিন সকালে আবার অশোক ঘোষের সঙ্গে কথা হল। বিশ্বনাথবাবু জ্যোতিবাবুকেও গোটা পরিস্থিতিটা জানালেন। জ্যোতিবাবুও তাঁকে বললেন, যে কোনও ভাবে অজয়বাবুকে আটকাতে হবে। আমরা পূর্ণ সহযোগিতায় রাজী। কী কী করতে হবে আমাকে বলবেন।[১৯]

বিশ্বনাথবাবু তারপরই ছুটলেন বাংলা কংগ্রেসের অফিসে। সেখানে সুশীল ধাড়ার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

সুশীলবাবু বললেন : নানাভাবে জুলুম চলেছে, নানা অবিচার হয়েছে, দাদা ভীষণ চটে আছেন, এখন আর কিছু করা যাবে বলে মনে হয় না।

অনেক অনেক পরামর্শ হল দুজনে।

বিশ্বনাথবাবু জানতেন, সুশীল ধাড়াকে সঙ্গে না পেলে কিছুই হবে না। সুশীল ধাড়ার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তিনি এব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না। তাঁর একটা সুবিধা হয়ে গেল, সুশীল ধাড়াও মনেপ্রাণে অজয়বাবুর এই মুভ-এর বিরুদ্ধে ছিলেন।

অনেক অনেক আলোচনার পর সুশীলবাবু এবং বিশ্বনাথবাবু স্থির করলেন, কিছু করতে হলে সতীশ সামন্তকে আনতে হবে। সতীশবাবুর উপর অজয়বাবুর বিরাট আস্থা। দুজন দীর্ঘদিনের সহকর্মী। বরাবর একসঙ্গে চলেছেন। সতীশ-বাবু তখন তমলুকে। ফোন করে সুশীলবাবু বললেন : আজ বিকালেই এসে পেঁছতে হবে, যেমন করে হোক।

সন্ধ্যে বেলাই সতীশবাবু এসে পেঁছলেন। দিন তিনচার আগে তিনি অজয়-বাবুর সঙ্গে একই প্লেনে দিল্লি থেকে ফিরেছিলেন। তারপর দমদম থেকেই চলে গিয়েছিলেন তমলুক। অজয়বাবুর প্ল্যানটা তিনি মোটামুটি জানতেন। সুশীল ধাড়ার কাছে আবার সব শুনলেন। বিশ্বনাথবাবুর কাছেও কিছুক্ষণ পরেই সব জানলেন। তারপর বললেন : দেখি কি করা যায়। ভীষণ চটে আছে।

রাত্রে বিশ্বনাথ মুখার্জী আবার ছোড়দাকে গিয়ে ধরলেন। বার বার তিনি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন : সি. পি. এম সম্পর্কে যতটা শুনছ ততটা ঠিক নয়। আর জ্যোতিবাবু তোমাকে এসে সব বলবেন। তোমার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

বিশ্বনাথবাবু সুকৌশলে আরও একটা জিনিস বার বার তুলে ধরলেন : আবার তুমি অতুল্য ঘোষ প্রফুল্ল সেনের খপ্পরে গিয়ে পড়ছ! ওরা আবার তোমাকে ডোবাবে!

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তখন পাল্টা দিকে পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ প্রস্তুত। সম্ভাব্য হামলার এলাকাগুলির কাছাকাছি সৈন্যবাহিনীও পেঁছে গিয়েছে। গ্রেফতারের লিস্টিও তৈরী। কংগ্রেসীদের সঙ্গেও প্রায় প্রতিঘণ্টায়ই যোগাযোগ রাখছেন।

পয়লা অক্টোবর তরুণবাবুর লোক এসে নিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির কপি। অজয়বাবু নিজের হাতেই বিবৃতিটা লিখেছিলেন। কেন তিনি পদত্যাগ

---

[১৯] বিশ্বনাথ মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০।

করছেন, সি. পি. এম কী কী করেছে, করছে ও করতে চায় এবং দেশের কত বড় সর্বনাশ হচ্ছে এই রাজত্বে—সবই লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে। বাংলায় লেখা। দীর্ঘ বক্তব্য।

সেইদিন দুপুরেই সেই বিবৃতির ইংরেজি অনুবাদ করতে বসলেন প্রতাপ চন্দ্র, অশোক সেন প্রভৃতিরা। বারাসতে শিশিরকুঞ্জে। প্রফুল্ল সেন, জগন্নাথ কোলে সবাই উপস্থিত সেখানে। বিবৃতি পড়ে সবাই খুশী। সকলের হয়ে টেলিফোনে অজয়বাবুকে ধন্যবাদ জানালেন তরুণকান্তি ঘোষ। বললেন : অজয়দা সি. পি. এমের ক্রিয়াকলাপ এত পরিষ্কারভাবে কেউ কোনও দিন তুলে ধরতে পারেনি। আপনি যা লিখেছেন তার তুলনা হয় না।[২০]

দিল্লিতেও টেলিফোন গেল তরুণকান্তির বাড়ি থেকেই : অসাধারণ বিবৃতি তৈরী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশোক সেন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।

সেইদিনই সাইক্লো হল সেই বিবৃতি। রাত দুটোয় অজয়বাবুর নির্দেশমত সেই ছাপা বিবৃতি সুশীলবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলেন তরুণকান্তির এক অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী। অজয়বাবু সুশীল ধাড়াকে আগেই বলে রেখেছিলেন এই বিবৃতির কথা। বলে রেখেছিলেন : রাতে তোমার কাছে দিয়ে যাবে বিবৃতি! তুমি কিছু কপি রাজভবনে নিয়ে যাবে। আর. জাহাঙ্গীর এবং চারুমিহিরকে বলবে যেন ওরাও রাত আটটার মধ্যে রাজভবনে উপস্থিত থাকে।

রাত আটটার সময়ই অজয়বাবুর পদত্যাগ করার কথা ছিল। আরও কথা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকার হবে। তাতে প্রথমে থাকবেন অজয়বাবু, সুশীল ধাড়া, জাহাঙ্গীর কবির, চারুমিহির সরকার, দেওপ্রকাশ রাই এবং ডঃ ঘোষ। এক সুশীল ধাড়া ছাড়া তখনও এরা আর কেউই কিন্তু কিছুই জানতেন না।

দলের দুজনকে সব বুঝিয়ে বলার এবং সময়মত হাজির করার দায়িত্ব পড়েছিল সুশীল ধাড়ার উপর। আর দেওপ্রকাশ রাইকে শুধু টেলিগ্রাম করে দারজিলিং-এ বলা হয়েছিল : তাড়াতাড়ি চলে আসুন, মুখ্যমন্ত্রী দোসরা সকালেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ডঃ ঘোষকে খবর দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং তরুণকান্তি। পয়লা সকালে তিনি ডঃ ঘোষকে টেলিফোন করে বলেন : অজয়দা নতুন মন্ত্রিসভা করছেন কাল। আপনাকে তাতে থাকতে হবে।

শুনে ডঃ ঘোষ তো খাপ্পা : ব্যাপারটা কি! অজয় মন্ত্রিসভা করবে, আর তুমি আমাকে বলবে আপনাকে তাতে থাকতে হবে! কই, অজয় নিজে তো আমাকে কিছু বলে নাই! আমি তোমাদের এসব ব্যাপারের মধ্যে নাই।

তরুণবাবু ভাবলেন আর একটু ওপর থেকে অনুরোধটা এলেই ডঃ ঘোষ রাজী হয়ে যাবেন। ফোন করলেন নন্দকে। নন্দ বিকালেই দিল্লি থেকে ডঃ ঘোষকে ট্রাঙ্ক কল করলেন : আপনাকে এ মন্ত্রিসভায় থাকতেই হবে।

ডঃ ঘোষ কিন্তু তাঁকেও একই জবাব দিলেন : জানি না শুনি না—এসব ব্যাপারের মধ্যে আমি নাই। নন্দ অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

---

[২০] প্রতাপ চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

বাংলার দ্বিধাগ্রস্ত হ্যামলেট!
যুক্তফ্রন্ট থাকবে
কি থাকবে না—
সেটাই প্রশ্ন।
অজয়

দোসরা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী।

সকালবেলা বসন্ত বোস রোডে বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসল। অজয়বাবু কিন্তু গেলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, কাজ আছে তাই যেতে পারবেন না।

সতীশবাবু এলেন। সতীশবাবু কলকাতা এলে অজয়বাবুর সঙ্গেই থাকেন। এবারও ছিলেন। বাংলা কংগ্রেস অফিসে পেঁছতেই সবাই সতীশবাবুকে ঘিরে ধরলেন : দাদা, কিছু হল?

সতীশবাবু সবাইকে হতাশ করলেন : না, কিছুতেই ফিরতে রাজী হচ্ছে না।

সবাই আবার ধরলেন সতীশবাবুকে : আপনাকে একটা কিছু করতেই হবে। না হলে সব সর্বনাশ হয়ে যাবে। বার বার এক কথাই বললেন সবাই। সুশীল ধাড়াও।

অবশেষে সতীশবাবু বললেন : দুপুরে খাওয়ার সময় আর একবার চেষ্টা করব। বিশ্বনাথও আসবে। দেখি কিছু হয় কিনা। সতীশবাবু আরও বললেন, কিছু করা গেলে আমি খবর দেব দুটো আড়াইটা নাগাদ। আপনারা আসবেন।

ওদিকে অজয়বাবু কিন্তু তখনও সংকল্পে অটল।

সকালে যথারীতি রাইটারস বিলডিংস-এ গেলেন। চিফ সেক্রেটারি এবং হোম সেক্রেটারির কাছে খবর নিলেন, সব ঠিক আছে কিনা। তাঁরা জানালেন, হ্যাঁ স্যার, সব ঠিক আছে, পুলিশ, সৈন্য সব প্রয়োজনমত রেডি। রাজভবনেও সব ব্যবস্থা ফাইনাল হয়ে আছে।

সেখান থেকে গেলেন পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে—গান্ধী মূর্তিতে মালা দিতে। মালা দিয়ে নেমে আসার সময় বিজয় নাহারের সঙ্গে দেখা। কানে কানে বললেন, আপনাদের সব ব্যবস্থা পাকা তো?

বিজয়বাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা।

দুপুরে বাড়িতে খেতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। সতীশবাবু এবং বিশ্বনাথ মুখার্জীও উপস্থিত। কথা হল তিনজনে। কিছুক্ষণ। কী কথা হল বাইরের কেউ অবশ্য তা এখনও জানে না।

দেড়টা নাগাদ ডি. আই. জি. আই. বি বিষ্ণু বাগচি হাজির হলেন। মুখ্যমন্ত্রীই তাঁকে আসতে বলেছিলেন। কথা ছিল, কাকে কাকে গ্রেফতার করা হবে সেই তালিকাটা সই করে দেবেন।

বিষ্ণুবাবু ফাইল খুলতে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, না, আজ থাক। পরে দেখা যাবে।

বাগচি চমকে উঠলেন। বললেন, কিন্তু স্যার, যারা বেশি হাঙ্গামা করতে পারে তাদের যে আজ রাত্রেই ধরা প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী আবার বললেন : না, আজ থাক।

বাগচি সাহেব বেরিয়ে এলেন এবং ঠিক তখনই হেমন্ত বসুর নেতৃত্বে এক দল-লোক ঢুকলেন বেলভেডিয়ারের ফ্লাটে। ততক্ষণে সুশীলবাবুকে খবর দিয়েছেন

সতীশবাবু এবং সুশীলবাবু সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পৌঁছে দিয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিসে। ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের বহু নেতা সমবেত।

সুশীলবাবু কিন্তু বাংলা কংগ্রেস অফিসেই বসেছিলেন। সতীশবাবুর টেলিফোনের প্রতীক্ষায়। সুশীলবাবু ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে জানালেন : এক্ষুণি সবাই চলে আসুন বেলভেডিয়ারে। আমিও যাচ্ছি। হেমন্তদাকে সঙ্গে আনবেনই।

যেতে যেতেই সবাই ঠিক করে নিলেন, আর কেউ কথা বলবেন না, যা বলার বলবেন শুধু হেমন্ত বসু।

হেমন্তবাবু ঘরে ঢুকেই মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন : সে কি অজয়, তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে কেন। আমি তোমার সব কথা শুনেছি। তুমি একা কেন পদত্যাগ করবে। করতে হলে আমরা সবাই একসঙ্গে করব। আমরা তো তোমার সঙ্গেই আছি। তোমার কোনও অসম্মান হলে আমরা তার প্রতিবিধান করবই।

অজয়বাবু চুপচাপ সব শুনলেন। তারপর বললেন : আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আজ কিছু করছি না। তবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এর একটা বিহিত করতে হবে।[২১]

বলেই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বারাকপুর গান্ধী ঘাটে যাবেন। সঙ্গে গেলেন সতীশ সামন্ত আর মুখ্যমন্ত্রীর বৌদি।

এদিকে তখন কংগ্রেস নেতারা ফাইনাল অ্যাকটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সব এম. এল. এ কংগ্রেস ভবনে হাজির হবেন। সেখানে মিটিং চলতে থাকবে। আটটার সময় রাজভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের খবর আসবে। সেই সঙ্গে এ প্রশ্নও আসবে যে অজয়বাবু আবার মন্ত্রিসভা গড়তে চান, কংগ্রেস কি তাঁকে সমর্থন করবেন? কংগ্রেস এম. এল. এ-রা প্রস্তাব নেবেন, হ্যাঁ, তাঁরা অজয়বাবুকে সমর্থন করবেন। সেই প্রস্তাব নিয়ে খগেনবাবু রাজভবনে ছুটবেন। রাজ্যপালকে প্রস্তাবটি দেবেন। রাজ্যপাল তারপরই অজয়বাবুকে নতুন মন্ত্রিসভা গড়তে আহবান জানাবেন। সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হবে। অজয়বাবু আবার নতুন মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নেবেন। তিনজন নতুন মন্ত্রীও সেই সঙ্গেই কার্যভার গ্রহণ করবেন।

সব ব্যবস্থা পাকা। সব কাজ ঘড়ি ধরে এগোতে লাগল। মাঝখানে একবার কে যেন প্রফুল্ল সেনকে খবর দিলেন, অজয়বাবু পিছিয়ে গিয়েছেন, রিপোর্টাররা তাই বলছে। প্রফুল্ল সেন বিশ্বাসই করলেন না সেকথা। সকাল এগারটা নাগাদও যে অজয়বাবু বিজয় নাহারকে বলেছেন সব ঠিক আছে!

রাজভবনেও প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। নতুন মন্ত্রিসভার শপথ নেওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত পাকা। থ্রোনরুমের সাজগোজ সম্পূর্ণ।

এদিকে অজয়বাবু যে পিছিয়ে গিয়েছেন রাজ্যপাল ধর্মবীর সন্ধ্যায়ও তা জানেন না। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ টেলিফোন পেলেন দিল্লি থেকে : কি ব্যাপার,

---

[২১] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

অজয়বাবু পিছিয়ে যাচ্ছেন কেন?

ধর্মবীর আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, সে কি!

দিল্লিকে খবরটা জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর। বিকেল চারটে নাগাদ সোজা খবর গিয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে : অজয়বাবু পিছিয়ে যাচ্ছেন। দিল্লিতেও কেউই চট করে পুরো বিশ্বাস করতে পারেননি খবরটা। তাই ধর্মবীরকে ফোন করা হল।

ঘণ্টা দুয়েক পরেই অজয়বাবুর রাজভবনে আসার কথা। এলেনও। আমরা একদল রিপোর্টার রাজভবনের উত্তর গেটে দাঁড়িয়ে। আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে অজয়বাবুর গাড়ি ঢুকল। পাশে তখনও সতীশবাবু এবং বৌদি।

ধর্মবীরের সঙ্গে কথা বলতে কিন্তু একা অজয়বাবুই গেলেন। বললেন সব রাজ্যপালকে। কী কী ঘটেছে গোটাদিনে। তারপর বললেন, আমি আজই কিছু করছি না। আরও দিন পাঁচেক সময় চাই।

ধর্মবীর বললেন : এসব জিনিস কি আর পরে হয়!

মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন : তা হতে পারবে না কেন?

ধর্মবীর বললেন : অজয়বাবু, আপনিও শিশু নন, আমিও শিশু নই।

এদিকে তখন কংগ্রেস ভবনেও হইচই। নিচে হলঘরে বসে বসে কংগ্রেস এম. এল. এরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—কই, কিছুই তো হচ্ছে না। ব্যাপার কি?

অবশেষে প্রতাপবাবু মিটিং থেকে উঠে ওপরে গেলেন। সেখানে 'কনট্রোল রুমে' প্রফুল্ল সেন এবং তরুণকান্তি বসে। তাঁরাও তখন বিভিন্ন সূত্র থেকে নানা খবর পেয়েছেন।

প্রতাপবাবু বললেন, এম. এল. এরা যে চটে আগুন, আর কতকাল এভাবে বসে থাকতে হবে। অগত্যা তরুণবাবু টেলিফোন করলেন রাজভবনে। টেলিফোনেই হাতে পায়ে ধরলেন অজয়বাবুর। নানাভাবে বোঝালেন। আবেদন নিবেদনের চূড়ান্ত করলেন।

কিন্তু না, অজয়বাবু কিছুতেই রাজী নন। একই কথা বললেন : আরও কয়েকদিন সময় চাই।

তরুণবাবু হতাশ হয়ে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

রাজ্যপাল শেষবারের মত চেষ্টা করলেন : অজয়বাবু ইতনা অ্যারেনজমেণ্ট হুয়া।

মুখ্যমন্ত্রী বললে : আবার হতে পারবে।

তারপর নেমে গেলেন লিফট দিয়ে। আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি বেরিয়ে গেল দক্ষিণ গেট দিয়ে। সোজা বেলভেডিয়ারে।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE.
CALCUTTA-27

টাস্ক ইজ ওভার

হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে অজয়বাবুর বেশ কিছুদিন যাবতই বনিবনাও হচ্ছিল না।

কবির সাহেব মনে করতেন, তিনিই যুক্তফ্রণ্ট গড়েছেন এবং তাঁর চেষ্টায়ই অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি তাই আশা করেছিলেন, ফ্রণ্টের নেতারা এবং বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী কাজেকর্মে সেই কৃতজ্ঞতাটা প্রকাশও করবেন। কবির সাহেব প্রথম ছজন মন্ত্রীর নাম ঠিক হওয়া পর্যন্ত কলকাতা ছিলেন। তারপরই ইউরোপ চলে গেলেন।

ইউরোপ থেকে ফিরেই কবির সাহেব বুঝতে পারলেন যুক্তফ্রণ্ট সাবালক হয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। কেউই আর কবির সাহেবকে তেমন গুরুত্ব দিতে রাজী নন। এমন কি তাঁর নিজের দলের অজয়বাবুও না। পরিস্থিতি দেখে শুনে কবির সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন।

বাংলা কংগ্রেসে বরাবরই দুটো গ্রুপ ছিল। অজয়বাবুর গ্রুপ এবং কবির সাহেবের গ্রুপ। নির্বাচন পর্যন্ত তেমন কোনও বিরোধ হয়নি। কিন্তু নির্বাচনের পরেই বিরোধ সুরু হল মন্ত্রিত্ব নিয়ে। সুশীল ধাড়া মন্ত্রী হওয়ায় কবির গ্রুপের লোকরা ক্ষেপলেন।

সরকার হয়ে যাওয়ার পর বিরোধটা আরও দানা বাঁধল। অজয়বাবুর সমর্থকরা বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক দফতর দখল করে বসলেন। সেখানে কবিরপন্থীদের ঢুকতেই দিলেন না। তাঁদের দুটো বড় সুবিধা ছিল। প্রথম সুবিধা, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের লোক। দ্বিতীয়, স্বয়ং সুশীল ধাড়া মন্ত্রী। তিনি দলের সাধারণ সম্পাদকও।

কবিরপন্থীরা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে নিজেদের ঘাঁটি গাড়লেন। তারপর বাংলা কংগ্রেসের চব্বিশ পরগণা কমিটি গড়তে চাইলেন। সুশীল ধাড়ারা তাতে বাধা দিলেন। তাঁরা কবিরপন্থীদের হাতে চব্বিশ পরগণা কমিটি কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না।

এর পরে এল ক্রান্তি দলের বিরোধ। কবির সাহেব চাইলেন, বাংলা কংগ্রেস পুরোপুরি ক্রান্তি দলে মিশে যাক। অজয়বাবুর সমর্থকরা তাতে বাধা দিলেন। সে বাধা অমান্য করেই কবিরপন্থীরা বাংলা দেশে ক্রান্তি দলের শাখা খুললেন। অজয়বাবু প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করলেন।

কবির-মুখার্জী বিরোধ চরমে উঠল।

সেপ্টেম্বরে অবশ্য দুপক্ষের দিল্লিতে একটা মিটমাটের চেষ্টা হল। কিছুটা কাজও এগোলো। কবির-মুখার্জী আলোচনাও হল। অজয়বাবুর সঙ্গে কবির সাহেবের ব্যক্তিগত তিক্ততাও কিছুটা কমলো। ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দিল্লিতে দুজনে একসঙ্গে খেলেনও। আটাশে অজয়বাবু কলকাতা ফিরলেন। ওইদিনই কবিরও

কলকাতা আসছিলেন। অজয়বাবু পালাম বিমান বন্দরে আসার পথে নিজে গিয়ে কবির সাহেবকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এলেন। দমদমে নেমেও দুজনে একই গাড়িতে চাপলেন। অজয়বাবু সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হস্টেলে কবিরকে নামিয়ে দিয়ে তারপর বাড়ি গেলেন।

কবির সাহেব মহা খুশী।

কিন্তু তৃতীয় দিনই তিনি বেজায় খাপ্পা। ততক্ষণে জেনে গিয়েছেন অজয়বাবু কী করতে চলেছেন, কেন দিল্লি গিয়েছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুনে তিনি একবার অজয়বাবুর বাড়িতেও গেলেন। কিন্তু অজয়বাবু তখনও সবটাই এড়িয়ে গেলেন।

কবির সাহেব রাগে গজ গজ করতে করতে হস্টেলে ফিরে এলেন। তাঁর রাগ এইজন্য নয় যে, অজয়বাবু যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটাতে চলেছেন। তিনি নিজেও তখন ফ্রণ্ট সরকারের উপর ভীষণ চটা। তাঁর রাগের প্রধান কারণ, অজয়বাবু তাঁকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছেন, অবিশ্বাস করেছেন। কবির হস্টেলে ফিরেই সমর্থকদের বললেন : অদ্ভুত লোক, আমি দলের সহ-সভাপতি, উনি সভাপতি; এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন, এতবার আমার সঙ্গে দেখা হল, অথচ একটা কথাও বললেন না!

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, এই লোকের সঙ্গে আর নয়। সংকল্প করলেন, সুযোগ পেলেই এই অকৃতজ্ঞতার শিক্ষা দিতে হবে।[১]

আশ্চর্যজনকভাবে তেসরা অক্টোবরই সে সুযোগ তাঁর হাতের কাছে এসে গেল। সাত সকালেই সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হস্টেলে এসে হাজির হলেন প্রফুল্ল সেন আর তরুণকান্তি। একেবারে প্রায় আছড়ে পড়লেন দুই নেতা। বললেন : অজয় মুখার্জী আমাদের ডুবিয়েছে। এবার আপনি বাঁচান। ডঃ ঘোষের সাহায্য নিয়ে একটা কিছু করুন।

কবির সাহেবের পাশের ঘরেই ছিলেন ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব! তাঁকেও ডেকে আনা হল। চারজনে মিলে অজয়বাবুর আদ্যশ্রাদ্ধ করলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর কবির সাহেব কথা দিলেন : আপনারা ভাববেন না, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সেদিন সন্ধ্যায়ই কবির সাহেব এবং ডঃ মহতাব প্রথমে গেলেন ধর্মবীরের কাছে। কথা হল। মোটামুটি একটা পরিকল্পনাও হল। তারপর সেখান থেকে দুজনেই গেলেন ডঃ ঘোষের ফ্লাটে। গিয়ে বললেন : সব ঠিক আছে, আপনিই এবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। অজয়বাবুকে সরাবোই।

ডঃ ঘোষ বললেন : এ মন্ত্রিসভা চলতে পারে না। যা করার এক মাসের মধ্যেই করতে হবে।

কবির সাহেব বললেন : তাড়াহুড়া করবেন না। আমি একমাসের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত করে ফেলছি।[২]

---

১ গঙ্গাধর প্রামাণিক। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০।

২ ডঃ ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৯-৬-৭০।

আবার নতুন পরিকল্পনা হল : একমাসের মধ্যে যুক্তফ্রণ্টের পতন ঘটানো হবে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার হবে।

এদিকে তখন ভাঙগা যুক্তফ্রণ্ট জোড়া লাগাবার পালা পুরোদমে সুরু হয়ে গিয়েছে।

অজয়বাবু দোসরা দুপুরেই সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বাংলা কংগ্রেস নেতাদের বলেছিলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা বিহিত করতে হবে। ওইদিন রাত্রে তিনি রাজ্যপালকেও বলেছিলেন, কয়েকদিন সময় চাই। পরদিন নন্দ দিল্লি থেকে টেলিফোন করলেন। তাঁকেও বললেন : দুএকদিন সময় চাই।

এসব খবর তখন সবাই জানতেন। যুক্তফ্রণ্টের নেতারা তাই যথাশীঘ্র সম্ভব অজয়বাবুকে আশ্বস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তেসরা দুপুরেই বিশ্বনাথ মুখার্জী জ্যোতিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গেলেন। রাইটার্স বিলডিংস-এই। মুখ্যমন্ত্রী একা বসে ছিলেন। ঢুকেই বিশ্বনাথবাবু বললেন, ছোড়দা, জ্যোতিবাবু তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।

তিনজনে কী কথা হয়েছিল তা নিয়ে তিনরকম বিবরণ শোনা যায়। একটা অজয়বাবুর বক্তব্য, আর একটা জ্যোতিবাবুর ভারসান এবং তৃতীয়টা বিশ্বনাথ মুখার্জীর বিবরণ।

অজয়বাবু বললেন : জ্যোতিবাবু এলেন। আমি তাঁকে সব বললাম। কিছু গোপন করিনি। ওদের ক্রিয়াকলাপ যে অসহ্য হয়ে উঠেছে তাও বললাম। একথাও বললাম যে, শত আলাপ আলোচনায়ও যখন ফল পাওয়া গেল না তখনই আমি এই পথে এগিয়েছি। এও জানালাম যে, ওদের পার্টির হাঙ্গামার আশঙ্কায় আমি মিলিটারি এবং সি. আর. পি-কেও সতর্ক করে রেখেছিলাম।...অবশেষে বললাম, গতকাল পদত্যাগ করিনি, কিন্তু আগামীকাল করব। আমি আর এ পারছি না। উনি সব শুনলেন। আমাকে কোনও আক্রমণ করলেন না—এখন যেমন করছেন, এখন যেমন বিশ্বাসঘাতক, ইত্যাদি বলছেন। তারপর বললেন, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। তবে ধরে নেবেন না যে, এসব জিনিস আমাদের পার্টির পলিসি অনুসারে হয়েছে বা হচ্ছে। র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইল করছে। আমরা দেখছি। এসব বন্ধ করবই। আমি বললাম, দ্যাট ম্যাটারস লিটল্‌। আপনাদের সেমি মিলিট্যাণ্ট পার্টি। আপনারা চাইছেন না, আর ওয়ার্কাররা সব করে চলেছে এটা কে বিশ্বাস করবে। টপ লিডাররা কিছু করতে পারছেন না এটা আমি বিশ্বাস করি কি করে?...জ্যোতিবাবু বললেন, আপনি মনে করবেন না যে, আমরা এইভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরী হচ্ছি। আমি চল্লিশ বছর ধরে কমিউনিস্ট আছি। ভারতের এবং বাঙগলার সয়েলের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ। এখানে কোনও দিন সশস্ত্র বিপ্লব হবে বলে বিশ্বাসই হয় না। আমার নাতির আমলেও যদি তা হয় তাহলে আই স্যাল বি গ্ল্যাড। তবে এরা গণ্ডগোল করছে ঠিক। আপনি আমাকে তিন মাস সময় দিন। আমি যদি এই সময়ের মধ্যে কিছু না করতে পারি তাহলে রিজাইন করবেন।[৩]

---

[৩] অজয় মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ৭-৬-৭০।

জ্যোতিবাবুর ভারসান: দোসরার পর বিশ্বনাথবাবু আমাকে বললেন, আপনি একবার ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। আমি কথা বলতে গেলাম। ওঁকে বললাম, আপনি এটা কেন করলেন? এটা ভয়ঙ্কর কথা! আপনি আমাদের সঙ্গে কেন কথা বললেন না? আপনি যদি একবার আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন তাহলেই মিটে যেত। ...শুনেছি, আপনি আমাদেরও গ্রেফতার করবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন।...উনি হেসে বললেন, না, আপনি হতেন না।...উনি তখন গণকমিটি, মানুষের হাতে ক্ষমতা নেওয়া, ইত্যাদি নিয়ে ভীত ছিলেন। আমি বলি, ভুলবোঝাবুঝি থাকলে পরস্পর কথা বললেই তা দূর হতে পারে। জনগণকে বলতে পারি।[৪]

বিশ্বনাথ মুখার্জীর বিবরণ: ক্যাবিনেট বসার আগে আমি, ছোড়দা, সুশীলদা, জ্যোতিবাবু ছোড়দার ঘরে বসি। জ্যোতিবাবু বললেন, কী ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে বলুন। আমরা আপনার নেতৃত্বে আস্থাবান। আপনার কী কী অসুবিধা বলুন। ছোড়দা বললেন, আমি এই এই কারণে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলাম। তবে এখন তা করছি না। আপনাদের বাদ দিয়ে সরকার করব না। তবে, এতদূর যখন এগিয়েছি তখন আমি আর সি এম থাকতে চাই না। আপনারা অন্য কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করুন। জ্যোতিবাবু বললেন. তা কিছুতেই হয় না, আপনিই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। আপনি ছাড়া যুক্তফ্রণ্ট সরকার চলে না। চলতে পারে না। ...জ্যোতিবাবু সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন। ছোড়দাকে ঠাণ্ডা করার জন্য যা যা বলা দরকার সব বলেছিলেন।[৫]

এর কোন্ ভারসান সত্য আমি সে বিতর্কে যেতে চাই না। তবে, এই সময় সি. পি. এম যে অজয়বাবুকে 'আর না চটাবার' পলিসি নিয়েছিলেন সেটা তাঁদের সান্ধ্য দৈনিক গণশক্তির একটা খবর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। চৌঠা অক্টোবর গণশক্তি লিখলেন, "বিশ্বাসঘাতী চক্রান্তের যাঁরা হোতা তাঁদের সাহস নেই জনগণের সামনে স্পষ্ট কথায় বক্তব্য উপস্থিত করার।...শত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেও জনগণ যুক্তফ্রণ্টের ত্রুটিবিচ্যুতি দুর্বলতা সত্ত্বেও যে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে প্রাণ খুলে সমর্থন জানিয়েছেন তাকে ভেঙে দেবার চক্রান্তে যাঁরা লিপ্ত হয়েছেন তাঁদের ক্ষমা নেই। জনগণের দরবারে তাঁদের বিচার অবধারিত।...ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, হুমায়ুন কবির প্রমুখ ব্যক্তিই এই ধরনের চক্রান্তের উদ্যোক্তা।"

কাণ্ডটা করলেন অজয় মুখার্জী, আর গণশক্তি গালিগালাজ দিলেন ডঃ ঘোষ এবং হুমায়ুন কবিরকে! অজয় মুখার্জীর নামও উল্লেখ করা হল না!

এই সময় সি পি এমের নেতারা বসেই স্থির করেছিলেন: (ক) যে অজয়বাবু এই কাজ করতে গিয়েছিলেন তার কাছে সি পি এম নেতারা ব্যক্তিগত অনুরোধ-উপরোধ করতে যাবেন না। (খ) পাবলিক প্রেসার ক্রিয়েট করতে হবে। এবং (গ) অজয়বাবুকে রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন যুক্তফ্রণ্ট সরকার না ভাঙে। যাতে অহেতুক ভুলবোঝাবুঝিগুলি দূর করা যায়।[৬]

---

[৪] জ্যোতি বাসু সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০।

[৫] বিশ্বনাথ মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ২৮-৫-৭০।

[৬] হরেকৃষ্ণ কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৬-৭০।

তেসরা রাত্রেই চেতলায় কানাই ভট্টাচার্যের বাড়িতে সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, পি এস পি, এস এস পি, গোর্খা লীগ, লোকসেবক সংঘ ইত্যাদি দলের নেতারা সমবেত হলেন। অজয়বাবুও সেখানে উপস্থিত।

সেই বৈঠকে অজয়বাবু আবার বললেন: আমি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে চাই। আপনারা আর কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করুন। সবাই তাতে ভীষণ আপত্তি জানালেন। বললেন, না, আপনাকে থাকতেই হবে।[৭]

অজয়বাবু তবু বললেন: না আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। আমি ইন্দিরার কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

ওঁরাও ছাড়বেন না। সবাই চেপে ধরলেন, না, আপনাকে থাকতেই হবে।

পরদিন আবার ফ্রন্টের প্রায় সবাই গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে। প্রায় সব মন্ত্রী এবং অধিকাংশ নেতা। রাইটার্স বিলডিংস-এই। মুখ্যমন্ত্রীর কামরায়। অজয়বাবু তাঁদের কাছেও সব বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন: আমি গতকাল অনেকের সঙ্গেই আলোচনা করেছি। তাঁরা আমাকে পূর্ণ সহ-যোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আমি তাই এখন আর পদত্যাগ করছি না। মন্ত্রীরা সবাই তাঁর কথা শুনলেন। কেউ বিরুদ্ধে একটা কথাও বললেন না। কারু কণ্ঠে এতটুকু সমালোচনা শোনা গেল না। সেই বৈঠকে জ্যোতিবাবু এবং হরেকৃষ্ণ কোঙারও উপস্থিত ছিলেন।

ডঃ ঘোষ কিন্তু এই বৈঠকে হাজির ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ডঃ ঘোষের বাড়ি গেলেন। গিয়ে তাঁকেও সব বললেন। ডঃ ঘোষ কিন্তু তাঁকে বুঝতেও দিলেন না যে, তিনি ইতিমধ্যেই কংগ্রেস এবং হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে একটা বিকল্প ব্যবস্থা পাকা করে ফেলছেন।

পাঁচ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী একটা ছোট্ট বিবৃতি দিলেন। সেই বিবৃতির শেষাংশে বললেন, "আমি একথা ঘোষণা করতে আনন্দবোধ করছি যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকবে এবং জনগণকে সেবা করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে যাবে।"

সেইদিন রাত্রেই অজয়বাবু রাজ্যপালকেও জানিয়ে দিয়ে এলেন: আমি আর পদত্যাগ করছি না। সাতই যুক্তফ্রন্টের নামে মনুমেন্টের নীচে জনসভা ডাকা হল। সে মিটিং-এও মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন: যা ছিলাম, আমরা তাই আছি।

শুধু কথায় নয়, ইতিমধ্যে ফ্রন্টের নেতারা কাজেও অজয়বাবুকে অনেকটা খুশী করেছেন। পাঁচ তারিখেই ক্যাবিনেট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে: শ্রমিক-মালিক বিরোধে পুলিসকে আইনমাফিক কাজ করতে বলা হবে। পরদিন আরও এক ধাপ অগ্রগতি। শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য বড় কর্তারা সবাই মিলে ক্যাবিনেট সাব কমিটি গঠন করলেন। সে কমিটিতে থাকলেন অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু, সোমনাথবাবু এবং সুশীল ধাড়া। বাদ গেলেন স্বয়ং শ্রমমন্ত্রী। তখন শ্রমমন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জীর উপর অজয়বাবু বেজায় খাপ্পা।

এদিকে কংগ্রেস রাজনীতির জলও ততদিনে অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে।

---

৭ সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ২৩-৫-৭০।

পূজার উপহার
অ্যাড হক কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটিকে অ্যাড হক কমিটি করার বিষয়টা কামরাজ ওয়ার্কিং কমিটিতে নিয়ে এলেন। সাতই অক্টোবর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। কমিটিতে নন্দর রিপোর্ট বিলি করা হল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা ফেরৎ নিয়ে নেওয়া হল সকল সদস্যের কাছ থেকে। সে রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী এবং আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাকে নন্দ বড় বেশি জড়িয়ে ফেলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী একটা অকংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটাবার ষড়যন্ত্র করেছেন—ছাপার অক্ষরে এমন নজির রাখাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সবাই স্বীকার করলেন। তাই রিপোর্টটা তুলে নেওয়া হল।

শুধু যে রিপোর্টটা তুলে নেওয়া হল তাই নয়। বিভিন্ন নেতার কাছে নন্দ প্রচুর গালিগালাজও খেলেন। অনেকেই প্রশ্ন তুললেন, আপনি কোন্ অধিকারে অ্যাড হক ঘোষণা করেছিলেন? প্রধানমন্ত্রীও সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি একবারও বললেন না, 'আমি নন্দজীকে অ্যাড হক করতে বলেছিলাম!'

ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু অ্যাড হক নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তই নিলেন না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করলেন কামরাজকে। পাঁচদিন পরে কামরাজ রায় দিলেন: পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যেমন আছে তেমনি থাকবে। শুধু ছয়জনকে নিয়ে অ্যাড হক কর্মসমিতি হবে। সেই কমিটির আহ্বায়ক করলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে।

নদীর একূল যখন গড়ছে ওকূল তখন ভাঙছে। যখন যুক্তফ্রন্ট জোড়া লাগবার চেষ্টা চলছে, তখন বাংলা কংগ্রেস ভাঙছে।

বাংলা কংগ্রেসের কবির গোষ্ঠীর নেতারা আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে চটে ছিলেন। কিন্তু তার উপর তাঁরা যখন দেখলেন যে, সি পি এম, সি পি আইর নেতারা একদিকে অজয়বাবুকে তোসামোদ করে অন্যদিকে হুমায়ুন কবিরকে গালি-গালাজ করছেন তখন আর থাকতে পারলেন না। একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরাও প্রকাশ্যে অজয়বাবু এবং ফ্রণ্টের অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে বলা সুরু করলেন।

বাংলা কংগ্রেসে অজয় মুখার্জীর সমর্থকরা আবার এতে চটে উঠলেন। তাঁরা বললেন: ওদের এত সাহস যে দলের নেতার বিরুদ্ধে কথা বলে! ১২ই বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর নামে এক কড়া চিঠি গেল কবির ভ্রাতৃদ্বয়, হরেন মজুমদার, গঙ্গা প্রামাণিক ইত্যাদির কাছে: তোমাদের আপত্তিজনক বিবৃতিগুলির পূর্ণ বিবরণ দাও। দলে আলোচনা হবে।

পাল্টাপক্ষও তখন ক্ষিপ্ত। চিঠি পেয়েই গঙ্গা প্রামাণিক, হরেন মজুমদার এবং নলিনাক্ষ সান্যাল প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন: বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী অজয় মুখার্জীর জঘন্য ক্রিয়াকলাপ চাপা দেওয়ার জন্য এখন বলির পাঁঠা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

বিবৃতির ভাষা থেকেই বোঝা যায় তখন দু পক্ষে সম্পর্কটা কত মধুর।

চারদিন পরেই জাহাঙ্গীর কবির সহ নয়জন কবিরপন্থী এম এল এ বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে এক বিবৃতি দিলেন। কিন্তু এই

বিবৃতিতেই বললেন যে, তাঁরা ফ্রণ্টের মধ্যেই থাকছেন। জাহাঙ্গীর কবিরও মন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন না।

তারও নয়দিন পরে এই নয়জন এম এল এ-ই ঘোষণা করলেন যে তাঁরা ভারতীয় ক্রান্তি দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখা গঠন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চিঠি লিখলেন যুক্তফ্রণ্টের কাছে: পঞ্চদশ সদস্যরূপে স্বীকৃতি চাই। তার আগের দিনই তাঁরা প্রগতিশীল নির্দল ব্লকের এম এল এদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। জাহাঙ্গীর কবির রিপোর্টারদের জানালেন, নির্দল ব্লকের ছয়জন এম এল এও ক্রান্তি দলে যোগ দিতে রাজী।

যুক্তফ্রণ্টের নেতারা বুঝলেন অবস্থা খারাপ। এদের ফ্রণ্টে রাখলে অজয় মুখার্জী চটবেন, আবার এদের ফ্রণ্ট থেকে বের করে দিলেই মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে। তাঁরা তখন বিশ্বনাথ মুখার্জীকে দিয়ে অনুরোধ জানালেন অজয়বাবুকে: ওদের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলুন।

পঁচিশে অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী ওদের চার প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায়ও বসলেন। কিন্তু তখন সম্পর্ক এত খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, কিছুতেই আর কিছু হল না।

তিরিশে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ক্রান্তি দলের বৈঠক হল। তখন স্বয়ং কবির সাহেবও কলকাতায়। ডঃ ঘোষও সেই বৈঠকে যোগ দিলেন। দুজনেই কড়া কড়া ভাষায় ফ্রণ্ট শাসনের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করলেন।

পরদিন রাত্রেই কবির সাহেব তাঁর সমর্থক এম এল এদের ডেকে পাঠালেন সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হস্টেলে। সবাইকে বললেন, যুক্তফ্রণ্ট থেকে পদত্যাগপত্র সই করুন। গঙ্গা প্রামাণিক কবির সাহেবকে বললেন, এত তাড়াতাড়ি বোধহয় ফ্রণ্ট ত্যাগ করা উচিত নয়। আই এন টি ইউ সির কালি মুখার্জীও হাজির ছিলেন সেখানে। তিনিও আপত্তি করলেন। কবির সাহেব বললেন, না, সই করা থাক।

সই হল। সই করার পর গঙ্গাবাবু আবার সেই কাগজগুলি চাইলেন। বললেন, জাহাঙ্গীর নেই, সে আসুক। জাহাঙ্গীর কবির তখন কলকাতার বাইরে। কবির সাহেব কিন্তু তা দিলেন না। তাড়াতাড়ি নিয়ে নিজের বাক্সে রেখে দিলেন।[৮] পরদিনই সব কাগজ আশু ঘোষের কাছে পেঁাছে গেল।

পয়লা নভেম্বর ভোরবেলা ফোন পেলাম যতীন চক্রবর্তীর। যতীনবাবু চিরকালই সাতঘাটের খবর রাখেন। বললেন: আজ বেলা তিনটায় বিজয় নাহারের কোনও লোক যাবে ডঃ ঘোষের বাড়ি। খুব জরুরী কাজ। খবর নাও তো ব্যাপারটা কি।

অনেককে ধরলাম। কেউ কিছুই বলতে পারলেন না। তারপর তিনটার সময় ডঃ ঘোষের রাজভবনের ফ্ল্যাটে গিয়েই হাজির হলাম। যেতেই নীচের গেটে সিকিউরিটি গার্ড খবর দিলেন, শ্যামবাজারের রবিবাবু এসেছেন। তিনি নামার

---

৮ গঙ্গাধর প্রামাণিক। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০।

আগে মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হবে না। আমি গিয়েছিলাম, আর গিয়েছিলেন হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডের সোমেন মুখার্জী। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম, তাহলে বিজয় নাহারের লোক ঠিকই এসেছেন।

কয়েক মিনিট পরেই দেখি রবি চৌধুরী এবং রণধীর বর্মণ নামছেন। আশু ঘোষের দুই বিশ্বস্ত সহচর। রবি চৌধুরী নামতে নামতেই একখানি চিঠি পুরছিলেন পকেটে।

পরে জেনেছি, সেইখানাই ছিল ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র। সিলকরা। রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে লেখা।

, তেসরা তাড়াতাড়ি কপি লিখে ফেললাম। বিষয়বস্তু ছিল: ডঃ ঘোষ এখন যে কোনও দিন পদত্যাগ করতে পারেন। তারপর আরও কিছু এম এল এ ফ্রন্ট ত্যাগ করবেন এবং মন্ত্রিসভার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠবে। কপি জমা দিয়ে বাড়ি যাব বলে উঠছি এই সময় টেলিফোন এল কালান্তরের চিত্তপ্রিয় রায়ের কাছ থেকে: শুনেছেন, ডঃ ঘোষ রিজাইন করেছেন? আরও কিছু এম এল এও সেই সঙ্গে ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন? ধর্মবীর দার্জিলিং থেকে অজয়বাবুকে টেলিফোন করে খবর দিয়েছেন।

আমি বললাম: পজিটিভ কিছু শুনিনি, দেখি সি এমকে ফোন করে।

অজয়বাবুকে ফোন করতে যাচ্ছি, এমন সময় আবার টেলিফোন। বিশ্বনাথ মুখার্জী ফোন করলেন: ডঃ ঘোষের সঙ্গে যে আঠারজন এম. এল. এ দলত্যাগ করেছে তাঁদের নামটা বল দিকি।

আমি জবাব দিলাম: ঠিক জানি না, আপনি ছোড়দাকে জিজ্ঞেস করুন না।

বিশ্বনাথবাবু বললেন: ছোড়দাও জানেন না। ধর্মবীর তাঁকে তা বলেনি। শুধু বলেছে ডঃ ঘোষ ছাড়া আরও আঠারজন ফ্রন্ট ত্যাগ করেছে। তুমি জান নিশ্চয়ই নামগুলি। বল না।

আবার জবাব দিলাম: সত্যি জানি না। জানলেও আপনাকে বলতাম, জানি কিন্তু বলব না।

একটু পরেই সোমনাথবাবুর টেলিফোন: সেই আঠারজন কে কে?

বললাম: জানি না। শুধু অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলা বা লেখা উচিত নয়।

খবরটা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল বামপন্থী মহলে। সবাই বুঝলেন, এবার অবস্থা কাহিল। টেলিফোনে টেলিফোনে আলোচনা হল। পদত্যাগী এম. এল. এদের কিছু কিছু নাম অনুমান করতে পারলেন কেউ কেউ। কিন্তু পূর্ণ তালিকা কিছুতেই সংগ্রহ করা গেল না। অগত্যা তাঁরা স্থির করলেন, একটা দিক তো আগাম সামলে রাখা যাক, অন্যান্য ব্যবস্থা পরে ভাবা যাবে।

সেই সিদ্ধান্তমত গভীর রাত্রে বিশ্বনাথ মুখার্জী ছুটলেন বেলভেডিয়ারে। আবার ধরতে হল সেই অজয় মুখার্জীকেই: ছোড়দা. ওদের লিস্টি দেখেই পদত্যাগ কোরো না। বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা দাবি করবেই। বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা ছাড়া কিছুতেই পদত্যাগ করা চলবে না।

মূল পরামর্শটা সোমনাথ লাহিড়ির। সোমনাথবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি

খবরটা পেয়েই বুঝে গেলেন, ফ্রন্ট মাইনরিটি, এখন সরকারের পতন আটকাবার একমাত্র পথ বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা দাবি করা। বিধানসভাও চট করে ডাকা হবে না। সময় নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে পদত্যাগকারীদের উপর নানারকমের চাপ সৃষ্টি করা যাবে।

মনোনীত চারজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নিয়ে বিধানসভায় তখন মোট সদস্য সংখ্যা ২৮২। একজনের নির্বাচন বাতিল হওয়ায় এবং আর একজন কংগ্রেস সদস্য মারা যাওয়ায় দুটো আসন শূন্য।

পরদিনই রাজ্যপাল দার্জিলিং থেকে কলকাতা নেমে এলেন। তিনি প্রথমেই ডঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর আশু ঘোষ কয়েকজন দলত্যাগী এম. এল. এ-কে নিয়ে রাজ্যপালের কাছে গেলেন। রাজ্যপাল তাঁদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত-ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি স্বেচ্ছায় ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন কিনা? ফ্রন্টত্যাগ করে তাঁরা যে চিঠি দিয়েছিলেন তাও যাচাই করে নিলেন প্রত্যেক এম. এল. এ-র কাছ থেকে—ইয়ে দস্তখত্ আপকা? প্রত্যেককে দিয়ে আবার সই করালেন।

তারপর কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। জানালেন ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করেছেন। সঙ্গে আরও আঠারজন এম. এল. এ আছেন। তাঁরাও ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন। তাঁরা সবাই চিঠি দিয়েছেন, "আমরা এ সরকারকে সমর্থন করি না। নতুন কোয়ালিশন সরকার গড়তে চাই—যাতে শুধু গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সদস্যরাই থাকবেন। অবিলম্বে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের সরকার গড়তে দিন।"

ধর্মবীর ডঃ ঘোষের কথা বললেন, চিঠির কথা বললেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে কিছুতেই আঠারজন দলত্যাগী এম. এল. এ-র নাম জানালেন না। তারপর বললেন, আপনারা তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন, এখন কি করা?

মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন, আমাকে একটু ভাবতে দিন। আমি মন্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলি, তারপর আপনাকে জানাব।

কী করা উচিত, মুখ্যমন্ত্রী তখনও সে সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেননি। তবে তাঁর মোদ্দা বক্তব্য, সংখ্যালঘু হয়ে গেলে পদত্যাগই করা উচিত।

রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলে এসে মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্টারদের বললেন: যদি বুঝি ফ্রন্ট সংখ্যালঘু তাহলে নিজেই পদত্যাগ করব।...দুভাবে গরিষ্ঠতা বা লঘিষ্ঠতা যাচাই হতে পারে। (এক) বিধানসভা ডেকে দলের শক্তি হাতেনাতে যাচাই করে নেওয়া। এবং (দুই) যাঁরা দলত্যাগ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে তাঁরা লিখিতভাবে বিবৃতি দিয়ে দেখাতে পারেন যে, তাঁরা দল ভেঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। অথবা বিরোধী কংগ্রেস পক্ষও নাম ধাম দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে, তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। তখন আমি পদত্যাগ করতে পারি।[১]

তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের আরও জানালেন, রাজ্যপাল ডঃ ঘোষ ছাড়া আর কোনও ফ্রন্টত্যাগী এম. এল. এ-র নাম তাঁকে জানাননি।

---

১ আনন্দবাজার পত্রিকা। ৫-১১-৬৭।

ফ্রন্ট নেতারা দেখলেন বিপদ। মুখ্যমন্ত্রী এখনও নরম। তখনই ফ্রন্টের বৈঠক ডাকা হল। সেখানে একটা প্রস্তাব নিয়ে অজয়বাবুকে শক্ত বাঁধুনীতে আটকে ফেলার চেষ্টা হল। সেই প্রস্তাবে যুক্তফ্রন্ট ঘোষণা করলেন: আমরাই গরিষ্ঠ। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রশ্ন নেই। ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হোক।

গভীর রাত্রে মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্টারদের বললেন: বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার আগে পদত্যাগ করব না।

ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদেরও এইদিন যথাসম্ভব আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন নেতারা। রাইটার্সের রোটান্ডায় সেইদিনই সবগুলি চেম্বারের প্রতিনিধির সঙ্গে মন্ত্রিদের বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে সোমনাথবাবু এবং জ্যোতিবাবু বললেন: শ্রমিকরা নিজেরাই এখন ঘেরাওয়ের অসারতা বুঝতে পেরেছেন। জ্যোতিবাবু বাড়তি আরও একটা কথা বললেন: আমি গো শ্লো সমর্থন করি না।[১০]

পাঁচই নভেম্বর ক্যাবিনেট বিধিমত রাজ্যপালকে পরামর্শ দিলেন: ডঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করুন।

সেদিন দুপুর পর্যন্ত ফ্রন্টের নেতারা বেশ শক্তই ছিলেন। কিন্তু বিকালে যখন শুনলেন যে, রাজ্যপাল পরদিনই আবার মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছেন তখন তাঁরা বেজায় ভয় পেয়ে গেলেন। এইসঙ্গে তাঁরা নানা সূত্র থেকে শুনলেন যে, এইদিনই রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার অভিযোগে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবেন। শুনে তাঁদের রক্ত একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল।

রাত্রে ফ্রন্টের বড় বড় সব নেতা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মিলিত হলেন। অনেকক্ষণ পরামর্শ চলল। আবার সোমনাথ লাহিড়ীই প্ল্যান দিলেন। সেই পরিকল্পনার এক নম্বর আইটেম: রাত্রেই মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিয়ে বলবেন যে, বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা ছাড়া মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা বে-আইনী। দু নম্বর আইটেম: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীরাও যাবেন রাজ্যপাল সমীপে। তিন নম্বর: খবরের কাগজে কাগজে এই সংবাদটা চালিয়ে দেওয়া হবে যে, রাজ্যপাল মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিলেও মন্ত্রীরা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দখল ছাড়বেন না। তাঁরা যে যাঁর ঘরে বসে থাকবেন এবং জনগণকেও তাঁদের সঙ্গে বসে থাকতে আহ্বান জানাবেন।

এই পরিকল্পনা মত সেই দিনই রাত পৌনে বারটায় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিলেন: মনে হচ্ছে কাল সকালে দেখা করতে গেলে রাজ্যপাল আমাকে পদত্যাগ করতে বলবেন এবং আমি পদত্যাগপত্র পেশ করতে রাজী না হলে আমার মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবেন। এভাবে কাজ করার কোনও অধিকার রাজ্যপালের নেই। এভাবে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা বে-আইনী।

পরদিন সকালে সাতজন মন্ত্রীসহ মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে গেলেন। ধর্মবীর শুধু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাতে রাজ্যপাল মুখ্য-

[১০] আনন্দবাজার পত্রিকা। ৫-১১-৬৭।

মন্ত্রীকে একা পেয়ে চাপ দিয়ে কিছু করিয়ে না নিতে পারেন. বরং উল্টো যাতে রাজ্যপালের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায় সেইজন্যই সাতজন মন্ত্রীও গেলেন।

রাজ্যপাল বললেন, যথাশীঘ্র বিধানসভা ডাকুন—বিশে নভেম্বরের মধ্যে হলেই ভাল হয়। মন্ত্রীরা অনেকেই রাজ্যপালের সঙ্গে তর্ক করতে এগিয়ে গেলেন। বললেন: বিধানসভা ছ' মাসের মধ্যে ডাকতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ঠিক কবে হবে সেটা নির্ভর করবে মন্ত্রিসভার উপর, এব্যাপারে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলতে বাধ্য।

রাজভবন থেকে বেরিয়ে এসে মন্ত্রীরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক, তাহলে আজই মন্ত্রিত্বটা গেল না! তাঁদের ভয় ছিল. অবিলম্বে বিধানসভা ডাকতে রাজী না হলে ধর্মবীর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করবেন।

ব্যাপারটা শুধু মৌখিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না রেখে রাজ্যপাল লিখিত-পড়িত করে রাখতে চাইলেন। সেইজন্যই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক চিঠিতে আনুষ্ঠানিকভাবে লিখলেন: সতেরজন ফ্রণ্ট এম. এল. এ পদত্যাগ করায় এবং তাঁদের ষোলজন ও কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা একটি বিকল্প সরকারকে সমর্থন জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সংশয় দেখা দিয়েছে ফ্রণ্ট সরকার বিধানসভায় গরিষ্ঠ কিনা। এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যথাশীঘ্র বিধানসভার অধিবেশন ডেকে রায় নেওয়া উচিত। আপনি আটই নভেম্বর ইন্দোর যাওয়ার আগে বিধানসভা কবে ডাকছেন জানালে খুশী হব।

সেইদিনই মন্ত্রীরা পরামর্শে বসলেন, কবে বিধানসভা ডাকা যায়। মুখ্যমন্ত্রী মোটামুটি তাড়াতাড়ি ডাকার পক্ষে মত দিলেন। জ্যোতিবাবুও তাঁকে সমর্থন জানালেন। কিন্তু অন্য সবাই বললেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝির আগে কিছুতেই হয় না। সি পি আইর মন্ত্রীরা বললেন, জানুয়ারিতে হলেই ভাল হয়।

সাতই নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে জানালেন. ক্যাবিনেট আঠার ডিসেম্বর বিধানসভা ডাকতে চায়।

রাজ্যপাল বললেন, তা কি করে হয়, সে যে এক মাসেরও বেশি! ধর্মবীর মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন: না, তা হয় না। অবিলম্বে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা চাই। রাজ্যপাল ডঃ ঘোষ এবং কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা খগেন দাশগুপ্তের বিবৃতির প্রতিও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কংগ্রেসী এবং যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী অন্যান্য এম. এল. এ-দের কিভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে এই দুই বিবৃতিতে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে জানালেন, যে কোন এম. এল. এ চাওয়া মাত্রই পুলিশ পাবেন।

ধর্মবীর পরদিনই আবার জ্যোতি বসুকে ডেকে পাঠিয়েও বিধানসভার অধিবেশন এগিয়ে আনার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না। জ্যোতিবাবুও রাজ্যপালকে বললেন, আঠারই ডিসেম্বরের আগে বিধানসভা ডাকার নানা অসুবিধা।

অজয়বাবু ততক্ষণে সদলবলে ইন্দোরের পথে রওয়ানা দিয়েছেন। ইন্দোরে

ক্রান্তি দলের সম্মেলন হচ্ছিল। সদলবলে গেলেন হুমায়ুন কবিরও। সেখানে দুপক্ষে মিটমাটের শেষ চেষ্টা হল। কিন্তু কোনও সুফল পাওয়া গেল না। অজয়-বাবু এক বিচারে জিতলেন। দলের সভাপতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মহামায়াপ্রসাদ সিং ঘোষণা করলেন: ক্রান্তি দল কোথাও কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবেন না।

এই খবর প্রকাশিত হওয়ায় কলকাতায় বেশ কিছুটা কনফিউশন দেখা দিল, তাহলে কবিরপন্থীরা কী করবেন? তাঁরা যে ক্রান্তি দলেরই সদস্য!

১২ই এই কনফিউশন দূর করলেন স্বয়ং ডঃ ঘোষ। তিনি প্রকাশ্যে কংগ্রেস নেতাদের জানালেন: ক্রান্তি দল যাই বলুন, আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনে রাজী।

ইন্দোরে কবিরপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় অজয়বাবুর জিদ ভীষণভাবে বেড়ে গেল। ফেরার পথে তিনি দিল্লি হয়ে এলেন। রাজধানীতে এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন[১১]: বাংলার জনগণ শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দেবে, তবু কেন্দ্রের অবিচারের কাছে মাথা নত করবে না। বর্তমান সংকটের দরুণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমস্ত শরিকই তাঁদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলেছেন।

এদিকে কংগ্রেসীরা এবং ফ্রন্টত্যাগী এম. এল. এরা তখন একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। ফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু হয়ে যেতেও রাজ্যপাল কিছু করতে পারছেন না দেখে তাঁরা চরম বিক্ষুব্ধ হলেন। রাজ্যপাল তাঁদের আকারে ইংগিতে বুঝিয়ে দিলেন: আমার কিছুই করার নেই, কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হচ্ছেন না।

কংগ্রেসীরা ও ফ্রন্টত্যাগীরা একদিকে তাই বিবৃতি দিতে আরম্ভ করলেন এবং অন্যদিকে সুরু করলেন দিল্লিতে তদবির। সাতই প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এক প্রস্তাবে বললেন: সংখ্যালঘু ফ্রন্ট সরকার নানা অজুহাতে এবং অন্যায় ও বে-আইনীভাবে গদি আঁকড়ে থাকতে চাইছেন। একাজ তাঁদের কিছুতেই করতে দেওয়া উচিত নয়। ওইদিনই হুমায়ুন কবির বিবৃতি দিলেন: অবিলম্বে ফ্রন্ট সরকারের অবসান চাই—সম্ভব হলে বিকল্প সরকার, না হলে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই।

পরদিন খগেন দাশগুপ্ত রাজ্যপালের কাছে এক চিঠি দিলেন: যদি অবিলম্বে বিধানসভা ডাকা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিয়ে এই মন্ত্রিসভার অবসান ঘটান।

তারও পরদিন ডঃ ঘোষ ও প্রতাপ চন্দ্র দিল্লি যাত্রা করলেন। একই বিমানে রাজধানী গেলেন রাজ্যপাল ধর্মবীর।

ডঃ ঘোষ এবং প্রতাপবাবু রাজধানীতে অনেকের সঙ্গেই দেখা করলেন। তাঁরা নেতাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, দেরি করলে যুক্তফ্রন্টের গুণ্ডারা সব অচল করে দেবে। ওরা বলছে বটে যে আঠারই ডিসেম্বর বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা করবে। কিন্তু আসলে তা হতেই দেবে না। বিধানসভায় ঢুকে কংগ্রেসী এবং ফ্রন্টত্যাগী

---

[১১] ১১-১১-৬৭।

এম. এল. এদের ভোটই দিতে দেবে না।

সুতরাং তাঁরা দাবি করলেন, সংখ্যালঘু ফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হোক। দিল্লির কর্তারা বললেন, আইনের প্রশ্ন আছে, আমরা সব দিক ভেবে দেখছি।[১২] কর্তারা মোটামুটি একই কথা বললেন রাজ্যপাল ধর্মবীরকেও: বিধানসভার দিন এগিয়ে আনতে ওদের বার বার অনুরোধ করতে থাকুন। দেখা যাক কি হয়। আমরা আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছি।

আসলে তখনও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে হাইকমাণ্ডে নানা মত। একদল চান, বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা। আর এক দলের অভিমত, ফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা ছাড়া উপায় নেই। কেউ কেউ এমনও বললেন যে, ক্যাবিনেট বিধানসভা ডাকতে রাজী না হলে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল নিজেই বিধানসভা ডাকতে পারেন এবং শক্তিপরীক্ষার নির্দেশ দিতে পারেন।

কিন্তু এই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং আইন দফতরের বিশেষজ্ঞরা একমত হয়েই রায় দিলেন যে: বিধানসভা ডাকার ব্যাপারে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ নিতে বাধ্য। তবে, বরখাস্ত করার অধিকার তাঁর আছে।[১৩]

কেন্দ্র তখন মোটামুটি স্থির করলেন, বিধানসভার অধিবেশন এগিয়ে আনতে রাজী না হলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্তই করা হবে।

নীতিগতভাবে যখন বরখাস্তই করা হবে বলে স্থির হল তখন প্রশ্ন দেখা দিল কখন বরখাস্ত করা এবং কিভাবে বরখাস্ত করা। এ নিয়েও মতভেদ দেখা দিল কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে। একদল বললেন, আরও বেশ কিছুদিন না দেখে হুট করে কিছু করলে পশ্চিমবঙ্গে একটা রক্তগঙ্গা বইবে। ফ্রন্ট হরতালের পর হরতাল ডেকে সব অচল করে দেবে। এবং অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য প্রচণ্ড গুলিগোলা চালাতে হবে। তাতে অনেক লোকও মরবে।

আর একদল বললেন, যত দেরি করা হবে ততই যুক্তফ্রন্টের লাভ। কারণ, তাঁরা প্রস্তুতি গড়ার সুযোগ পাবে।

কয়েকদিন এই বিতর্ক চলার পর কেন্দ্রীয় নেতারা স্থির করলেন, তাহলে পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য দিল্লি থেকে লোক পাঠানো হোক। তাঁরা দেখে আসুন, ফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করলে তার ফলাফল কী হতে পারে।

এই সিদ্ধান্তমত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের প্রধান ভারমা এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের জয়েন্ট সেক্রেটারি কে কে রায় তেরই নভেম্বর কলকাতা এলেন। তাঁরা নানা জনের সঙ্গে কথা বললেন। নানাভাবে পরিস্থিতি যাচাই করলেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে আই. জি. উপানন্দ মুখার্জী এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার পি কে সেনের সঙ্গে কথা বলতে বসলেন।

আই. জি. বললেন: কিছুটা গণ্ডগোল হতে পারে, তবে 'অচল করে দেব ফেব' বাজে হুঙ্কার। দুতিন দিন পরেই সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কমিশনার কিন্তু অন্য কথা বললেন। তাঁর অনুমানে: ব্যাপক হাঙ্গামা হবে। সেই হাঙ্গামা থামাতে বহু লোক মারতে হবে। পরিস্থিতি কতদিন অস্বাভাবিক

---

[১২] প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

[১৩] আনন্দবাজার পত্রিকা ১২-১১-৬৭।

থাকবে বলা মুস্কিল।

ভারমা এবং রায় রিপোর্ট দিলেন: গণ্ডগোল হবে, তবে যতটা ভয় ফ্রণ্টের নেতারা দেখাচ্ছেন ততটা হবে না।

চোদ্দই রাজ্যপাল দিল্লি থেকেই ফিরেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন: তেইশে নভেম্বরের মধ্যেই বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। আর বললেন, কাল সকালেই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আবার মন্ত্রিসভার সদস্যরা বৈঠকে বসলেন। সেই বৈঠকে স্থির হল, মুখ্যমন্ত্রী লিখিতভাবেই তাঁর মতামত রাজ্যপালকে জানাবেন। সেইমত অজয়বাবু লিখে পাঠালেন: মন্ত্রিসভার বৈঠক ছাড়া আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে কিছুই জানানো সম্ভব নয়। মন্ত্রিরা অনেকেই বাইরে। তাই সতেরো নভেম্বরের আগে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা বা আপনার চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

পরদিন সকালেই অজয়বাবু রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজ্যপাল তাঁকে পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন, বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার দিন এগিয়ে আনা না হলে তিনি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হবেন।

অজয়বাবু ফিরে এসে ক্যাবিনেট সদস্যদের সব কথা বললেন। আবার আলোচনা সুরু হল, দিন এগিয়ে আনা উচিত না অনুচিত? অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু দুজনেই আবার দিন এগিয়ে আনার পক্ষে মত দিলেন। সোমনাথ লাহিড়ি, কাশীকান্ত মৈত্র, সুশীল ধাড়া, অমর চক্রবর্তীরা তাতে ঘোরতর আপত্তি জানালেন।

ষোলই যুক্তফ্রণ্ট কমিটিতেও দিন এগোনো নিয়ে বিস্তর আলোচনা হল। সেখানেও এক রায়: না, দিন এগোনো উচিত হবে না।

পরদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক বৈঠক বসল। ক্যাবিনেট বললেন: না, দিন কিছুতেই এগোনো যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী সেই মত চিঠি দিলেন রাজ্যপালকে।

এইদিন প্রধানত কাশীকান্ত মৈত্র এবং সোমনাথ লাহিড়ির পরামর্শে মন্ত্রিসভা আর একটা অভিনব ব্যবস্থা নিলেন। সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করলেন: আপনি এইসব প্রশ্নে সুপ্রীম কোরটের মত নিন। সুপ্রীম কোরট যা বলবেন আমরা তা মেনে নেব। এই সাতটির মধ্যে সব চেয়ে বড় দুটি প্রশ্ন ছিল: তাঁর ইচ্ছামত দিনে বিধানসভা ডাকায় মন্ত্রিসভাকে বাধ্য করার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে কিনা? এবং বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা ছাড়া রাজ্যপাল তাঁর নিজের অনুমানমত সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার অভিযোগে কোনও সরকারকে বরখাস্ত করতে পারেন কিনা?

আঠারোই ভোরের প্লেনেই একজন সরকারী অফিসারের হাতে মন্ত্রিসভার এই আবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হল।

মন্ত্রিরা মনে করলেন, এবার বাছাধন ধর্মবীরকে বেশ বেকায়দায় ফেলা গিয়েছে!

এইভাবে একদিকে যখন মন্ত্রিসভা সময় নেওয়া ও পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন অন্যদিকে তখনই কয়েকজন মন্ত্রী ও ফ্রন্ট নেতা মরিয়া হয়ে বাজারে এম. এল. এ খুঁজতে বেরিয়েছেন।

যে যেদিকে পারলেন চেষ্টা করলেন। কংগ্রেসে চেষ্টা করা হল। নির্দলদের মধ্যে চেষ্টা করা হল। দলত্যাগীদেরও ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলল। জগন্নাথ কোলে তখন কংগ্রেসের চিফ হুইপসিপ ছেড়ে দিয়েছেন। কয়েকজন ফ্রন্ট নেতা গিয়ে তাঁকে ধরলেন: কিছু এম. এল. এ এনে দিন। এদের মধ্য থেকে মন্ত্রীও করা হবে। নির্দল গোষ্ঠীর রাধাকৃষ্ণ সিংহকে ধরা হল: আপনারা গোষ্ঠীগতভাবে চলে আসুন—দল থেকে একাধিক মন্ত্রী করা হবে।

হুমায়ুন কবিরের সঙ্গেও একটা রফার চেষ্টা হল। বিশ্বনাথ মুখার্জী গঙ্গা প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে কবির সাহেবের কাছে গেলেন। কবির সাহেব প্রথমেই সি পি এমের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করলেন। বললেন, ওরা সরকার হাতে পেয়ে পশ্চিমবঙ্গকে মগের মুল্লুকে পরিণত করতে চাইছে। বিশ্বনাথবাবু স্বীকার পেলেন বাড়াবাড়ি হয়েছে। তবু কবির সাহেবের কাছে আবেদন করলেন: সরকার ভাঙবেন না।

কবির বললেন: ঠিক আছে, সরকার ভাঙ্গা হবে না। আপনারা সি পি এমকে বাদ দিয়ে সরকার করুন। আমরা আছি। কংগ্রেসও সমর্থন জানাবে। আমি ওদের রাজী করাব। বিশ্বনাথবাবু তাতে কিছুতেই রাজী হতে পারলেন না। বললেন: তা সম্ভব নয়।[১৪]

এটা সাতই নভেম্বরের ঘটনা। কবির এর পর দিল্লি চলে গেলেন। সেখানে আবার তাঁকে অনুরোধ জানাতে গেলেন ত্রিদিব চৌধুরী এবং সৈয়দ বদরুদ্দোজা। কবির সাহেব তাঁদেরও একই জবাব দিলেন।

শেষ চেষ্টা করলেন অশোক ঘোষ আর কমল গুহ। একুশে ভোরে তাঁরা গেলেন গঙ্গা প্রামাণিকের কাছে। কবির গোষ্ঠীর আরও দুজন এম. এল. এ সেখানে এসে হাজির হলেন। বহু আলোচনার পর তিনমি শর্তের একটি চুক্তি হল। প্রধান শর্ত: ওদের গোষ্ঠীকে ফ্রন্টে নেওয়া হবে। আলাদা অস্তিত্ব মানা হবে। গুরুত্বপূর্ণ দফতর সহ ওদের মধ্য থেকে মন্ত্রীও করা হবে। দফতর পুনর্বণ্টনের জন্য ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হবে। হাঙ্গামা হুজ্জুতী বন্ধ হবে।

দুপক্ষই রাজী হলেন মিটমাটে। কথা হল, কমল গুহ গিয়ে অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবুকে রাজী করাবেন। কবির সাহেব অরাজী হলেও গঙ্গাবাবুরা তাঁকে অমান্য করেই চুক্তি মত কাজ করবেন।

আরও কথা হল, দুপক্ষই দুপুর দেড়টা নাগাদ পাকা কথা জানাবেন। কমল গুহ গঙ্গা প্রামাণিককে ফোন করবেন। তারপর দুপক্ষে আবার বৈঠক হবে।

কমল গুহ ছুটে রাইটার্স বিলডিংস-এ গিয়ে অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবুকে সব জানালেন। তাঁরাও সোৎসাহে রাজী হয়ে গেলেন। সেখান থেকেই গঙ্গা প্রামাণিকের বাড়িতে ফোন করলেন। কিন্তু বার বার ফোন করেও কোনই জবাব

---

[১৪] গঙ্গাধর প্রামাণিক। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০।

পেলেন না। কেউ টেলিফোন ধরলেন না।[১৩]

গঙ্গাবাবু এবং চন্ডীবাবু ততক্ষণে কবির সাহেবের কাছে পেঁছে গিয়েছেন। সব শুনে কবির বললেন: ও হয় না। ওটা আবার ওদের একটা নতুন চালবাজি। দুই এম. এল. এ তাঁদের নেতাকে অমান্য করতে পারলেন না।[১৩]

ফ্রন্টের নেতারা যে এইভাবে মরিয়া হয়ে এম. এল. এ ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছেন সে খবর কংগ্রেস এবং কবির মহলেও গিয়ে পেঁছল। তাঁরা সবাই শংকিত হয়ে উঠলেন। বুঝলেন, বিলম্বে তাঁদের পক্ষের এম. এল. এরা হতাশ হয়ে পড়ছেন। তাঁরা কেন্দ্রকে এবং ধর্মবীরকে সব জানালেন।

সবাই বুঝলেন, আর দেরি করলে সব উদ্যোগ আয়োজন ভেস্তে যাবে। কুড়ি তারিখ রাত্রেই তাই ধর্মবীর পশ্চিমবঙ্গের চার প্রধান অফিসারকে ডেকে বললেন: সব ব্যবস্থা করুন। কাল রাত আটটায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা হবে। আপনারা প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

একুশেও সেই বেলা তিনটে নাগাদই রাইটার্স বিলডিংস-এ গেলাম। প্রথমেই দেখা মেন গেটের বুড়ো লিফটম্যানের সঙ্গে। বললেন: কিয়া বাবু, আজ কুছ হো রহা?

আমি বললাম: কিয়ো?

বললেন: কিয়া সব শুনতা হ্যায়।

প্রেস কর্ণারে না গিয়ে সোজা এক অফিসারের ঘরে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম: আজই?

বললেন: হ্যাঁ।

প্রেস কর্ণারে এলাম। বেশ উত্তেজনা। রাজ্যপাল নাকি সেইদিন দুপুরেই একজন অফিসার মারফৎ মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, তিনি শেষ বারের মত জানতে চান বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার দিন এগোতে ক্যাবিনেট রাজী কিনা।

ক্যাবিনেট আবার বসলো। বসে মন্ত্রীরা আবার রায় দিলেন, না। কেউ কেউ বললেন, এটা ধর্মবীরের প্রেসার ট্যাকটিস। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু অন্যরকম খবর রটতে আরম্ভ করল। বিকালে কোনও এক টেলিফোন অপারেটর হরেকৃষ্ণ কোঙারকে গোপন খবর দিলেন যে, কলকাতা পুলিশ খুব জরুরীভাবে পেট্রোল সংগ্রহ করছে।

তার কিছুক্ষণ পরে সোমনাথবাবুর কাছে খবর দিলেন একজন রিপোর্টার: কি যেন একটা হচ্ছে। সোমনাথবাবু আর একজনকে পাঠালেন খবর নিতে:

---

[১৩] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

[১৩] গঙ্গা প্রামাণিক। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০। গঙ্গাবাবু বলেন, অশোক ঘোষ এবং কমল গুহ এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে অজয়বাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র এবং জ্যোতিবাবুর হাত থেকে অর্থ দফতর সরিয়ে নেওয়া হবে। অশোক ঘোষ তা অস্বীকার করেন।

দেখ তো চিফ সেক্রেটারি এবং আই. জি অফিসে আছে কিনা?

তিনি এসে খবর দিলেন: হ্যাঁ, আছে।

সোমনাথবাবু বুঝলেন, আজ সত্যিই একটা কিছু হচ্ছে।

সওয়া সাতটা নাগাদ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: আজ কিছু হচ্ছে নাকি?

আমি বললাম: হ্যাঁ, আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি।

সোমনাথবাবু টেলিফোন তুলে বাংলা কংগ্রেস অফিস চাইলেন। বললেন: অজয়বাবুকে দেখি।

জবাব এল: অজয়বাবু নেই। তিনি গ্র্যান্ড হোটেলে ক্রান্তি দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন।

সোমনাথবাবু বললেন: এক্ষুণি তাঁকে খবর দিন, রাত আটটায় ধর্মবীর মিনিস্ট্রি বরখাস্ত করবে।

আমরা রিপোর্টাররা সবাই ছুটলাম রাজভবনে। ততক্ষণে আমাদের কাগজের আর দুজন রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার রাজভবনে ঢুকে বসে আছেন।

প্রায় ছুটতে ছুটতে রাজভবনের দোতলায় উঠে গেলাম।

উঠে দেখি ছোট্ট ঘরে ডঃ ঘোষ শপথ নিচ্ছেন। ডঃ ঘোষ সেদিন বেজায় খুশী। সেই '৪৮ সন থেকেই তিনি আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই চেষ্টা সফল হল ১৯৬৭ সনে—এতদিন পরে! আরও একটা কারণে ডঃ ঘোষ এইদিন বিশেষ খুশী ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার এইদিনই তাঁকে সরকারী ফ্ল্যাট ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পদত্যাগী খাদ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীরূপে সেই ফ্ল্যাট দখল করলেন।

তারপর একে একে শপথ নিলেন হরেন মজুমদার এবং আমির আলি মোল্লা।

পাশে একটা সোফায় বসে প্রফুল্ল সেন, হুমায়ুন কবির এবং খগেন দাশগুপ্ত। তিনজনই খুব হাসিখুশী ভাব। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আশু ঘোষ। সকালেই আশু ঘোষ তিনটি মালা এনে ঠাণ্ডি ঘরে রেখে দিয়েছিলেন। তিনটি মালা তিন মন্ত্রীকে পরিয়ে দেওয়া হল।

তারপর আশু ঘোষ রাজ্যপালকে বললেন: স্যার, মাই টাস্ক ইজ ওভার।... আপনি কি আমাদের একটু চা খাওয়াবেন না?

আবার ডঃ ঘোষ

সুরু হল একটা নতুন যুগ। প্রায় উনিশ বছর পরে ডঃ ঘোষ আবার পশ্চিমবাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তাঁর দলের নাম হল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট—সংক্ষেপে পি ডি এফ। পি ডি এফের মন্ত্রিসভা, কংগ্রেস সমর্থক।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হল, ডঃ ঘোষ উনত্রিশ নভেম্বরই বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষায় নামবেন।

গদিচ্যুত হয়েই যুক্তফ্রন্ট হরতালের ডাক দিলেন। পর পর দুদিনের হরতাল। প্রথম তিনদিন বেশ কিছুটা হাঙ্গামা হল। কিছু অগ্নিকাণ্ড। পুলিশ গুলি চালাল বহু স্থানে। জনা দশেক মারা গেলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বহু নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হলেন। ডঃ ঘোষ পুলিশকে নির্দেশ দিলেন: কঠোর হস্তে হাঙ্গামা দমন কর। হাঙ্গামা যারা করতে আসবে তারা যেন বুঝে যায় যে, হাঙ্গামা করলে ভাল মাশুলই দিতে হবে। পুলিশও সেই হুকুম মনের আনন্দে তামিল করলেন। ময়দানে ফ্রন্টের একটা জনসভা ডাকা ছিল আগে থেকেই। ডঃ ঘোষ ক্ষমতা হাতে নিয়েই ১৪৪ ধারা জারি করলেন শহরে। সি. পি. এম ছাড়া ফ্রন্টের আর সব দলের নেতারা সেই নিষেধাজ্ঞা ভেঙ্গে মিটিং করতে লেগেন। পুলিশ তাঁদের নির্দয়ভাবে পেটালো। এমনকি, আগের দিনের মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জী, অমর চক্রবর্তীকেও ছাড়ল না।

কিন্তু তবু ছাব্বিশ তারিখ অবস্থা পুরোপুরি সরকারের আয়ত্তে চলে এল। পশ্চিমবঙ্গ আবার সেই পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এল।

ফ্রন্টের নেতারা তেইশেই বসলেন আলোচনায়। মূল প্রশ্ন: এখন কী করা? বিধানসভার ভেতরেই বা কী করা, বাইরেই বা কীভাবে আন্দোলন চালানো?

স্থির হল, আগে বিধানসভার অধিবেশনটা দেখে তারপর বাইরের কথাটা ভাল করে ভাবা যাবে। ফ্রন্ট আরও স্থির করলেন, বিধানসভায় এর পরও ফ্রন্ট আগের মতই চলবে—অজয়বাবু নেতা, জ্যোতিবাবু উপনেতা এবং কমল গুহ চিফ হুইপ। বিধানসভায় কী করা হবে সেটা নিয়ে কিন্তু ফ্রন্টের বৈঠকে কোনও আলোচনাই হল না। শুধু এইটুকু বললেন ফ্রন্টের নেতারা, ডাঃ ঘোষের সরকার বে-আইনী, আমরা তাকে মানি না। অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু, সোমনাথবাবু, কাশীকান্ত মৈত্র এবং কমল গুহকে নিয়ে একটা কমিটি হল। স্থির হল, বিধানসভায় কী করা তা এই কমিটিই স্থির করে দেবেন। কমিটি অত্যন্ত গোপনে কাজ চালালেন। এত গোপনীয়তা যে দলের নেতাদের পর্যন্ত অনুরোধ জানান হল যে তাঁরা যেন কমিটির কোনও সদস্যকে কিছু না জিজ্ঞেস করেন। কমিটির সদস্যরা অত্যন্ত গোপনে স্পীকার বিজয় ব্যানার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বললেন। আশ্বাস দিলেন, বিজয়বাবুর কোনও ভয় নেই। রিপোর্টারদের এক আধজন সেই খবরটা জানতেও পারলেন না। তাঁরা কমিটির কাউকে কোনও

কথা না জিজ্ঞেস করে সোজা বিজয়বাবুকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন: নতুন সরকার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

বিজয়বাবু বললেন : নতুন সরকার যে হয়েছে সেই খবরটাই এখনও আমাকে কেউ জানাননি।...কিছু বলা উচিত এটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আপাতত কিছুই বলতে পারছি না।[১]

সাতাশে যুক্তফ্রন্টের পরিষদীয় দলের বৈঠক হয়। কমিটির সদস্যরা সেখানেও কাউকে কিছু জানালেন না। তাঁরা শুধু বললেন, যা 'উচিত' এবং 'দরকার' তা করা হবে।

পরদিন ফ্রন্টের নেতারা রিপোর্টারদের বললেন : এ সরকার বে-আইনী। তাই এ সরকারের ডাকা অধিবেশনও বে-আইনী। আমরা বিধানসভায় যাব। তবে অধিবেশন হতে দেব না।

কংগ্রেসীরা এবং পি. ডি. এফ পন্থীরা ধরে নিলেন যুক্তফ্রন্ট এম. এল এ-রা হাঙ্গামা করে বিধানসভা বানচালের চেষ্টা করবে। তাঁরা সেইভাবেই প্রস্তুত হলেন।

আমরা দু-একজন রিপোর্টার কিন্তু তখন ফ্রন্টের গোটা পরিকল্পনাটা না জানলেও কিছুটা কিছুটা আঁচ করেছি। উনত্রিশেই আনন্দবাজারে আমার রিপোর্ট বের হল : বিধানসভার ভিতরে সবকিছু নির্ভর করছে স্পীকারের মনোভাবের উপর। স্পীকার সেখানে সর্বশক্তিমান। স্পীকারের রুলিং অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারু কিছুই করার নেই—রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতিও তাঁকে সরাতে পারেন না। সেজন্য প্রয়োজন বিধানসভার অনাস্থা প্রস্তাব। ফ্রন্ট আজ গোড়াতেই স্পীকারের কাছে দাবি জানাবেন : এ অধিবেশন বে-আইনী। এ অধিবেশন বসতেই পারে না। স্পীকার কী রুলিং দেন তার উপরই সব নির্ভর করবে।

চরম উত্তেজনার মধ্যে উনত্রিশে নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন সুরু হল। সবাই ভাবছেন, কখন ফ্রন্টের এম. এল. এ-রা হাঙ্গামা সুরু করেন।

কিন্তু তাঁরা তা করলেন না। স্পীকার ঢুকতে সুবোধ বালকের মত সবাই উঠে দাঁড়ালেন। স্পীকার বসতে আবার চুপচাপ বসে পড়লেন।

স্পীকার বসেই আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়েই তিনি পকেট থেকে বের করে একখানা টাইপ করা কাগজ পড়া সুরু করে দিলেন। স্পীকার কী পড়ছেন কংগ্রেস এবং পি. ডি. এফ সদস্যরা তা বুঝতে না বুঝতেই বিজয় ব্যানার্জীর প্রায় অর্ধেক পড়া শেষ। তাঁরা তিন-চারজন দাঁড়িয়ে উঠে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। স্পীকার কোনও দিকে না তাকিয়ে পড়ে চললেন : ...আপাতদৃষ্টিতে আমি সন্তুষ্ট যে, শ্রীঅজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা খারিজ, মুখ্যমন্ত্রীরূপে ডঃ পি. সি. ঘোষের নিয়োগ এবং তাঁর পরামর্শে এই অধিবেশন আহ্বান সংবিধান বিরোধী এবং অবৈধ। কারণ, এ সভার পিছন দিয়ে একাজ করা হয়েছে। এই বিষয়ে পূর্ণ ও যথোপযুক্ত পরীক্ষা সাপেক্ষে সভার পরিচালনা সংক্রান্ত ১৫নং ধারা অনুসারে

---

১ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬-১১-৬৭।

আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা মুলতুবী রাখছি।

টাইপকরা কাগজখানা পড়া শেষ করেই বিজয়বাবু সভা ছেড়ে চলে গেলেন। পি. ডি. এফ এবং কংগ্রেসের বহু এম. এল. এ তখনও বিস্ময়ে হতবাক্। আর যুক্তফ্রণ্টের এম. এল. এ-রা বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়ছেন।

এটাই হল বিজয় ব্যানার্জীর ঐতিহাসিক রুলিংয়ের সামনের দিক। পেছনের দিকটা জানেন ওই কমিটির পাঁচ সদস্য, স্বয়ং স্পীকার এবং মোহন কুমারমঙ্গলম। তাঁরা গোপনে মিলিত হয়ে আইনগত পরিস্থিতিটা আলোচনা করেন। সেই আলোচনায় কুমারমঙ্গলমও ছিলেন। তিনিই রুলিং-এর একটি খসড়া তৈরী করেন। মোহন কুমারমঙ্গলম চিরকালই কমিউনিস্ট ঘেঁষা লোক। একদা মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। তাছাড়া তিনি সম্পর্কে অজয়বাবু এবং বিশ্বনাথ-বাবুর জামাই। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরারও ঘনিষ্ঠ।

এই রুলিং কেন্দ্রীয় সরকারকে, কংগ্রেস দলকে এবং রাজ্যপালকে একেবারে বোবা বানিয়ে দিল। তাঁরা প্রথমে বুঝতেই পারলেন না, কী করা।

সেইদিন রাত্রেই ডঃ ঘোষের ফ্লাটে কংগ্রেসী ও পি. ডি. এফ নেতাদের এক জরুরী বৈঠক হল। সেই বৈঠকে সিদ্ধার্থ রায় বললেন, অবিলম্বে রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়ে বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। না হলে স্পীকার তলে তলে যুক্তফ্রণ্টকে খবর দিয়ে গোপনে সব উদ্যোগ আয়োজন করে হঠাৎ একদিন বিধানসভা ডেকে যে কোনও প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারেন। তাতে কংগ্রেস, পি. ডি. এফ এবং সরকার আরও বিপদে পড়বে।

সবাই বললেন, যুক্তিসংগত কথা। সেইমত মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে পরামর্শ দিলেন। এবং রাজ্যপাল সেই পরামর্শ অনুসারে বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্ত বলে ঘোষণা করলেন। এর পর আবার বিধিমত বিধানসভা ডাকতে হলে রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন। কারণ বিধানসভার অধিবেশন তিনি ছাড়া কেউ ডাকতে পারেন না।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করলেন ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা বৈধ। চবন রাজ্যসভা এবং লোকসভায় এ নিয়ে একটা বিবৃতিও দিলেন। লোকসভায় সেটা পাশও করিয়ে নেওয়া হল ১৯৫-২১ ভোটে।

কিন্তু প্রস্তাব পাশ হলে কি হবে, বিধানসভা আবার কি করে বসান যায় সে পথ কিছুতেই দিল্লির কর্তারা খুঁজে বের করতে পারলেন না। একটা প্রস্তাব গেল কলকাতা থেকে : লোকসভাকে দিয়ে রাজ্য বিধানসভার রুলস অফ বিজনেস সংশোধন করে স্পীকারকে সরান হোক। সেই প্রস্তাবটা প্রথমে কারো কারো বেশ জুতসই বলে মনেও হল। রুলস অফ বিজনেসের কয়েকশ' কপি নতুন করে ছাপানও হল, যাতে প্রয়োজনমত এম. পি-দের হাতে কপি পেঁৗছে দিতে কোনও অসুবিধা না হয়।

শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বললেন, না, ওতেও হবে না। স্পীকারের রুলিং থেকে বেরিয়ে আসার পথ কেউই বাতলাতে পারলেন না।

ভেতরে যখন এই অবস্থা বাইরে তখন পি. ডি. এফ এবং কংগ্রেসীদের মধ্যে

পূর্ণ সমর্থন

মন্ত্রী হওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি সুরু হয়ে গিয়েছে। চৌঠা ডিসেম্বর একমাত্র পি. ডি. এফ থেকেই আটজন নতুন মন্ত্রী হলেন।

কংগ্রেসীদের অনেকেও তখন আর দেরী করতে রাজী নন। তাঁরা নানাভাবে চাপ দিতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। ছোট্ট একটা দলের উপর এতগুলি সমস্যা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়! যেন সমস্যা সমাধানের চিন্তায় তাঁদের ঘুম হচ্ছিল না!

তখন ডঃ ঘোষ, অতুল্যবাবু, প্রতাপ চন্দ্র এবং সিন্ধার্থ রায় গেলেন দিল্লিতে। কর্তাদের কাছ থেকে পরিষ্কার করে বুঝতে, অবস্থাটা কী, করাই বা কী?

তাঁরা প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন যে সাংবিধানিক সংকট দূর হলেই কংগ্রেস সরকারে যোগ দেবে। তার আগে নয়।

এদিকে তখনও আলোচনা চলছে, কি করে সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূর করা যায়। একটা প্রস্তাব এল : বিজয় ব্যানার্জীকেই কি মত পালটাতে রাজী করানো যায় না? সেইমত চেষ্টাও হল কিছুটা। কিন্তু কোনও সুবিধা হল না।

তারপর আর একটা প্রস্তাব এল : যদি এরপর বিধানসভা খোলার দিন বিজয় ব্যানার্জীকে অনুপস্থিত হতে রাজী করানো যায় এবং তখন ডেপুটি স্পীকার হরিদাস মিত্রকে দিয়ে কিছু একটা করানো যায়। দুজনের কাছেই তদবির চলল।[২] কিন্তু বিজয়বাবু অনুপস্থিত হতেই রাজী হলেন না। সুতরাং এ প্রস্তাবও ভেস্তে গেল।

এদিকে বাজেটের দিন এগিয়ে আসতে লাগল।

•

এরপর আশু ঘোষ গেলেন দিল্লি। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কিন্তু বললেন : হায়দ্রাবাদে পার্লামেণ্টারি বোর্ড কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় যোগদানের অনুমতি করে দেবে। তারপর সকলেরই মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়া উচিত হবে।[৩]

ততদিনে ডঃ ঘোষ এবং হরেন মজুমদারও বলা সুরু করেছেন : কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগ না দিলে আর চলে না।

নয়ুই জানুয়ারি হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের মিটিং বসল। সে মিটিং-এ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে প্রতাপবাবু এবং পরিষদীয় দলের নেতা হিসাবে খগেনবাবুকেও ডাকা হল। তাঁরা দুজনেও বললেন, কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় যোগদান করাই উচিত।

এই সিন্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের ১৩১ জন এম. এল. এ-র মধ্যে মন্ত্রী হওয়ার জন্য একেবারে হুটোপুটি পড়ে গেল। হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনে অনেকেই গিয়েছিলেন। শলাপরামর্শ সেখান থেকেই সুরু হয়ে গেল।

নেতারা যে যাঁর তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরে এলেন। সবাই কলকাতা পেঁছে যেতেই মন্ত্রী হওয়ার রেস পুরোদমে শুরু হয়ে গেল।

---

[২] আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

[৩] আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

মুস্কিলে পড়লেন কয়েকজন নেতা। বিশেষ করে খগেনবাবু। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের আগে থেকেই তিনি বেশ কয়েকজনকে কথা দিয়ে রেখেছিলেন মন্ত্রী করবেন। তেরই সকালে তিনি প্রতাপবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন : কয়েকজনকে কথা দেওয়া আছে মন্ত্রী করা হবে। এখন কী করা বলুন দেখি?

প্রতাপবাবু ব্যাপারটা বুঝেই সব এড়িয়ে গেলেন। খগেনবাবুর কাছে প্রস্তাব রাখলেন : দেখুন, আমরা তো জানি না কার কী যোগ্যতা। বরং যাঁরা জানেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যাক।[৪]

সেই মত চৌদ্দই সকালে কংগ্রেস ভবনে মিটিং বসল। উপস্থিত : প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, খগেন দাশগুপ্ত, প্রতাপ চন্দ্র, বিজয় নাহার, রবীন্দ্রলাল সিংহ, সিদ্ধার্থ রায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। বহু আলোচনার পর সেই মিটিংয়ে প্রথমে নীতিগত সিদ্ধান্তটা নেওয়া হল : আপাতত খুব অল্প কয়েকজন মন্ত্রিসভায় থাকবেন। কংগ্রেস যে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন শুধু সেইটে দেখাবার জন্যই কয়েকজন মাত্র মন্ত্রিসভায় যাবেন। তারপর সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূর হলে সম্প্রসারণের কথা ভাবা হবে। এও অবশ্য এইসঙ্গে স্থির হল যে একজন মুসলমান এবং তপশিলী মন্ত্রী নিতেই হবে।

কে কে মন্ত্রিসভায় যাবেন সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল প্রফুল্ল সেন এবং অতুল্য ঘোষকে। তাঁরা স্থির করলেন : পরিষদীয় দলের নেতারূপে খগেনবাবু, দুই উপনেতা হিসাবে রবীন্দ্রলাল সিংহ ও বিজয় নাহার, পরিষদীয় দলের সেকরেটারিরূপে প্রতাপ চন্দ্র, মুসলমানরূপে আবদুস সাত্তার এবং তপশিলী হিসাবে বিনোদবিহারী মাঝি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভায় যাবেন।[৫]

নামগুলি ডঃ ঘোষকেও জানিয়ে দেওয়া হল। ডঃ ঘোষের খুব ইচ্ছা ছিল শংকরদাস ব্যানার্জীকে মন্ত্রিসভায় নেন। তিনি তাঁকে সেরকম একটা ইংগিতও দিয়ে রেখেছিলেন। ডঃ ঘোষ প্রতাপবাবুকে কথাটা বললেন। প্রতাপবাবু ঘোরতর আপত্তি জানালেন। বললেন : যে লোককে আমরা মন্ত্রী করেছি, স্পীকার করেছি, অ্যাডভোকেট জেনারেল করেছি, সেই লোককে যুক্তফ্রন্ট সরকার আসতে যখন বলা হল যে, অ্যাডভোকেট জেনারেলসিপ ছাড়ুন, তখন তিনি ও-পদ ছাড়লেন তো না-ই, বরং বললেন, তেমন হলে কংগ্রেসের সদস্যপদই ছাড়ব—এই লোককে আমরা আর মন্ত্রী করতে রাজী নই।

ডঃ ঘোষ প্রতাপবাবুর যুক্তি মেনে নিলেন এবং সেইদিনই ছয়জনের নাম রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন : কালই শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করুন।

এর পরই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। রাজ্যপাল আশু ঘোষকে ডেকে পাঠালেন। আশুবাবু ধর্মবীরের কাছে গেলেন সাড়ে আটটা নাগাদ। পৌনে দশটা পর্যন্ত তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

দুজনে ঠিক কী কী আলোচনা হল জানি না। তবে, আশুবাবু এই সাক্ষাৎ-

---

৪ প্রতাপ চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

৫ অতুল্য ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

কারের যে বিবরণ দেন সেটা এইরকম :

"রাজ্যপাল আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কাল ক'জন মন্ত্রী হচ্ছে? ক'টা চেয়ার সাজাতে বলব? আমি বললাম, আমি কিছু জানি না। উনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি, তুমি জান না? কি ব্যাপার? আমি বললাম, আমি বিশ্বাস করি না কাল কংগ্রেসের কেউ মন্ত্রী হচ্ছেন। কবির সাহেব নিজে আমাকে বলেছেন তেইশের আগে কিছুই হচ্ছে না। রাজ্যপাল আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার বোধহয় ডঃ ঘোষের সঙ্গে এখন ভাল বনিবনা নেই। তুমি তাই সব জান না। আমি স্বীকার করলাম নানা কারণে ডঃ ঘোষের সঙ্গে আমার বনিবনা নেই। প্রথম কারণ, তিনি তাঁর জন্মদিনে দাশরথী তা এবং জগদানন্দ রায়কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ, তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে প্রেস কর্ণার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এবং তৃতীয় কারণ, তিনি প্রফুল্ল সেন এবং অতুল্য ঘোষের সঙ্গে আনহোলি অ্যালায়েন্স করেছেন। ধর্মবীর আমার সামনেই চিফ সেক্রেটারিকে ফোন করে ছয়জনের নাম জেনে নিলেন। তারপর আমাকে সেই নামগুলি বললেন। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম পৌনে দশটায়। বাড়িতে ফিরেই বিজয়বাবুকে টেলিফোন করলাম। তিনি আমতা আমতা করলেন। বললাম, বসছেন গদীতে ভালই; তবে বোধহয় বেশিদিন থাকবে না।...তারপরই টেলিফোন করলাম খগেনবাবুকে। তিনি বললেন, কিছুই জানেন না। আমি বললাম, এক টুকরো রুটি অতুল্যবাবু ছুঁড়ে দিয়েছেন আর ছুটেছেন? লজ্জা করে না!"[৬]

পরদিন সারা ভারতে মাত্র একটি কাগজে খবর বের হল : আশু ঘোষ ও তাঁর সমর্থক ৩২ জন এম. এল. এ পি. ডি· এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশনের পেছন থেকে তাঁদের সমর্থন তুলে নিচ্ছেন। সেই কাগজটি হিন্দুস্থান টাইমস। হিন্দুস্থান টাইমসের কলকাতার সংবাদদাতা তখন রাজভবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আশু ঘোষ অবশ্য বলেন, খবরটা তিনিই ডেকে সেই সংবাদদাতাকে দিয়েছিলেন।

পরদিন কলকাতায় একেবারে হইচই পড়ে গেল হিন্দুস্থান টাইমসের খবরে : সকলে খোঁজ নিয়ে জানলেন, হ্যাঁ, সংবাদ সত্য।

কিন্তু মন্ত্রীরা তবু যথারীতি শপথ নিলেন।

ধর্মবীরও সেইদিন রাত্রেই দিল্লি চলে গেলেন।

ধর্মবীরের সঙ্গেই দিল্লি গেলেন আরও দুজন। তাঁরা হলেন রবি চৌধুরী এবং রণধীর বর্মণ। আশু ঘোষ বলেন, এরা দুজন 'আমার পলিটিক্যাল এমিসারি'।

ধর্মবীর দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। রবিবাবু এবং রণধীরবাবুও অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন—মায় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বাদ গেলেন না। তাঁরা দিল্লিতে ধর্মবীরের সঙ্গেও গোপনে বহু আলোচনা করলেন।

রবিবাবু এবং রণধীরবাবু দিল্লিতে প্রেস কনফারেন্স ডেকে বললেন : বিজয় নাহার এবং জগদীশ সিংহকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে নিলে একটা রফা হতে পারে। কলকাতায় বিজয় নাহার এবং জগদীশ সিংহ দুজনেই বিবৃতি দিলেন : ওই দুজনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

---

[৬] আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

উনিশে ধর্মবীর কলকাতা ফিরলেন। ফিরেই আশু ঘোষকে ডেকে পাঠালেন। আশু ঘোষ এবং তাঁর পলিটিক্যাল এমিসারিরা যুক্তফ্রণ্টের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

ইতিমধ্যে অতুল্য ঘোষও দিল্লি পেঁছেছেন। দিল্লিতে গিয়েই তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন : কোয়ালিশন ভাঙ্গার চেষ্টায় দিল্লির উঁচু মহলেরও হাত আছে। না হলে দুজন অজ্ঞাতপরিচয় দূতের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করেন কি করে?

অতুল্যবাবু নিজেও প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি, তাঁরা বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন কেন? ইন্দিরা এবং চবন দুজনেই অতুল্যবাবুকে আশ্বস্ত করলেন : আমরা পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার দীর্ঘায়ু কামনা করি!

এদিকে আশু ঘোষ এবং তাঁর দুই পলিটিক্যাল এমিসারি ততক্ষণে যুক্ত-ফ্রনটের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। ফ্রনটের নেতারা প্রথমেই কিন্তু আশু ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে ঠিক ভরসা পেলেন না। প্রথম প্রথম কথাটা চালালেন রবি চৌধুরী এবং রণধীর বর্মণের সঙ্গে।

ফ্রনটের নেতাদের মধ্যে এরা সর্বপ্রথম যোগাযোগ করেন অশোক ঘোষের সঙ্গে। ফরওয়ার্ড ব্লকের নানু ঘোষের সঙ্গে আশুবাবুর বহুদিন ধরেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

রবিবাবু এবং রণধীরবাবু অশোকবাবুর কাছে আশু ঘোষের হয়ে বললেন : কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের কথা ছিল ওরা বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করবে। এখন ডঃ ঘোষ ওদের সরকারে নিয়ে এসেছেন। ডঃ ঘোষ আমাদের সঙ্গে চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন। আমরা এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আর সবাইকে নিয়ে জাতীয় সরকার করতে চাই। আপনারা সমর্থন করুন।

অশোকবাবু জবাব দিলেন : ফরওয়ার্ড ব্লক একা কিছু করতে পারবে না। যা করার যুক্তফ্রনট করবে। ফ্রনটের অন্যান্য দলের কাছে আপনাদের বক্তব্য রাখতে পারি। তাঁরা আপনাদের সঙ্গে সরকার গঠনে রাজী হবে কিনা জানি না।[৭]

দুই এমিসারি অশোকবাবুর প্রস্তাবে রাজী হলেন।

অশোকবাবু তখন প্রথমেই বিশ্বনাথ মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আশুবাবুদের প্রস্তাবের কথা বিশ্বনাথবাবুকে জানালেন। বিশ্বনাথবাবুও ওদের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হলেন।

তাঁরা দুজনে মিলে জ্যোতিবাবুকে ব্যাপারটা জানালেন। তিনিও এব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন।

তখন একদিন আশু ঘোষের দুই প্রতিনিধির সঙ্গে বিশ্বনাথবাবু এবং অশোক-বাবু আলোচনায় বসলেন। আলোচনাটা হল জগদীশ সিংহের বাড়িতে। জগদীশ

---

৭ অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

সিংহ নিজেও বৈঠকে হাজির ছিলেন।

এই বৈঠকেই ফ্রনটের দুই নেতা কথা দিলেন যে আশুবাবুরা সরকার করবেন এবং যুক্তফ্রনট তাঁদের সমর্থন করবে। অবশ্য শর্ত সাপেক্ষ সমর্থন। পাঁচটি শর্ত। তার দুটি শর্ত হল : সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে এবং শ্রমিক-কৃষকের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে নতুন সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।[৮]

এর পর আশু ঘোষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটল ফ্রনটের নেতাদের। গঙ্গার পারে নানু ঘোষের সঙ্গে এলেন আশু ঘোষ। অন্যদিক থেকে এলেন অশোক ঘোষ। গোটা পরিকল্পনাটা নিয়ে সেই প্রথম ফ্রনটের নেতাদের সঙ্গে আশু ঘোষের সাক্ষাতে আলাপ। আশু ঘাষের বাড়িতে যেতে তখনও অশোক ঘোষ ভরসা পাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে কিন্তু বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনের দিনও ধার্য হয়ে গিয়েছে। রাজ্যপাল চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী বিধানমণ্ডলীর বৈঠক ডাকলেন। বাজেট অধিবেশন। স্বয়ং রাজ্যপালকেই আসতে হবে সেই অধিবেশন উদ্বোধন করতে।

বিধানসভার দিন ধার্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস পক্ষ থেকে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হল।

ওদিকে কিন্তু দিল্লি তখনও জানেন না স্পীকারের রুলিংয়ের নাগপাশ থেকে কী করে বেরিয়ে আসবেন। স্বরাষ্ট্র দফতর এবং আইন মন্ত্রকের পণ্ডিতরা নানা প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে আসার পথ বের করতে পারলেন না। স্পীকারকে ম্যানেজ করার ব্যাপারেও কিছুই করা গেল না।

আশু ঘোষের সঙ্গে কংগ্রেস ও পি. ডি. এফের বিরোধ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আশু ঘোষেরা দিল্লির দরবারে আপিল জানালেন। আপিল জানালেন প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতির কাছে।

কলকাতায়ও আশু ঘোষেরা প্রতিদিনই প্রকাশ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনা করে চললেন। সমালোচনা করলেন ডঃ ঘোষেরও।

তবু মিটমাটের নানা চেষ্টা হল। বহুভাবে আশু ঘোষের সঙ্গে রফা করার চেষ্টা করলেন নানা জন। একদিন গঙ্গার পারে বসে স্বয়ং প্রতাপবাবুও তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন।[৯] কিন্তু কিছুই হল না। আশু ঘোষ তখন উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছেন।

ডঃ ঘোষ আশু ঘোষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এক বিবৃতি দিলেন তেসরা। তিনি বললেন : আশু ঘোষের দুই দূত আমার কাছে এসে বলেছিলেন, ওকে মন্ত্রী করতে হবে। তাঁরা ওর মামলা তুলে নেওয়ার জন্যও আমার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। আমি তাতে রাজী হইনি।

ডঃ ঘোষ শুধু প্রকাশ্যে এই কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি প্রতাপ চন্দ্রকে

---

[৮] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

[৯] আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

ডেকে বললেন : প্রতাপ, তোমাদের পার্টির সদস্য এইভাবে প্রকাশ্যে তোমাদেরই দলের বিরুদ্ধাচরণ করবে আর তোমরা তাঁকে কিছুই বলবে না?[১০]

প্রতাপবাবু ফিরে এসেই অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি আশু ঘোষকে দল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ চার্জসিটও দেওয়া হল।[১১]

আশু ঘোষ তার জবাব দিলেন তিনদিন পরে। বললেন : শৃঙ্খলা ভঙ্গের মত কোনও কাজ করিনি। ডঃ ঘোষের সব অভিযোগও অসত্য।

ততক্ষণে কিন্তু আশুবাবুর দলের এগারজন এম. এল. এ দিল্লি পেঁাছে গিয়েছেন। উদ্দেশ্য, দিল্লির কর্তাদের কাছে সাক্ষাতে সব বলা।

ওরা ট্রেনে দিল্লি পেঁাছলেন ছয়ুই। আশুবাবু প্লেনে রাজধানী গেলেন পরদিন।

যাওয়ার আগে আশুবাবু ফ্রনটের চিফ হুইপ কমল গুহ এবং আরও কয়েকজনকে জানিয়ে গেলেন যে তাঁদের দলত্যাগ চূড়ান্ত। ফ্রনটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার তাঁরা করবেনই। মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁদের প্রার্থী শঙ্করদাস ব্যানার্জী।

ফ্রনটের পক্ষ থেকেও আশ্বাস দেওয়া হল : ঠিক আছে—আমাদের সমর্থনও পাকা। তখনও কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রনটের সামনে কিছু রাখা হয়নি এবং ফ্রনট সরকারীভাবে এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।

আশুবাবুরা দিল্লিতে পেঁাছেই নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সুরু করেছিলেন। প্রথম দিন তাঁরা কথা বললেন মোরারজী দেশাই এবং গুলজারিলাল নন্দর সঙ্গে।

তাঁদের দাবি তখন আর শুধু মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা দিল্লিতে পেঁাছেই ঘোষণা করলেন : আমরা পশ্চিমবঙ্গে অ্যাড হক কংগ্রেস চাই।

আশুবাবু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গেও কথা বললেন। কংগ্রেস সভাপতি তাঁদের অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। আশুবাবু বললেন : আমরা অ্যাড হক চাইই। আর একান্ত তা না হলে অতুল্য ঘোষকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে সরিয়ে দিতে হবে।[১২]

নিজলিঙ্গাপ্পা জবাব দিলেন : তা হয় না।

কোনও রফা হল না। আশু ঘোষ সদলবলে বিমান যোগে কলকাতা ফিরে এলেন। আসার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েট থেকে টেলিফোন করে আশু ঘোষ অ্যান্ড পার্টির জন্য প্লেনে কুড়িটি সিটের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

কলকাতা ফিরেই আশু ঘোষ রাজ্যপালকে সব জানালেন। তারপর গভীর রাত্রে যুক্তফ্রণ্টের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

ওদিকে চিফ সেক্রেটারি এম. এম. বসু তখন দিল্লিতে। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির

---

[১০] ৩-২-৬৭।

[১১] ৩-২-৬৭।

[১২] আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

শাসন প্রবর্তনের ব্যাপারে তখন তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

পরদিনই[১৩] আশু ঘোষ তাঁর নতুন দল প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম হল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট। সংক্ষেপে আই. এন. ডি. এফ। নেতা শংকরদাস ব্যানার্জী। সহকারী নেতা আশু ঘোষ।

বিকালে ষোলজন আই. এন. ডি. এফ-এর এম· এল· এ আশুবাবুর নেতৃত্বে রাজভবনে গিয়ে বলে এলেন : আমরা আর কংগ্রেস-পি· ডি· এফ কোয়ালিশনের সমর্থক নই। এইসঙ্গে আরও তিনজন এম. এল. এ-র চিঠি দেওয়া হল রাজ্য-পালকে। চিঠিতে একই কথা লেখা।

ফ্রনটের নেতারা শঙ্করদাস ব্যানার্জীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁর বাড়িতেও গেলেন। অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু, সবাই। সব কথাবার্তা পাকা হল। স্থির হল, কী কী শর্তে ফ্রনট আই. এন. ডি. এফ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাবে।

তারপরই নতুন দলের নেতা শঙ্করদাস ব্যানার্জী ঘোষণা করলেন : আমরা সরকার গঠন করার ক্ষমতা রাখি। যুক্তফ্রণ্টের সকলে, অর্থাৎ ১৩২ জন এম. এল. এ-ও আমাদের সমর্থন করছেন।[১৪]

তারপরই ধর্মবীর ডঃ ঘোষকে ডাকলেন। ডঃ ঘোষকে কিন্তু তিনি একবারও বললেন না : আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন, তাই পদত্যাগ করুন। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু বললেন : আপনি কি বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষায় সম্মত?

ডঃ ঘোষ বললেন : হ্যাঁ, দুদিন পরেই তো বিধানসভা বসছে।

আশু ঘোষ সমগ্র পরিস্থিতি জানালেন যুক্তফ্রণ্টের নেতাদের। বললেন, সব ব্যবস্থা পাকা—দিল্লি রাজী, রাজ্যপাল রাজী, এবার আমাদের সরকার হবেই। বিধানসভাটা বসলেই দেখা যাবে ওরা মাইনরিটি, আমরা অনেক বেশি। আপনারা বিধানসভাটা বসাতে রাজী হয়ে যান না![১৫]

কিন্তু তাতে কাজ হল না। সন্ধ্যায় ফ্রণ্ট সিদ্ধান্ত নিলেন : (১) কিছুতেই বিধানসভা বসতে দেব না। (২) ঘোষ মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করতে হবে। এবং, (৩) তারপর শংকরদাস ব্যানার্জী কোনও সরকার গঠন করতে চাইলে ফ্রণ্ট 'সাময়িক ব্যবস্থা' হিসাবে তাঁকে সমর্থন জানাবে।[১৬]

আই. এন. ডি. এফের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তগুলির কিছু ব্যাখ্যা চেয়ে ফ্রণ্টকে চিঠি দেওয়া হল।

তার জবাবে ফ্রণ্টের পক্ষে অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু শঙ্করদাস ব্যানার্জীকে লিখলেন : আমরা আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, স্পীকারের

---

[১৩] ১১-২-৬৮।

[১৪] আনন্দবাজার পত্রিকা ১২-২-৬৮।

[১৫] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ১৮-৫-৭০।

[১৬] লোকসেবক সংঘ আশু ঘোষের সমর্থন করার বিরোধিতা করে যুক্তফ্রণ্ট ত্যাগ করলেন।

রুলিংয়ের (যার সঙ্গে আমরা একমত) ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা এখনও চলছে। সুতরাং, আর একটি সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে স্পীকারের রুলিংকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এবং, এর জন্য যা কিছু করণীয় তা বিবেচনা করা উচিত। আমরা আশাকরি আপনি এব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেবেন এবং রাজ্যপালের সঙ্গে আপনার যদি সাক্ষাৎ হয় তাহলে রাজ্যপালের বক্তব্য আপনি আমাদের জানাবেন।[১৭]

তেরই অর্থাৎ বিধানসভা বসার ঠিক আগের দিন রাজ্যপাল অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা বললেন। শংকরদাস ব্যানার্জীকে লেখা ফ্রন্টের চিঠির কপিও তাঁরা রাজ্যপালের হাতে দিলেন।[১৮]

রাজ্যপাল বললেন : বিধানসভার কী হবে?

দুই নেতা একই জবাব দিলেন : দু ঘণ্টার জন্য হলেও রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করুন। অন্যথা আমরা বিধানসভা বসতে দেব না। আমরা সরকার গড়তে চাই না। শংকরবাবুকেই আমরা সমর্থন করি। তিনি সরকার করুন।[১৯]

এর পরই রাজ্যপাল শংকরদাস ব্যানার্জীকে ডেকে পাঠালেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা সেরেই শংকরবাবু অজয়বাবুকে চিঠি দিলেন : আপনাদের সকল শর্ত আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু স্পীকারের রুলিং সমর্থন করে যে কথা বলেছেন তা সমর্থন করতে পারছি না।[২০]

চৌদ্দই বিধানমণ্ডলী বসল।

চরম উত্তেজনা। স্পীকার কী করবেন? যুক্তফ্রণ্ট কী করবে? ধর্মবীর কী করবেন? পি. ডি. এফ-কংগ্রেস বা কী করবেন?

বছরের প্রথম অধিবেশন। তাই রাজ্যপালকে সে অধিবেশন উদ্বোধন করতেই হবে। ওদিকে যুক্তফ্রণ্টের সিদ্ধান্ত, তাঁরা অধিবেশন কিছুতেই হতে দেবেন না। যুক্ত অধিবেশনের সুরুতে স্পীকার বা চেয়ারম্যান কেউ সভার কর্তা নন। কারুরই কিছু করার নেই। বিধিমত তখন রাজ্যপালই সভার প্রধান।

সভা বসার আগে যুক্তফ্রণ্ট ঘোষণা করলেন, তাঁরা রাজ্যপালকে সভায় ঢুকতেই দেবেন না।

রাজ্যপাল এলেন। যুক্তফ্রণ্টের এম. এল. এ-রা তাঁকে বাধা দিলেন। সভাকক্ষের সামনের গেট অবরোধ করলেন। পাশ কাটিয়ে অন্য দরওয়াজা দিয়ে কংগ্রেসী এম. এল. এ-দের সাহায্যে ধর্মবীর সভাকক্ষে ঢুকলেন। কিন্তু মঞ্চ পর্যন্ত এগোতেই পারলেন না। ফ্রণ্টের এম. এল. এ-রা ছুটে গেলেন তাঁর দিকে।

---

[১৭] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩-২-৬৮।

[১৮] আশু ঘোষ বলেন: এই চিঠিতে দুই নেতাই লিখেছিলেন তাঁরা আই. এন. ডি. এফ-কে বিনাশর্তে সমর্থন করেন। ফ্রণ্টের নেতারা বলেন : কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। আশুবাবুর জবাব : সে চিঠির কপি আমার কাছে আছে।

[১৯] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪-২-৬৮।

[২০] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪-২-৬৮।

কংগ্রেসীরাও তাঁদের বাধা দিলেন। প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি হল। বিধানসভার ভেতরে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! ছুটাছুটি, ধস্তাধস্তি, ধাক্কাধাক্কি চলল গোটা সভাকক্ষের ভেতরে। তারই মধ্যে রাজ্যপাল একটা আসনের ওপর দাঁড়িয়ে কোনও রকমে ছাপা ভাষণের দু-এক লাইন পড়লেন। তারপরই আবার কংগ্রেস এম· এল· এ-দের প্রোটেকসনে পেছনের দরওয়াজা দিয়ে একরকম পালিয়ে গেলেন।

তারপর সুরু হল একেবারে দক্ষযজ্ঞ। বেশ একচোট হাতাহাতি। একজন যুক্তফ্রণ্ট সদস্য ডঃ ঘোষকে লক্ষ্য করে কুশন ছুঁড়ে মারলেন। আর একজন ছুঁড়লেন দোয়াত। আরও একজন ছুটে এসে মারলেন এক চড়। একেবারে হই-হই রই-রই ব্যাপার।

রাজ্যপাল চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আবার সভা বসল। স্পীকার এলেন! তখন হাউসের তিনিই কর্তা। তিনি আবার রুলিং দিলেন : ঘোষ সরকার অবৈধ, তাই এই অধিবেশনও অবৈধ।

সভার শেষে কংগ্রেস-পি. ডি. এফ পক্ষ দাবি করলেন, তাঁরা মেজরিটি। যাঁরা খাতায় সই করেছেন তাঁদের সংখ্যা দেখিয়ে বললেন, আমরাই জিতে গিয়েছি। ফ্রণ্ট ও আই. এন. ডি. এফ বললেন, বাজে কথা। অনেকে ভুলে খাতায় সই করেছেন। তাঁরা সরকারকে সমর্থন করেন না।

সেদিন ফ্রণ্টের এম. এল. এ-দের উপর নির্দেশ ছিল : কেউ সই করবেন না! আই. এন. ডি. এফের নেতা আশু ঘোষ জানিয়েছিলেন : তাঁর দলের কেউ বিধান-সভায়ই যাবেন না।

পরদিনই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিলেন : পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি-সভা ও বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হবে।[২১]

এদিকে কিন্তু তখনও রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা ভাবছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারলেই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বেঁচে যাবে!

নানাভাবে চেষ্টা চলল।

অতুল্যবাবু এবং শঙ্করদাস ব্যানার্জী বিধানবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিমল রায়ের বাড়িতে এক ডিনারে মিলিত হয়ে রফার একটা চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই হল না।

ডঃ ঘোষ, হুমায়ুন কবির এবং প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজ্যপাল তাঁদের বললেন : আমি কি করব। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন রয়েছে আশু ঘোষের পিছনে।[২২]

এসব পনেরোইর ঘটনা। ষোলই পি. ডি. এফ নেতারা জাহাঙ্গীর কবির ও তাঁর দলের পাঁচজন এম. এল. এ-র সঙ্গে একটা সমঝোতার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাও ব্যর্থ হল।

---

[২১] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৬-২-৬৮।

[২২] প্রতাপ চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

সতেরোই পি. ডি. এফের কয়েকজন মন্ত্রী গেলেন আশু ঘোষের কাছে। কংগ্রেসেরও কেউ কেউ। বহু আবেদন নিবেদন জানান হল। কিন্তু তবু কিছু হল না।

আশুবাবু তখনও প্রতিদিনই রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলছেন।

আঠারোই প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে খবর এল : মুখ্যমন্ত্রী, অতুল্যবাবু এবং প্রতাপবাবু দিল্লি আসুন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

প্রফুল্ল সেনের যাওয়ার কথা ছিল না। সবাই বললেন : আপনিও যান। প্রধানমন্ত্রীকে প্রফুল্লবাবু টেলিফোন করলেন এবং জবাব পেলেন : ওদের সঙ্গেই আসছেন? একা এলেই ভাল করতেন।[২৩]

উনিশে সবাই গিয়ে দিল্লি পেঁছিলেন। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলের সঙ্গেই কথা বললেন।

কলকাতার নেতারা পরিষ্কার বুঝলেন, ওঁরা সিদ্ধান্তটা আগেই নিয়ে রেখেছেন—পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনই হবে।

ওঁরা নিজেরাও বুঝেছিলেন, অবস্থা যা তাতে পশ্চিমবঙ্গে পি. ডি. এফ-কংগ্রেস সরকারকে বাঁচানো যাবে না। আশু ঘোষ তো ছিলেনই। ততদিনে গোবিন্দ দে-ও নতুন একটা ফ্রন্ট গড়ে তুলেছেন। তিনিও আর এক বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা। গোবিন্দবাবুও রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নেতারাও তাই সহজেই কেন্দ্রের নেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন।[২৪] সব ঠিক হয়ে গেল। বিশে সকালেই ডঃ ঘোষ কলকাতা ফিরে যাবেন এবং গিয়েই তিনি পদত্যাগ করবেন। তারপর রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবে।

সেইদিনই প্রায় মাঝরাত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি থেকে সিদ্ধার্থ রায়কে খবর পাঠানো হল : সবাইকে নিয়ে এখুনি চলে আসুন। সিদ্ধার্থবাবু তখন দিল্লিতেই ছিলেন।

সিদ্ধার্থবাবু খবর দিলেন অতুল্যবাবুর বাড়িতে। সেখানে ছিলেন প্রফুল্লবাবু, অতুল্যবাবু এবং প্রতাপবাবু। ডঃ ঘোষ ছিলেন আচার্য কৃপালনীর বাড়িতে। অতুল্যবাবুর বাড়ির খুব কাছেই।

ডঃ ঘোষকে ডাকতে গেলেন প্রতাপবাবু। কিন্তু তিনি তখন অঘোরে ঘুমচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি গেলেন তিনজন—অতুল্যবাবু, প্রতাপবাবু এবং সিদ্ধার্থবাবু। সেখানে তখন চবনও উপস্থিত।

---

[২৩] প্রফুল্ল সেন। সাক্ষাৎকার ২৭-৫-৭০।

[২৪] অতুল্য ঘোষ ও ডঃ চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০। অবশ্য এই ব্যাপারে অনেকে বলেন যে, প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের নেতারা পদত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। পরে যখন দেখলেন, দিল্লির সব কর্তাই এ ব্যাপারে একমত এবং পদত্যাগ না করলে বরখাস্ত হতে হবে, তখন তাঁরাও তাতে রাজী হয়ে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুজনেই তাঁদের বললেন : এখুনি ডঃ ঘোষকে পদত্যাগ করতে হবে। না হলে সরকারকে বরখাস্ত করা হবে।

শুনে তো তাঁরা থ। প্রধানমন্ত্রী বললেন : রাষ্ট্রপতি কালই কলকাতা যাবেন। তার আগে সব কাগজপত্র তাঁকে সই করতে হবে। তাই এখনই ডঃ ঘোষের পদত্যাগ-পত্র চাই।

অতুল্য ঘোষ খুব জোরে বাধা দিলেন। তিনি বললেন : এইভাবে যদি আপনারা একটা রাজ্য সরকার এবং একজন প্রবীণ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করেন তাহলে আমি প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হব। আমি এই রাত্রেই সব কাগজের অফিসে অফিসে গিয়ে সব ঘটনা বলে আসব।

প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন মত পালটালেন। বললেন : আচ্ছা ঠিক আছে। ডঃ ঘোষ কলকাতা গিয়ে পদত্যাগ করবেন। তারপর রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করা হবে।[২৫]

তবু বিশে সকালেও কিছু লোক শেষ রফার চেষ্টা করলেন। তাঁদের তখনও ধারণা, সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারলেই সরকারকে বাঁচানো যাবে!

কিন্তু আশু ঘোষ কিছুতেই রাজী হলেন না। যাঁরা অনুরোধ জানাতে গেলেন তাঁদের সবাইকে বললেন : আমি শেষ দেখতে চাই।

শেষ মুহূর্তে একটা নতুন চেষ্টা করলেন গোবিন্দ দে-ও। তিনি এবং আশু ঘোষ গেলেন রাজ্যপালের কাছে। বললেন : আমরা ডঃ ঘোষকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস ও আই. এন. ডি. এফের সদস্যরা বিকল্প সরকার করব। আপনি সময় দিন।

রাজ্যপাল জবাব দিলেন : টু লেট। একটু পরেই রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষিত হবে।[২৬]

পি. ডি. এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক বসল বারটায়। ডঃ ঘোষ সব কথা মন্ত্রীদের জানালেন। একে একে সবাই বিরস বদনে মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সর্বশেষ বের হলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সোজা চলে গেলেন রাজভবনে। পদত্যাগপত্রখানা ধর্মবীরের হাতে দিলেন।

ধর্মবীর মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথমেই বললেন : আই এম সরি, ডঃ ঘোষ।

সুরু হল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রাষ্ট্রপতির শাসন।

---

[২৫] প্রতাপ চন্দ্র। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

[২৬] আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

দুটো প্রশ্ন

এই পর্বের দুটো প্রশ্ন নিয়ে আজও রাজনৈতিক মহলে তর্ক বিতর্ক শুনি। একটা প্রশ্ন : অজয়বাবু ২রা অক্টোবর কেন পিছিয়ে গিয়েছিলেন? আর একটা প্রশ্ন : ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতনের আসল কারণ কি?

প্রথম প্রশ্নে প্রথমে আসা যাক—অজয়বাবু ২রা অক্টোবর পিছিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

এ সম্পর্কে খুব চলতি ধারণা যেটা তা হল, অ্যাড হক কমিটি হল না বলেই অজয়বাবু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিলেন। অজয়বাবু নিজেও তাই বলেন। এইসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের নেতারাও তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব না ছেড়ে দেন। "জ্যোতিবাবুও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিন মাসের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই আর পদত্যাগ করলাম না।"

ধর্মবীরকেও আমি এই প্রশ্নটা একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও বলেছিলেন : অ্যাড হক কমিটি হল না বলেই অজয়বাবু পদত্যাগ করলেন না।

একই কথা বলেন অজয়বাবুর ছোট ভাই এবং সি. পি. আই নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জী : অ্যাড হক কমিটি হল না বলেই ছোড়দা পিছিয়ে গেলেন।

নব কংগ্রেসের অশোক সেনেরও তাই ধারণা। তিনি বলেন : ধূর্ত কামরাজ তাঁর দলের লোক অতুল্যবাবুর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে বাঙলা দেশের এই সর্বনাশটা করেছেন। তিনি সময়মত অ্যাড হক কমিটি করলেন না। তাই অজয়বাবু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন।

সি. পি. এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তর ধারণাটা একটু অন্যরকমের। তাঁর বক্তব্য : অজয়বাবু যখন বুঝলেন কংগ্রেসের অতুল্য ঘোষপন্থী এম. এল. এ-রা এবং বাংলা কংগ্রেসের কবির গোষ্ঠীর এম. এল. এ-রা কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যাবেন না তখনই তিনি পিছিয়ে গেলেন। কারণ, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে আবার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। কংগ্রেসের প্রফুল্ল সেনপন্থী এম. এল. এ এবং নিজের কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে ১৪১ হত না।

প্রফুল্ল সেন কিন্তু একেবারে অন্য কথা বলেন। তাঁর যুক্তি : যদি অ্যাড হক হতে দেরি হওয়ার জন্যই অজয়বাবু পিছিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি ২রা অক্টোবর পর্যন্ত এগিয়ে তারপর ব্যাক করবেন কেন? নন্দজী কলকাতায় অ্যাড হকের কথা ঘোষণা করেন ২৪শে সেপ্টেম্বর। পরদিন দিল্লিতে গিয়ে তাঁর অ্যাড হক কমিটির নামগুলি ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তা করতে পারলেন

না। কারণ, কামরাম মাদ্রাজ থেকে টেলিফোনে সাদিক আলিকে নাম ঘোষণা বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন। এই খবর সব কাগজে বের হল ২৬শে। অ্যাড হকের জন্যই যদি তিনি পিছবেন তাহলে তো তাঁর তখনই পিছনো উচিত ছিল। ২রা পর্যন্ত এগিয়ে, এতসব ব্যবস্থা করে তারপর পিছবেন কেন?

কেন অজয়বাবু পিছলেন তা অবশ্য প্রফুল্ল সেন বলতে পারেননি। তাঁরও প্রশ্ন : অজয়বাবু হঠাৎ ওভাবে পিছলেন কেন? সকাল এগারোটা পর্যন্ত যিনি বিজয় সিং নাহারকে বললেন, "সব ঠিক আছে", তিনি কেন ঘণ্টা তিন-চার পরে পিছিয়ে গেলেন?

স্রেফ অ্যাড হক ঘোষণার দেরি হয়েছিল বলেই অজয়বাবু পিছিয়ে গিয়েছিলেন, একথা আমিও বিশ্বাস করি না। আমি এব্যাপারে প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে একমত যে, তাহলে তাঁর ২৬শে সেপ্টেম্বরই পিছনো উচিত ছিল। কিন্তু তা তিনি করেননি। অজয়বাবু নিজে তারপরও সব ব্যবস্থা করেছেন। অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দলের লোকেদের সব জানিয়েছেন। নিশীথ কুণ্ডু, হেমন্ত বসু প্রভৃতিদেরও তাঁর পরিকল্পনা বলেছেন। ২রা এগারোটায় বিজয় নাহারকে যে শুধু বলেছেন তা নয়, তারপর তিনি রাইটার্স বিল্ডিংসে চিফ সেক্রেটারি এবং হোম সেক্রেটারির কাছেও খবর নিয়েছেন সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা।

বরং, অ্যাড হক পরিস্থিতি তখন তাঁর বিচারে ভালই। কারণ, তখন তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জেনে এসেছেন অ্যাড হক হবেই। ২৯শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে কামরাজের সামনে বসে নন্দও ঘোষণা করেছেন অ্যাড হক হবেই।

সুতরাং, শুধু অ্যাড হক হল না বলেই পিছোলে অজয়বাবু নিশ্চয়ই ২রা অক্টোবর পর্যন্ত এগিয়ে তারপর পিছতেন না। আগেই তা করতেন।

তাহলে কি প্রমোদবাবু যা বলেছেন সেইটাই সত্য? অর্থাৎ কবিরপন্থী এম. এল. এ-রা এবং অতুল্যপন্থী এম. এল. এ-রা তাঁকে সমর্থন করবেন না এই ভয়েই অজয়বাবু পিছিয়ে গেলেন?

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই অনুমানটাকেও গ্রহণ করা যায় না।

প্রথম কথা, অতুল্যবাবু যে অ্যাড হক বিরোধী এটা তো ২৪শে সেপ্টেম্বরই জানা গিয়েছিল। সুতরাং, অতুল্যবাবুর ভাইরা তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে স্বীকার করতে রাজী না হতে পারেন, এ ভয়টা হঠাৎ ২রা অক্টোবর দুপুরে অজয়বাবুর মনে জাগবে কেন? জাগলে কি আগেই জাগা উচিত ছিল না?

দ্বিতীয়ত, অতুল্যবাবুর সমর্থক এম. এল. এ-রা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন এমন কোনও ইংগিতও ২রা অক্টোবর পর্যন্ত কেউ দেননি। অজয়বাবুকে নিঃশর্ত সমর্থন জানাবার জন্য ২রা অক্টোবর কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল তাতে অতুল্যবাবুর ভাইরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউ সেখানে একবারও বলেছেন বলে শোনা যায়নি যে, আমরা অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে অরাজী।

এবার আসা যাক কবির গোষ্ঠীর প্রশ্নে। হুমায়ুন কবিরের সমর্থক এম. এল. এ-রা তাঁর সঙ্গে নাও যেতে পারেন, এমন ভয় অজয়বাবু একবারও পেয়েছেন বলে মনে হয় না। অন্তত কোথাও তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরং, যেসব ঘটনা জানা গিয়েছে, তাতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, অজয়বাবু বরাবর তাঁদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

তিনি তাঁদের সমর্থন সম্পর্কে এত বেশি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, কাউকে কিছু জানাবার প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করেননি। এমন কি হুমায়ুন কবির, জাহাঙ্গীর কবিরকেও না। ২৮শে সেপ্টেম্বর অজয়বাবু দিল্লি থেকে কলকাতা ফেরার সময় হুমায়ুন কবিরও তাঁর সঙ্গে একই প্লেনে এবং বাড়িতে আসেন। অজয়বাবু দিল্লির বাড়ি থেকেও কবিরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। কলকাতায়ও দমদম থেকে নিজের গাড়ি করে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হস্টেলে পৌঁছে দেন। আগের দিন রাত্রে তাঁরা দিল্লিতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করেন। কিন্তু এর মধ্যে অজয়বাবু কবিরকে একবারও তাঁর এত বড় সিদ্ধান্তের কথা বলেননি। নিশ্চয়ই তিনি ধরে নিয়েছিলেন, হুমায়ুন কবির ও তাঁর সমর্থকরা এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করবেনই।

জাহাঙ্গীর কবির সম্পর্কে অজয়বাবুর একই মনোভাব ছিল। তিনি সুশীল ধাড়াকে বলে রেখেছিলেন, যেন জাহাঙ্গীর কবিরকে ২রা অক্টোবর রাত আটটার সময় রাজভবনে উপস্থিত থাকতে বলে রাখা হয়। অজয়বাবু তাঁর সম্পর্কে এতই নিশ্চিত ছিলেন যে, ধরে নিয়েছিলেন ২রা রাজভবনে হাজির হয়ে জাহাঙ্গীর কবির সানন্দে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে শপথ নেবেন।

সুতরাং, অতুল্যবাবুর ভাইদের সমর্থন পাবেন না ভেবে বা কবিরপন্থীদের ভয়ে অজয়বাবু শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গিয়েছিলেন এটা ধরে নেওয়া কঠিন।

তাহলে অজয়বাবু পিছিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, আমি এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর এখনও বের করতে পারিনি।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ২রা অক্টোবর বেলা বারোটা পর্যন্ত অজয়বাবু পদত্যাগের সংকল্পে অটল ছিলেন। পদত্যাগ করবেন না, এ সিদ্ধান্তটা তিনি নিয়েছিলেন তারপর। বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে যে কোনও সময়। এই সময় অজয়বাবুর সঙ্গে ছিলেন সতীশ সামন্ত এবং বিশ্বনাথ মুখার্জী। একমাত্র তাঁরাই সত্যি কাহিনী বলতে পারেন।

সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের আগমনের আগেই যে অজয়বাবু পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছিলেন তারও প্রমাণ আছে। তাঁরা বেলভেডিয়ারে পৌঁছবার আগেই অজয়বাবু বিষ্ণু বাগচিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বিষ্ণুবাবু তখন পশ্চিমবঙ্গের ডি. আই. জি. আই. বি। হাঙ্গামার আশঙ্কায় যাঁদের গ্রেফতার করার কথা ছিল, বিষ্ণুবাবু তাঁদের নামের লিস্টি অজয়বাবুকে দিয়ে সই করাতে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন: না, আজ থাক। তখনও হেমন্ত বসুর নেতৃত্বে সি. পি. আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা বেলভেডিয়ারে পৌঁছননি।

আর একটা কথা শোনা গিয়েছিল তখন। অজয়বাবুর বৌদির কথা। শোনা গিয়েছিল, বৌদিও তাঁকে বারণ করেছিলেন পদত্যাগ করতে। কিন্তু বিশ্বনাথবাবু

এবং সুকুমার রায় দুজনেই বলেন, ২রা সকালের আগে পর্যন্ত বৌদি এব্যাপারে কিছু জানতেনই না। বৌদি আগে কিছুই জানতেন না এটা বিশ্বাস করা অবশ্য কঠিন। বিশ্বনাথবাবু আরও বলেন : বৌদির ব্যাপারটা তোমাদের বানানো গল্প।

আসল কাহিনীটা কী তা অবশ্য বিশ্বনাথবাবু জানাননি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতনের আসল কারণ কী?

এ ব্যাপারেও খুব চলতি একটা ধারণা আছে। সে ধারণাটা হল, মন্ত্রী হওয়া নিয়ে কংগ্রেসে আত্মকলহ দেখা দেওয়ায় এবং তারই পরিণতি হিসাবে আশু ঘোষরা দলত্যাগ করায় ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে।

বামপন্থী নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বলেন, তাঁদের আন্দোলনের ফলেই ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই ফ্রন্ট আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করেন। প্রতিদিনই তাঁরা এক বা একাধিক নেতার নেতৃত্বে কিছু কিছু লোক পাঠাতেন গ্রেফতারী বরণ করতে।

আমি এর একটাকেও ঘোষ মন্ত্রিসভার পতনের আসল কারণ বলে মনে করি না। বিভিন্ন সূত্রের বিভিন্ন সংবাদ পর্যালোচনা করে আমার বদ্ধমূল ধারণা, এর আসল কারণ স্পীকারের রুলিং। সেই রুলিং থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ না পেয়েই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সাহায্যে ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছিলেন।

চলতি ধারণার ব্যাপারটায় আগে আসা যাক।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, মন্ত্রী হওয়া নিয়ে তখন কংগ্রেস এবং পি. ডি. এফ দু দলেই বেশ একটা রেষারেষি সৃষ্টি হয়েছিল। এ জিনিসটা শুধু যে আশু ঘোষের গোষ্ঠীতে দেখা দিয়েছিল তাই নয়, দেখা দিয়েছিল অন্যান্য আরও অনেকের মধ্যেই। সবাই মনে করছিলেন, মন্ত্রী হওয়ার একটা বিরাট সুযোগ চলে যাচ্ছে। এই সুযোগ হারালে আর হয়ত জীবনে মন্ত্রী হতে পারবেন না। তাই বিভিন্নভাবে নানাজন চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু মন্ত্রী হতে পারলেন না বলে তাঁরা সবাই কি ডঃ ঘোষের সরকারের পতন ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন? নিশ্চয়ই না। তাহলে আশু ঘোষের সঙ্গে অন্তত চার-পাঁচ ডজন কংগ্রেসী ও পি. ডি. এফ এম. এল. এ সামিল হতেন। কিন্তু তা হননি। কারণ, তাঁরা জানতেন ডঃ ঘোষের সরকারের পতন ঘটলে হয় আবার যুক্তফ্রন্ট রাজত্ব কায়েম হবে; না হয় পরিণতি রাষ্ট্রপতির শাসন ও অন্তর্বর্তী নির্বাচন। এই দুটো বস্তুকেই কংগ্রেস ও পি. ডি. এফ এম. এল. এ-রা ভীষণ ভয় করতেন। যুক্তফ্রন্টকেও এবং নির্বাচনকেও। তাই মন্ত্রী না হতে পারার জন্য চরম বিক্ষুব্ধ হয়েও তাঁরা এই দুই ভয়েই মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে যাননি।

গিয়েছিলেন কারা? আশু ঘোষ ও তাঁর দলবল।

যে আশু ঘোষ এত ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের এম. এল. এ ভাঙালেন, ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার জন্য মাসের পর মাস চেষ্টা করলেন, সেই আশু

ঘোষই আবার কেন ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে গেলেন? তিনিই কেন যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিকল্প সরকার গঠনে উদ্যোগী হলেন?

হয়ত বলবেন, মন্ত্রী না হতে পারার ক্ষোভে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা না তুলে নেওয়ার রাগেই আশু ঘোষ এইসব কাজ করেছিলেন। এই রকম একটা কথা সেই সময়ই ডঃ ঘোষ বলেছিলেন।

ধরেই না-হয় নিলাম আশু ঘোষ রাগে এবং ক্ষোভে এইসব কাজ করেছিলেন। যে লোক মাসের পর মাস এত ঝুঁকি নিয়ে এতভাবে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের চেষ্টা করেছিলেন, ধরেই না-হয় নিলাম তিনি শুধু ব্যক্তিগত আক্রোশে আবার সেই ফ্রন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।

কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে তিনি শেষ পর্যন্ত এগোলেন না কেন? আশু ঘোষ তাহলে ব্যক্তিগত আক্রোশেই যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভা করতে এগোলেন না কেন? ফ্রন্ট ও আশু ঘোষ একযোগে নিশ্চয়ই ১৪১ হতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আশু ঘোষেরা তাতে উৎসাহী নন। দ্বিতীয়বার বিধানসভায় স্পীকার একই রুলিং দেওয়ার পরই যেন আশু ঘোষের যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে সব উৎসাহ মিটে গেল।

১৪ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়বার বিধানসভা বসে। তার আগের দিনই অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর রাজ্যপাল আশু ঘোষদের দলের আনুষ্ঠানিক নেতা শঙ্করদাস ব্যানার্জীকে ডেকে পাঠান। এবং, রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলার পরই শঙ্কর ব্যানার্জী আই. এন. ডি. এফ দলের নেতা হিসাবে অজয়বাবুকে লিখলেন : আপনাদের সকল শর্ত আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু স্পীকারের রুলিং সমর্থন করে যে কথা বলছেন তা সমর্থন করতে পারছি না।

প্রধানত এই চিঠির ভিত্তিতেই রাজ্যপাল কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন যে, আই. এন. ডি. এফ ও যুক্তফ্রণ্টে পুরোপুরি সমঝোতা হয়নি। তাই ওঁদের সরকার গঠনের প্রশ্নও ওঠে না।

রাজ্যপালের রিপোর্টের এই অংশটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি তার সবটা এখানে তুলে দিচ্ছি : শ্রীঅজয় মুখার্জী এবং শ্রীজ্যোতি বসু ১৩ই ফেব্রুয়ারি আমার সঙ্গে দেখা করে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জীকে লেখা তাঁদের চিঠির একটি কপি আমাকে দেন। চিঠিতে কয়েকটি শর্তে নবগঠিত দলটিকে যুক্তফ্রন্ট সমর্থন করবে বলে জানানো হয়েছে। তাঁরা আমাকে বলেন, কংগ্রেস-পি. ডি. এফ কোয়ালিশন গরিষ্ঠতা হারিয়েছে। সুতরাং এই মন্ত্রিসভা খারিজ করে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জীকে আমন্ত্রণ জানানো হোক। আমি ওঁদের বলি, ১৪ ফেব্রুয়ারি বিধানসভার অধিবেশন বসছে। বিধানসভাতেই দলীয় শক্তি যাচাই হতে পারে। কিন্তু ওঁরা কিছুতেই বিধানসভা বসতে দিতে রাজী নন।...আমি ওঁদের বলি, ওঁদের শর্তাবলীতে রাজী কিনা সে সম্পর্কে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী আমাকে কিছু বলেননি। বস্তুত শর্তাবলীর একটি তিনি মানতে রাজী নন বলে বিবৃতি দিয়েছেন। ফলে, যুক্তফ্রন্ট-আই. এন. ডি. এফ সহযোগিতার প্রশ্নটির সুরাহা এখনও হয়নি।

যাঁরা যুক্তফ্রণ্টের সকল শর্ত মেনে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে এগোতে পারেন, তাঁরা যদি সত্যিই গদীর লোভে তা করে থাকবেন, তাহলে কি স্পীকারের রুলিং-এর ফ্যাঁকড়াটা না তোলাই স্বাভাবিক ছিল না? কিন্তু শঙ্করদাস ব্যানার্জী তা তুললেন এবং আরও লক্ষণীয়, রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলার পরই অজয়বাবুকে চিঠি দিলেন যে, স্পীকারের রুলিং-এর ব্যাপারটা আমরা মানতে পারছি না। যদি কোনও কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের লোভে যুক্তফ্রণ্টের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন, তাহলে তাঁরা কি শুধু স্পীকারের রুলিং-এর মত একটা বিষয় তুলে মন্ত্রী হওয়ার সব সুযোগ নষ্ট করবেন?

আসলে এই গোটা ব্যাপারটাই ছিল যুক্তফ্রণ্টের উদ্দেশ্যে একটা বড় টোপ--গিললে ভাল, না গিললেও কাজে লাগবে। যুক্তফ্রণ্ট যদি এই টোপ গিলে বিধান-সভা বসাতে রাজী হয়ে যেতেন, তাহলে স্পীকারের রুলিং থেকে বেরিয়ে আসার সুন্দর পথ পাওয়া যেত। যখন তাঁরা তা গিললেন না তখন খুব সহজেই দেখানো গেল ডঃ ঘোষের সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন। তাই সে সরকারের অপমৃত্যু ঘটল। স্পীকারের রুলিং-এর জন্য রাজ্যপাল ডঃ ঘোষ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হচ্ছেন এটা আর ধরাই পড়ল না।

রুলিং পাল্টাবার জন্য যে বিজয় ব্যানার্জীকে নানাভাবে অনুরোধ উপরোধ জানান হয়েছিল এটা সবাই জানেন। স্বয়ং আশু ঘোষও স্বীকার করেছেন সে চেষ্টা তিনি করেছিলেন। বিজয় ব্যানার্জী যখন সে প্রস্তাবে রাজী হলেন না তখন চেষ্টা করা হল যাতে তিনি পরবর্তী বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিন অনুপস্থিত থাকেন এবং যাতে ডেপুটি স্পীকার হরিদাস মিত্রকে দিয়ে কার্যোদ্ধার করা যায়। আশুবাবুও এ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এতেও ফল হল না। কারণ, বিজয়বাবু হাউসে অনুপস্থিত থাকতেও রাজী হলেন না। তখন সুরু হল নতুন প্রচেষ্টা—যুক্তফ্রণ্টকে টোপ গিলোবার এক মাষ্টার প্ল্যান।

একটা জিনিস এখানে বলে রাখা ভাল—বহু চেষ্টা করেও দিল্লি এবং কলকাতার কংগ্রেসী ও সরকারী আইনবিশারদরা স্পীকারের রুলিং-এর বিরুদ্ধে কোনও আইনগত পন্থা বের করতে পারেননি। পারেননি কারণ, কোনও ব্যবস্থা বের করা সম্ভব ছিল না। আমাদের সংবিধান স্পীকারকে অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছে। বিধানসভা বা লোকসভায় স্পীকারই সর্বেসর্বা। তাঁর কোনও রুলিং-এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যায় না। স্পীকার হিসাবে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে দেশের কোনও কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিছু বলতে পারেন না। একমাত্র বিধানসভা সদস্যরা ছাড়া কেউ তাঁকে পদচ্যুতও করতে পারেন না। তিনি কোনও অন্যায় করেছেন মনে করলে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে পদ-চ্যুত করা যায় বটে। কিন্তু সেজন্যও তাঁর সম্মতি প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নিয়ম অনুসারে সেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে কবে আলোচনা হবে তাও স্থির করে দেবেন স্বয়ং স্পীকার। সুতরাং, স্পীকারকে পদচ্যুত করতে হলেও তাঁরই সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন!

বিজয় ব্যানার্জীর রুলিং ঘোষ মন্ত্রিসভাকে অচল করে দিয়েছিল। সংবিধান

ও রুলস অফ বিজনেস ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারকেও স্পীকার অচল করে দিতে পারেন। বাজেটের মুখে স্পীকার বার বার বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রেখে যে কোনও মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে পারেন। কারণ, বাজেট বিধানসভায় পাশ করাতেই হবে এবং বিধানসভা বসতে না পারলে বাজেট পাশ করানো সম্ভব নয়। পার্লামেন্টারি রীতিনীতির সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মে সাহেব বলেন, স্পীকার শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই রুলিং দিতে পারেন। স্পীকার যদি বলেন, গণ্ডগোলের আশংকায় আমি হাউস বন্ধ করে দিচ্ছি, তাহলে কেউ তাঁকে কিছু করতে পারেন না। হাউস বসানোও কারু পক্ষে সম্ভব নয়।

দিল্লি ও কলকাতার পণ্ডিতরা যখন এই জিনিসটা বুঝলেন তখনই দিল্লি এবং রাজভবন ভিন্ন পথ নিলেন। স্পীকারকে ম্যানেজ করার নানা চেষ্টা হল। তাতেও কিছু হল না দেখে যুক্তফ্রণ্টের সামনে টোপ ফেলা হল, যদি তাঁরা বিধানসভা বসাতে রাজী হয়ে যান, যদি তারপর স্পীকার রুলিং পাল্টাতে সম্মত হন। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট সে টোপ কিছুতেই গিললেন না।

তাই ধর্মবীর তাঁর রিপোর্টে ১৫ই ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন : স্পীকারের রুলিং বিধানসভা তথা সমগ্র সাংবিধানিক কার্যক্রমকেই অচল করে দিয়েছে।...বিধানসভা ছাড়া সংবিধান চলতে পারে না। কিন্তু বেশ দেখা গেল বর্তমান স্পীকার যতদিন তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অচল থাকবেন ততদিন বিধানসভার অধিবেশন ডাকাই অসম্ভব।...ভবিষ্যতে যাতে কোনও স্পীকার এই-রকম কাজ করতে না পারেন, সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নটি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে ধর্মবীর একবার সখেদে প্রাক্তন মন্ত্রী গঙ্গাধর প্রামাণিককে বলেছিলেন : আমি কেন্দ্রের নির্দেশেই যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙ্গেছিলাম। এর ফলে যেসব ঝামেলা দেখা দিল সেগুলি সামলাবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই কেন্দ্রেরই ছিল। আমি একবারও ভাবতে পারিনি যে, স্পীকার এরকম একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি করে দিতে পারেন, তা অনুমান না করেই এবং তা থেকে বের হওয়ার পথ না ভেবেই ওঁরা আমাকে সরকার ডিসমিস করতে বলেছেন। স্পীকার যে বিধানসভাকে চলতেই দেবেন না এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে ওঁরা কিছু করতেই পারবেন না তা বুঝলে আমি আরও কয়েকটা দিন দেরি করে স্বাভাবিক ভাবেই সব ব্যবস্থা নিতাম।[১]

ধর্মবীরের সব অপারেশনেই প্রধান সহায় ছিলেন আশু ঘোষ। যুক্তফ্রণ্টকে বিধানসভা বসাতে রাজী করাবার ব্যাপারটাও তিনি প্রধানত আশু ঘোষের সহায়তায় করতে চেয়েছিলেন। ডঃ ঘোষ মন্ত্রিসভার পতনও বাহ্যত আশু ঘোষই

---

১ গঙ্গাধর প্রামাণিক। সাক্ষাৎকার ২-৬-৭০।

ঘটিয়েছিলেন। যুক্তফ্রন্ট থেকে এম. এল. এ ভাঙগানোর কাজেও আশু ঘোষই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। আশু ঘোষ জ্ঞানত ধর্মবীরের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিলেন কিনা জানি না। তবে, তিনি নিজে বলেন যে, সব কাজ তিনি নিজ উদ্যোগে এবং অর্থে করেছিলেন। তাঁর নিজের হিসাবে, এই সব কিছুর জন্য তাঁর দশ লক্ষ টাকা খরচা হয়েছিল!

তবে, আশু ঘোষ নিজেই এমন একটা ঘটনা বলেন, যা থেকে অনেক কিছু সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আশুবাবু বলেন : ১৪ই জানুয়ারী রাত সাড়ে আটটায় ধর্মবীর আমাকে ডেকে বললেন, ক'জন মন্ত্রী হচ্ছে, ক'টা চেয়ার সাজাতে বলব। আমি বললাম, আমি কিছু জানি না। উনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি, তুমি জান না! তুমি কিং-মেকার, তুমি কিছু জান না, কি ব্যাপার?...ধর্মবীর চিফ সেক্রেটারিকে ফোন করে জেনে নিলেন কোন্ কোন্ ছ' জন মন্ত্রী হচ্ছেন।...রাত পৌনে দশটায় রাজভবন থেকে বেরিয়ে এলাম।[২]

তার পরদিনই দেখা গেল দিল্লির হিন্দুস্থান টাইমসে বিরাট খবর : আশু ঘোষের নেতৃত্বে অন্তত ৩০ জন এম. এল. এ কংগ্রেস-পি. ডি. এফ কোয়ালিশন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। আশু ঘোষ বলেন, তিনি নিজেই এখবর হিন্দুস্থান টাইমসের সংবাদদাতাকে দিয়েছিলেন।

প্রথম প্রশ্ন, ক'জন মন্ত্রী হচ্ছেন বা কে কে মন্ত্রী হচ্ছেন, এ খবর তো রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই পেয়ে গিয়েছিলেন। ক'টা চেয়ার সাজাতে হবে সেইটে জানার জন্যই কি ধর্মবীরের আশু ঘোষকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে আশু ঘোষ যুক্তফ্রন্টের পতনে, পি. ডি. এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন গঠনে এত উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন তিনি যেই শুনলেন, তাঁকে না জানিয়ে ছ'জন কংগ্রেসী মন্ত্রী হচ্ছেন, অমনি খবরের কাগজের লোক ডেকে বলে দিলেন, আমি ও আমার সমর্থকরা এ মন্ত্রিসভার পেছন থেকে সমর্থন তুলে নেব? এবং, তাও কলকাতার কোনও কাগজ নয়, শুধু দিল্লির একটা বিশেষ কাগজকে?

ব্যাপারটা কি এতই সহজ ও সরল? ধর্মবীরের সঙ্গে আশু ঘোষের ঘনিষ্ঠতা এবং যোগাযোগ সর্বজনবিদিত ছিল। ডঃ ঘোষের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আশুবাবু প্রকাশ্যে ধর্মবীরকে বলেছিলেন : স্যার, মাই টাসক্ ইজ ওভার।

সেই আশু ঘোষ ধর্মবীরের এত সাধের মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে উদ্যত হলেন, কিন্তু ধর্মবীর তাঁকে নিবৃত্ত করার কোনও চেষ্টা না করে বরং উস্কে দিলেন—এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি?

আসলে ধর্মবীর আশু ঘোষের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের জন্য টোপ ফেলেছিলেন। ব্যাপারটা আশু ঘোষ নিজে জানতেন কি জানতেন না, তা অন্য ব্যাপার।

ধর্মবীরের টোপটা ছিল এইরকম : এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি কর যাতে যুক্তফ্রন্টের নেতারা প্রলুব্ধ হন। যেন তাঁরা মনে করেন, বিধানসভা বসলেই ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে এবং তাঁদের সমর্থনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল

[২] আশু ঘোষ। সাক্ষাৎকার ৬-৬-৭০।

একটা সরকার হবে। তাহলে তাঁরা বিধানসভা বসাতে রাজী হয়ে যেতে পারেন এবং ফলে স্পীকারও তাঁর রুলিং পালটাতে রাজী হতে পারেন।

এই জন্যই দেখা যায় বিধানসভা বসার দিন অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারি যত এগিয়ে এল আশু ঘোষের তৎপরতা ততই বাড়ল। অশোক ঘোষ বলেন : আশু ঘোষরা চূড়ান্ত মুহূর্তে দু-একবার বলেছিলেন, বিধানসভাটা হোক না, ভোটে তো ওরা হেরে যাবেই। শোনা যায় ফ্রন্টের দু' একজন নেতা সে টোপ প্রায় গিলেও ফেলে-ছিলেন। কিন্তু কয়েকজন তাতে কিছুতেই রাজী হলেন না। বুদ্ধিমান সোমনাথ লাহিড়ি প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলেন, ধর্মবীর আশু ঘোষের মাধ্যমে টোপ ফেলেছেন। তাই তিনি বারংবার ফ্রন্ট নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিধানসভা বসাবার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মতি দেননি।

ধর্মবীর চূড়ান্ত চেষ্টা করলেন ১৩ই। তাঁর আশা ছিল, শঙ্করদাস ব্যানার্জীর চিঠি পাওয়ার পর হয়ত শেষ মুহূর্তে যুক্তফ্রন্ট বিধানসভা বসাতে রাজী হয়ে যাবে। ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার এবং সরকার প্রতিষ্ঠার এমন সুযোগ তাঁরা ছাড়বেন না। কিন্তু তিনি এটা জানতেন না যে, ফ্রন্টের অধিকাংশ নেতাও তখন বুঝে গিয়েছেন যে, স্পীকারের রুলিং থেকে ঘোষ মন্ত্রিসভাকে বাঁচাবার কোনও পথ নেই। বাজেট পাশ না করাতে পারলে সরকার থাকে না এবং বিধানসভা না বসলে বাজেট পাশ করা চলে না। সুতরাং যুক্তফ্রন্ট কিছুতেই রাজ্যপালের টোপ গিললেন না। তাঁরা জানতেন, ঘোষ-মন্ত্রিসভা বিদায় নিতে বাধ্য। যে করেই হোক। তারপর যেদিনই হোক কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করতেই হবে।

কিন্তু ধর্মবীরের পক্ষে এর পরের ব্যবস্থার জন্যও আশু ঘোষকে প্রয়োজন ছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ঘোষ-মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা ছাড়া রাজ্যপালের কোনও উপায়ই ছিল না। যদি আশু ঘোষেরা এইভাবে না সরকারকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত করতেন তাহলে রাজ্যপালকে এবং দিল্লিকে প্রকাশ্যে বলতে হত, স্পীকারের রুলিং-এর ফলে আমরা মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এভাবে প্রকাশ্যে মুখে চুনকালি মাখাতে হল না। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার জন্য ডঃ ঘোষকেই পদত্যাগ করতে হল!

আশু ঘোষের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

চৌদ্দ দল, তেরো মাস

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
2883
Dept. of Extension
SERVICE
9.2.71
CALCUTTA-27

সুরুতেই সংকট

১৯৬৯ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়ে গেল।

বিরাট ব্যাপার। হাজার হাজার কর্মী খাটলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হল। আসল ভোট, নকল ভোট, সব কিছু সংগ্রহের জন্য সবাই প্রাণপণ লড়ে গেলেন। এই প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচন এবং এই প্রথম সোজাসুজি প্রশ্ন ভোটদাতাদের সামনে—যুক্তফ্রন্ট, না কংগ্রেস।

১৯৬৭ সনের নির্বাচনের সময় রাজ্যের বহু বামপন্থী নেতা কংগ্রেসের পরাজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসই জিতে যাবে। ১৯৬৯ সনে কিন্তু তাঁদের প্রায় সবাই ধরে নিয়েছিলেন, যুক্তফ্রন্টই জিতবে—কংগ্রেস হারবে। আসন রফার ব্যাপারটাও তাঁরা অল্পেই শেষ করে ফেলতে পারলেন। তাঁদের মধ্যে তখন খুব ভাই-ভাই ভাব। কংগ্রেসকে খতম করতে সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এমনকি অজয়বাবুও।

১৯৬৭ সনে কংগ্রেস নেতারাও আশা করেছিলেন যে, দুই ফ্রন্টের ভোট ভাগাভাগির ফাঁকে তাঁরা জিতে যাবেন। কিন্তু ১৯৬৯ সনে আর তেমন ভরসা করতে পারছিলেন না। এই প্রথম রাজ্যের সব প্রায় অ-কংগ্রেসী দল তাঁদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ। এই প্রথম নির্বাচনের সময় সরকারী মেসিনারির উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ নেই। কংগ্রেস অপরাজেয় এই ধারণাটাও ১৯৬৭ সনের নির্বাচনের পর সকলেরই ভেঙে গিয়েছিল।

নয়ুই ভোটাভুটি যখন হয়ে গেল, রণক্লান্ত পার্টি নেতারা যখন যে যাঁর অফিসে গিয়ে বসলেন, আমরা রিপোর্টাররা তখন অফিসে অফিসে হানা দিলাম। একই প্রশ্ন সর্বত্র—ভোটপর্ব তো হয়ে গেল, অতঃ কিম্? এরপর কী?

কেউ বললেন, কেউ বললেন না। কংগ্রেসের নেতারা প্রায় সবাই চুপচাপ থেকে গেলেন। ফ্রন্টের প্রায় সবাই বললেন, জিতবই, সরকার গঠন করবই।

কিন্তু যখনই তাঁদের জিজ্ঞেস করা হল, মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তখনই জবাব দিতে কুন্ঠা। অনেকেই জবাব দিতে রাজী হলেন না। অনেকে আবার এড়িয়ে গেলেন। এড়িয়ে গেলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, এড়িয়ে গেলেন সি. পি. আই এবং বাংলা কংগ্রেসও। তাঁদের সকলেরই মোটামুটি এক জবাব: ফ্রন্ট যাঁকে নেতা নির্বাচিত করবে তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

সোজাসুজি জবাব দিলেন মাত্র একজন। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ। অশোকবাবু বললেন: কেন, এবারও নেতা হবেন অজয়বাবু, এতে সন্দেহের কী আছে!

আমরা সবাই কিন্তু জানতাম, অশোকবাবু ব্যাপারটা যত সহজভাবে বললেন আসলে তা মোটেই তত সহজ নয়। আমরা জানতাম, সি. পি. এম ওত পেতে বসে আছে, সহজে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবেন না।

ব্যাপারটা অশোকবাবু নিজেও জানতেন এবং আমার মনে হয়, জানতেন বলেই ওই ভাবে প্রথম দিনই তিনি অজয়বাবুর নাম করেছিলেন। আসন ভাগাভাগির সময় থেকেই ফ্রণ্টের সকল নেতা বুঝেছিলেন, এবার মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে বেশ জলঘোলা হবে। বিরোধ দেখা দেবে মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে, ঝগড়া হবে দপ্তর নিয়ে।

হলও তাই। ১২ই ফেব্রুয়ারি সব ফলাফল বেরিয়ে গেল। ফ্রণ্ট শুধু জিতলেন না, বিরাট বিশাল ভাবে জিতলেন। ২৮০-র ভেতর কংগ্রেস মাত্র ৫৫টা আসন পেলেন। তৃতীয় প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগ—মাত্র ৩। আর সবাই ভেসে গেলেন। কিন্তু এই বিরাট নির্বাচনী সাফল্যও ফ্রণ্টের ক্ষমতা ভাগাভাগির মারামারি এতটুকু কমাতে পারল না।

১২-ই রাত্র থেকেই বিভিন্ন ক্যাম্পে শলা-পরামর্শ সুরু হল এবং পরদিন দামামা পুরোদমে বেজে উঠল। সেইদিন সি. পি. এমের পলিটব্যুরোর মিটিং ছিল। মিটিংয়ের পর প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন: বাংলার মানুষের যা রায় তাতে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দল মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং মন্ত্রিসভার এক-তৃতীয়াংশ দাবি করতে পারে। তবে, এমন নয় যে এই ব্যাপারে যা বলব তাই চূড়ান্ত। আলোচনা হতে পারে—যেমন দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল আসনের ব্যাপারে তা হতে পারে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আগে থেকেই আমরা কাউকে নেতা মেনে নিয়েছি।[১]

প্রমোদবাবুর এই বক্তব্য জানাজানি হওয়ার পর সেইদিন রাত্রেই বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা অজয়বাবুর ফ্লাটে বৈঠকে বসলেন। এর আগের রাত্রেও তাঁরা একত্র হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সি. পি. এমের স্ট্রাটিজিটা জানতেন না। তাই চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। ১৩ই রাত্রে সেটা জানার পরই সবাই মিলে স্থির করলেন: ডেটে বসে থাকা হবে। মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং স্বরাষ্ট্র দফতর কোনটাই ছাড়া হবে না।

পরদিন দুপুরে সি. পি. এম নেতাদের অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল। সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক দু দলের নেতারাই অজয়বাবুকে সাবধান করে দিলেন, কিছুতেই ওদের মুখ্যমন্ত্রিত্ব বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্বের দাবি মেনে নেবেন না। অজয়বাবু এবং বাংলা কংগ্রেসের উপস্থিত সব নেতাও তাতে সোৎসাহে সায় দিলেন।[২]

১৪ই ফেব্রুয়ারি সি. পি. এমের নেতারা যথাসময়ে অজয়বাবু এবং বাংলা কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে বেলভেডিয়ারে গেলেন। সি. পি. এমের

[১] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪-২-৬৯।

[২] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ২২-৭-৭০।

প্রস্তাবেই এই বৈঠক। পলিটব্যুরোতেই তাঁরা স্থির করেছিলেন, প্রথমে সোজাসুজি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা সুরু করবেন, আগেই অজয়বাবুর সঙ্গে একটা রফা করে নেবেন। সেই মত অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে জ্যোতিবাবু এবং নিরঞ্জন সেন তো গেলেনই, প্রমোদবাবুও গেলেন। বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে অজয়বাবু ছাড়া সুশীল ধাড়া এবং সুকুমার রায় যোগ দিলেন আলোচনায়। কথা হল বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু কাজের কাজ মোটেই হল না। দুপক্ষই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন, কে কতটা ছাড়তে রাজী হতে পারেন। এবং দুপক্ষই বুঝলেন, কেউই চট করে বড় কিছু ছাড়তে রাজী হবেন না। সি. পি. এম নেতাদের বদ্ধমূল ধারণা হল, সি. পি. আই আগে থেকেই জলঘোলা করে রেখেছে।

বিকালে অজয়বাবুর ফ্লাটে আর একটা বড় বৈঠক বসল। এই বৈঠকে অবশ্য ছাড়াছাড়ির কথা সরাসরি কেউই তুললেন না। সি. পি. এম, বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা শুধু আলোচনা করলেন—কবে ফ্রণ্টের বৈঠক ডাকা যায় এবং তারই মাধ্যমে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে রফা হতে কতটা দেরি হতে পারে। সবাই ভাবলেন, ফ্রণ্টের বৈঠকটা তাড়াতাড়ি বসানো গেলে রফা হয়তো একটা হয়ে যাবে।

সেই মত পরদিন ফ্রণ্টের বৈঠক ডেকে দেওয়া হল—যদিও নেতারা কেউই তখনও জানেন না কীভাবে রফা হতে পারে, কে কতটা ছাড়তে পারেন।

সি. পি. এম গোড়া থেকেই পলিটব্যুরোতে এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁরা এই ঝগড়াটা গোপনে গোপনে চালাবেন না, প্রকাশ্যে নিয়ে যাবেন। তাঁদের ভাষায়: জনগণকে কনফিডেনসে নেওয়ার কৌশল নেওয়া হল। এবং সেই কৌশল অনুসারে ফ্রণ্টের বৈঠক বসার আগের দিনই সি. পি. এমের পবিটব্যুরো একটা কড়া বিবৃতি দিলেন।

সাধারণত অসুবিধায় পড়লে রাজনৈতিক নেতারা, বিশেষভাবে বামপন্থী নেতারা, যা করেন সি. পি. এম পলিটব্যুরো এক্ষেত্রে প্রথমেই সেই মহৎ কাজটা সম্পন্ন করে নিলেন। বিবৃতির গোড়ায়ই তাঁরা "বুর্জোয়া" খবরের কাগজের বিরুদ্ধে একহাত নিলেন। বললেন, ওরা অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য প্রচার চালাচ্ছে।

এই অভিযোগের আসল উদ্দেশ্যটা কী ছিল? আসল উদ্দেশ্যটা কিন্তু ছিল সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতিকে বেকায়দায় ফেলা। দেখানো যে, বুর্জোয়া সংবাদপত্র এবং ওই দলগুলি একসঙ্গে অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চাইছে এবং সি. পি. এমের দাবির বিরোধিতা করছে। তাই সি. পি. এম নেতৃত্ব অন্যান্য সহযোগী দলকে গালিগালাজ করার জন্য বুর্জোয়া সংবাদপত্রকেও সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন।

বিবৃতির শেষ দিকে পলিটব্যুরো বললেন: সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে যে ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দল প্রকাশ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোনও দলের প্রতিনিধির হয়ে প্রচার করছেন।... পলিটব্যুরো এতদিন মুখ্যমন্ত্রিত্ব বা মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কিন্তু বর্তমানে ফ্রণ্টের একক বৃহত্তম অংশীদার ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস সরকারের দৃঢ় বিরোধীরূপে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য এ দলের

তর্কাতীত দাবির কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হচ্ছে।[৩]

এদিকে কিন্তু সি. পি. এম তখন ঠিকই করে রেখেছেন যে, প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রিত্ব চাইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা স্বরাষ্ট্র সহ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিয়ে নেতৃত্ব অজয়বাবুকে ছেড়ে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এও ঠিক করে রেখেছিলেন যে, যতক্ষণ না স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি দফতরগুলি পাবেন ততক্ষণ মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য দাবি করে যাবেন।

প্রকাশ্যে সি. পি. এম নেতারা এ সম্পর্কে কিছু না বললেও তাঁদের ওই সিদ্ধান্তের কথা আমরা রিপোর্টাররা জানতাম এবং ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের নেতারাও জানতেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারিই আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম: প্রমোদবাবু বলতে রাজী নন, তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেল বাম কমিউনিস্ট পারটি মুখ্যমন্ত্রিত্বের বিনিময়ে স্বরাষ্ট্র-সহ কতগুলি দফতর চাইবেন।

পরদিন আরও স্পষ্ট জানা গেল, সি. পি. এম কোন্ কোন্ দফতর চাইবেন। সেদিনের রিপোর্টে লিখেছিলাম: সি. পি. এম মুখ্যমন্ত্রিত্বের বিনিময়ে স্বরাষ্ট্র, ভূমিরাজস্ব, অর্থ, শিক্ষা, শ্রম, পুনর্বাসন প্রভৃতি দফতর চাইছেন।[৪]

ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলও জানতেন সি. পি. এম আসলে কী চান এবং কেনই বা মুখে মুখ্যমন্ত্রিত্ব চাইছেন। কিন্তু তাঁরা সি. পি. এমের আসল দাবিটাও মানতে রাজী ছিলেন না। তাই সব জেনেশুনেও সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লক চুপ করে বসে রইলেন। ওঁরা ঠিক করলেন, এমন অবস্থা করতে হবে যাতে সি. পি. এম-ই প্রকাশ্যে বলতে বাধ্য হন যে, স্বরাষ্ট্র সহ বড় দফতরগুলি পেলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব অজয়বাবুকে ছাড়তে রাজী। সি. পি. এমেরও স্ট্রাটিজি, তাঁরা নিজেরা মুখে সেকথা বলবেন না। তাঁরা চাইছিলেন, সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাংলা কংগ্রেস নিজে থেকেই এসে প্রস্তাব দিক—আপনারা স্বরাষ্ট্র সহ বড় বড় দফতরগুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিন। সি. পি. এমের প্রধান টারগেট ছিল সি. পি. আই। তাঁরা দেখাতে চাইছিলেন, সি. পি. আই এমন কমিউনিস্ট পারটি যে, আর একটা কমিউনিস্ট পারটির হাতে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দিতে ভরসা পায় না। এমন কি, একটা কমিউনিস্ট পারটির হাতে স্বরাষ্ট্র দফতর ছেড়ে দিতেও তাঁদের আপত্তি।

১৪ই রাত্রে বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা আবার শলা-পরামর্শে বসলেন। পরদিন যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে কী লাইন নেওয়া হবে সেইটা ঠিক করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। ওঁরা ঠিক করলেন, ফ্রন্টের বৈঠকের সুরুতেই প্রস্তাব করবেন যে, আগে মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রশ্নের ফয়সালা হয়ে যাক, তারপর দফতর বণ্টনের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাবে। যেমন ১৯৬৭ সনে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে

[৩] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫-২-৬৯।

[৪] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫-২-৬৯।

ওঁরা এও স্থির করলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য অজয়বাবুর নাম প্রস্তাব করবেন।

সি. পি. এম ব্যাপারটা আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন। তাই তাঁরা সিদ্ধান্তই করে রেখেছিলেন যে, কিছুতেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং দফতর বন্টনের প্রশ্ন আলাদা আলাদা বিবেচনা করতে দেবেন না। ১৫-ইর বৈঠকে যখন প্রস্তাব উঠল যে, আগে মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত হোক এবং অজয়বাবুই ফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হোন তখন সঙ্গে সঙ্গে সি. পি. এম সেই প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানালেন। তাঁরাও মুখ্যমন্ত্রিত্ব চেয়ে বসলেন এবং বললেন যে, দফতর বণ্টনের ব্যাপারটাও একই সঙ্গে করতে হবে—পিসমিল কিছু করা চলবে না। সি. পি. এম নেতৃত্বের ভয় ছিল, আগে অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিলে পরে আর স্বরাষ্ট্র দফতর পাবেন না। আসলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রিত্বের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র দফতর এক্সচেঞ্জ করতে চেয়েছিলেন।

বৈঠকে কিন্তু আটটি দলই অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাঁরা এও বললেন যে, আগের বারের মত প্রথমই মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। সি. পি. এমের বক্তব্য সমর্থন করলেন মাত্র দুটি দল— আর. সি. পি. আই এবং ওয়ারকারস পারটি। আর. এস. পি বললেন, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের আগে তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারবেন না।

সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বাংলা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল না হলেও তাঁরা কিছুটা এগোতে পারলেন। এইদিন ফ্রন্টের বৈঠকে সি. পি. এম সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে বাধ্য হলেন যে, স্বরাষ্ট্র দফতর পেলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবেন; কিন্তু স্বরাষ্ট্র দফতর হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি কিছুতেই ছাড়বেন না।

সেইদিন রাত্রেই প্রমোদবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। দলের বক্তব্য তিনি অনেকটা খোলাখুলি ভাবেই বললেন: নেতৃত্ব এবং দফতর বণ্টনের প্রশ্নে আমরা আলাদা আলাদা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আমরা চাই একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও দফতর বণ্টনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত।...স্বরাষ্ট্র দফতর যে সব সময় মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই থাকতে হবে এ যুক্তি মানি না। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে কি স্বরাষ্ট্র দফতর আছে?[৫]

১৬ই ঝগড়াটা একেবারে প্রকাশ্যে চলে এল।

সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সি. পি. এম তাঁদের রাজ্য কমিটির বৈঠক ডেকেছিলেন। ১৫ই সেই বৈঠক শেষ হল এবং পরদিনই বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করার জন্য দলের নেতারা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন।

জ্যোতিবাবু এবং প্রমোদবাবু দুজনেই এই সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন। জ্যোতিবাবুই প্রথমে কথাটা বললেন : মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে কতকগুলি জরুরী অসুবিধা দেখা দিয়েছে। জনগণের রায় অনুসারে আমরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব দাবি করেছি। ফ্রন্টের অনেকে তাতে রাজী নন। তাঁরা অজয়বাবুকে চান। কিন্তু তাঁরা বলছেন না, জনগণের রায় অনুসারে আমরা কীভাবে দায়িত্ব পালন করতে

---

[৫] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৬-২-৬৯।

পারি। কারু কোনও বিকল্প প্রস্তাব থাকলে তাঁরা তা বলতে পারেন। কিন্তু কেউই তা বলছে না।

জ্যোতিবাবুর এই ঘোষণায়ই অবশ্য সি. পি. এমের বক্তব্য শেষ হল না। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে জ্যোতিবাবু এবং প্রমোদবাবু কতগুলি খুব কড়া কড়া কথা বললেন। সেই সব কড়া কথার দু-একটা নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হল।

একজন সাংবাদিক : আপনারা অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে রাজী হচ্ছেন না কেন?

জ্যোতিবাবু : অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতেই হবে এমন কোনও ধারণা পোষণ করা ভুল। তবে, জনসাধারণ অজয়বাবুকেও মন্ত্রিসভার মধ্যে চান। সি. পি. এম মুখ্যমন্ত্রিত্ব পেলেই জনসাধারণের ভোটের রায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে।

প্রশ্ন : গতবার তো আপনারা অজয়বাবুর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এবার প্রশ্ন উঠছে কেন?

জ্যোতিবাবু: হুমায়ুন কবিরের ব্ল্যাকমেলের দরুন ওটা আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল। যদিও সি. পি. এমের শক্তি বাংলা কংগ্রেসের চেয়ে ১০টি আসন বেশী ছিল। তবু হুমায়ুন কবির আমাদের দলের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজী হয়নি।

প্রশ্ন : যদি অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী না করা হয় তাহলে কি লোকে তাঁর প্রতি অনাস্থা বলে মনে করবে না?

প্রমোদবাবু : কোনও কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেই কি কেউ তার নেতা হয়ে যায়? সুতরাং অনাস্থার প্রশ্নই ওঠে না।

সর্বশেষে জ্যোতিবাবু বললেন : মুখ্যমন্ত্রিত্ব না পেলে কীভাবে আমরা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারি তা আমরা অন্যদের কাছে জানতে চাইছি। যদি তাঁদের কোনও বিকল্প প্রস্তাব থাকে তবে তা আমাদের কাছে বলুন।[৬]

বিকালে বাংলা কংগ্রেস একটা পাল্টা চাল দিলেন। তাঁরা সরকারীভাবে কিছু বললেন না। কিন্তু বেসরকারীভাবে বিভিন্ন দলের নেতা ও সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের জানিয়ে দিলেন যে, "অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী না করা হলে আমরা তাঁকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে দেব না।"

সি. পি. আই বরাবরই কৌশলপন্থী দল। সন্ধ্যে নাগাদ বিশ্বনাথ মুখার্জী বললেন : সি. পি. এমই বলুন না কীভাবে কী করা যায়। ওঁরা বলছেন অজয়বাবুকে মন্ত্রিসভায় রাখা চাই। অথচ বাংলা কংগ্রেস বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী না করা হলে অজয়বাবুকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে দেওয়া হবে না। এখন সি. পি. এম-ই বলুন কী করা যেতে পারে।

অশোক ঘোষ কিন্তু তাঁর কথা সোজাসুজি বললেন : জ্যোতিবাবুরা যখন প্রকাশ্যেই জানতে চাইছেন তখন প্রকাশ্যেই বলছি আমাদের বক্তব্য। আমরা চাই

[৬] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭-২-৬৯।

অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী হোন এবং তাঁর হাতেই স্বরাষ্ট্র দফতর থাক। বাম কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি নিজ ইচ্ছামত বেছে নিন।

এইসঙ্গে দফতর বণ্টনের একটা পরিকল্পনাও অশোকবাবু দিলেন: ধরুন ২৪জন মন্ত্রী হবেন। অজয়বাবু স্বরাষ্ট্র দফতরসহ মুখ্যমন্ত্রী। বাদ রইল ২৩টি দফতর। প্রথমে যে কোনও তিনটি সি. পি. এম বেছে নিন। তারপর দলের এম. এল.এ-র আনুপাতিক হারে সব দল একটি করে দফতর বেছে নিন। এইভাবে কনিষ্ঠতম দল পর্যন্ত সকলের একটি করে দফতর নেওয়া হলে আবার সি. পি. এম থেকে বাঁটোয়ারা সুরু হোক এবং এইভাবে যতদূর যায় সবাই আবার একটি করে দফতর নিন।[৭]

এই রকম যখন অবস্থা তখন ১৭ই আবার ফ্রণ্টের বৈঠক ডাকা হল। কিন্তু সে বৈঠকেও কাজ এতটুকু এগলো না। আবার সেই পুরনো বিতর্ক সুরু হল— আগে আলাদাভাবে মুখ্যমন্ত্রিত্বের ফয়সালা, না সব কিছু একসঙ্গে আলোচনা। বিতর্ক চলল বহুক্ষণ, কিন্তু কোনও রফা হতে পারল না।

আসলে মূল প্রশ্নটা তখনও অমীমাংসিত। বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক তখনও সি. পি. এমকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্ব ছাড়তে রাজী নন। সি. পি. এমও স্বরাষ্ট্র দফতর না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নাম পাকা করতে দেবেন না।

ইতিমধ্যে সি. পি. আই-য়ের পক্ষ থেকে নতুন একটা প্রস্তাব বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটা এই রকম: স্বরাষ্ট্র দফতরকে ভাগ করে দেওয়া হোক— স্বরাষ্ট্র প্রশাসন এবং স্বরাষ্ট্র পুলিস। জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্রের পুলিস শাখাটা নিন, অজয়বাবুর হাতে প্রশাসন দফতর থাক।

সি. পি. এম যাতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন সেজন্য সি. পি. আই নানাভাবে চেষ্টা করলেন। বিশ্বনাথবাবু নিজে জ্যোতিবাবুকে নানা অনুরোধ উপরোধ জানালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। স্বরাষ্ট্র দফতর পুরোটা না পেলে যে তাঁরা একচুলও নড়বেন না সি. পি. এম সবাইকে তা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন।

গভীর রাত্র পর্যন্ত বড় চার পার্টি, অর্থাৎ সি. পি. এম, সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক একসঙ্গে বসেও রফার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু হল না।

সেই বৈঠকের পর প্রমোদবাবু আমাকে বললেন : প্রশাসন সহ স্বরাষ্ট্র দফতর না পেলে আমরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়তে পারি না। আমরা আজ একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি। ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস এবং সি. পি. আই বলছেন পুলিস বিভাগ আমাদের হাতে থাক এবং প্রশাসন বিভাগ থাক মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর হাতে। আমরা তাতে রাজী নই। শুধু পুলিস দফতর মানে হাবিলদারদের উপর খবরদারির অধিকার লাভ। আমরা শুধু হাবিলদারের মন্ত্রী হতে চাই না।[৮]

ঝগড়াটা তখন প্রকাশ্যে এবং চরমে। সেইদিন রাত্রেই অন্য পক্ষে আবার

---

[৭] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭-২-৬৯।

[৮] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮-২-৬৯।

অশোক ঘোষ মন্তব্য করলেন : একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করব, অথচ তাঁর হাতে কোনও ক্ষমতা থাকবে না, এমন কি প্রশাসন দফতরও না—এ কেমন কথা! জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সেকরেটারি সব অদল-বদল করবেন অন্য একজন মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী নন—তা কি করে হয়!

এস. এই. সি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সমগ্র পরিস্থিতিটা বিচার করার প্রস্তাব রাখলেন। তাঁরা বললেন : প্রথম বারের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। যুক্তফ্রন্টের সাফল্য বা ব্যর্থতা সেই তিনটা দিক নিয়েই। জনসাধারণ সেই তিনটা দিক বিবেচনা করেই ফ্রন্টকে বিপুল ভোটাধিক্যে জিতিয়েছেন। সুতরাং সেই তিনটা মৌলিক জিনিষ এবারও অপরিবর্তিত রাখা হোক।

কী সেই তিনটা বিষয়? ওঁরা বললেন : (১) অজয়বাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্ব, (২) জ্যোতিবাবুর উপমুখ্যমন্ত্রিত্ব ও অর্থমন্ত্রিত্ব এবং (৩) সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রম মন্ত্রিত্ব।

এস. ইউ. সি-র এই প্রস্তাব শুনে সি. পি. এম তো খাপ্পা। প্রথম ফ্রন্ট সরকারের আমলে এস. ইউ. সি মোটামুটিভাবে সি. পি. এম-কেই সমর্থন করে-ছিলেন। ১৯৬৭-র নির্বাচনে সি. পি. এম পরিচালিত নির্বাচনী জোটেই ছিলেন। কিন্তু এস. ইউ. সি আসন রফা নিয়ে সি. পি. এমের উপর কিছুটা চটে ছিলেন। আসন ভাগাভাগির সময় তাঁদের সব দাবি সি. পি. এম সমর্থন করেননি। নির্বাচনের পর এস. ইউ. সি আরও চটলেন যখন শুনলেন সি. পি. এম শ্রম দফতর চাইছেন। তাঁরা তাই নতুন প্রস্তাব দিলেন। নীতিগত প্রস্তাব! এই প্রস্তাব গৃহীত হলে সুবোধ ব্যানার্জীর হাতেই শ্রম দফতর থেকে যায়!

সি. পি. এম এই প্রস্তাব শুনেই ক্ষিপ্ত। সেই থেকেই সি. পি. এমের সংগে এস. ইউ. সি-র জোর ঝগড়া।

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল বেরুবার পর দেখতে দেখতে এইভাবে ছটা দিন কেটে গেল। যুক্তফ্রন্ট বিরাটভাবে জিতেছেন অথচ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারছেন না। এবং, মন্ত্রিসভা গঠনের শরিকী বিরোধ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

এই অবস্থায় ফ্রন্ট সমর্থক সাধারণ মানুষ বেজায় চটলেন। ১৯৬৭ সনের অভিজ্ঞতা থেকে এবং নির্বাচনী অভিযানে "ভাই" "ভাই" ভাবের চূড়ান্ত দেখে তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল এবারও চট করেই মন্ত্রিসভাটা হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। তাঁরা আশাহত হলেন। চটলেন।

ফ্রন্টের শরিক দলগুলির সক্রিয় সমর্থকদের মধ্যেও পাড়ায় পাড়ায় উত্তাপ বাড়ল। মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্বের জন্য কে দায়ী, কে অন্যায় আবদার করছেন, কে কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন—এইসব নানা প্রশ্নে পার্টিতে পার্টিতে, কর্মীতে কর্মীতে পুরোদমে ঝগড়া সুরু হয়ে গেল।

উত্তাপটা আরও বাড়ল যখন সি. পি. এম নেতারা বিভিন্ন দলের উপর "পাবলিক প্রেসার ক্রিয়েট" করার কৌশল অবলম্বন করলেন। সি. পি. এমের কর্মীরা ছোট ছোট মিছিল করে ঘুরে ঘুরে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়া সুরু করলেন। বৌবাজার ষ্ট্রীটে সি. পি.

আই-র সদর দফতরের সামনেও সি. পি. এম সমর্থকরা জোর বিক্ষোভ দেখালেন। সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা এমনও আশংকা করলেন যে তাঁদের অফিস আক্রান্ত হতে পারে। ১৭ই সন্ধ্যায় ফ্রন্টের নেতারা তাঁদের ব্যর্থ বৈঠকের পর সি. পি. আই অফিস থেকে নেমে আসার সময় "জনতার" হাতে ঘেরাও-ও হলেন।

সব মিলিয়ে উত্তাপ বেড়েই চলল।

তবু কিন্তু ১৮ই সকালে আবার ফ্রন্টের বৈঠক বসল। সি. পি. আই-র অফিসে বৈঠক বসালে পাছে অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে সেই ভয়ে নেতারা বৈঠক বসালেন নিয়ে সি. পি. এমের কলকাতা জেলা কমিটির অফিসে। কিন্তু সেখানেও জনগণের ভীড় এবং সেখানেও কোনও রফা হল না।

সন্ধ্যায় আবার নেতারা বসলেন এবং বলা বাহুল্য, আবার বৈঠকের স্থান পাল্টালেন। এবার ফ্রন্টের বৈঠক বসল আলিপুরে স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে। বৈঠকের স্থানকাল বাইরের কাউকেও জানতে দেওয়া হল না। এমনকি নেতারা খবরটা রিপোর্টারদের কাছ থেকেও গোপন রাখতে চেষ্টা করলেন। যদিও পারলেন না।

এই বৈঠক মিনিট পঁচিশের মধ্যেই ভেঙ্গে গেল। বাইরে আলিপুরের অভিজাত পাড়ার শান্ত আবহাওয়া। কিন্তু স্নেহাংশুবাবুর বাড়ির ভেতরে ফ্রন্টের বৈঠকে তখন বেশ উত্তাপ। মূল ঝগড়া সেই একটি জিনিষ নিয়েই—স্বরাষ্ট্র দফতর। সি. পি. এম স্বরাষ্ট্র দফতর পুরোপুরি না পেলে কিছুতেই রফা করতে রাজী নন। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বাংলা কংগ্রেসও অটল—মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর হাতে অন্তত স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) দফতর দিতেই হবে।

উত্তেজিত আলোচনা চলার সময়ই চটে গিয়ে অজয়বাবু একবার সি. পি. এমের উদ্দেশ্যে বললেন : আপনারা বৃহত্তম দল, আপনারাই সরকার গঠন করুন। বাংলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিও তাতে থাকবেন। কিন্তু আমাকে মাফ করবেন। আমি বাইরে থেকেই সর্বতোভাবে সেই মন্ত্রিসভাকে সাহায্য জানাব।

জ্যোতিবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন : আমরা তো আগেই বলেছি তা হয় না।

বিশ্বনাথবাবুও সি. পি. এম-কে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলেন। বললেন : বৃহত্তম দল তাঁর সমর্থকদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করুন। আমরা বাইরে থেকে তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানাব।

এসব দেখে সি. পি. এম নেতারা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বৈঠকের শেষের দিকে হরেকৃষ্ণ কোঙার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন : এতই যখন আপনাদের আপত্তি, যখন মুখ্যমন্ত্রিত্বও দেবেন না, স্বরাষ্ট্র দফতরও না, তখন আপনারাই মন্ত্রিসভা গঠন করুন—আমরা মন্ত্রিসভার বাইরে থেকেই তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানাব।

একটা অদ্ভুত ডামাডোলে অবস্থার মধ্যে মিটিং ভেঙ্গে গেল। হইচইর মধ্যে সবাই যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন এক ছোট পার্টির নেতা কাতরভাবে আবেদন জানালেন অজয়বাবুর কাছে : অজয়দা, আপনি আমাদের নেতা, আপনি একটা মীমাংসা করে দিন।

অজয়বাবু খুব উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলেন : কে বললে আমি আপনাদের নেতা—বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেই যে কেউ নেতা হয়ে যায় না সেটা তো আপনারা বলেই দিয়েছেন!

জ্যোতিবাবু বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসতেই রিপোরটাররা জিজ্ঞেস করলেন : কী হল?

সি. পি. এম নেতা তখন বেজায় রেগে। চলতে চলতেই পেছনে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন : ওই যাঁরা হলঘরে বসে আছেন তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।

আমি আর টাইমস অব ইন্ডিয়ার শঙ্কর ঘোষ সেদিন আলিপুর না গিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়েই দুজনে প্রমোদবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। প্রমোদবাবুর মূল বক্তব্য ছিল : আমরা সি. পি. আইর মুখোস খুলে দিতে চাই। ওরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে, অথচ একটা কমিউনিস্ট পারটির হাতে মুখ্যমন্ত্রিত্ব বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব ছাড়তে রাজী নয়। সবাই ওদের চিনুক।...

কথা বলছিলাম। এমন সময় হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং সরোজ মুখার্জী এসে হাজির। সোজা আলিপুর থেকে আসছেন।

জিজ্ঞেস করলাম : কী হল?

হরেকৃষ্ণবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : ডেড-লক—অচল অবস্থা।

তারপর প্রমোদবাবুকে বললেন : চলুন, চলুন, জরুরী কথা আছে, এখুনি বসতে হবে।

সেদিন যখন ফ্রন্টের দ্বিতীয় দফা মিটিং ভাঙ্গল তখন কেউ জানেন না আবার কবে বৈঠক বসবে। কীভাবে রফা হতে পারে, সে ব্যাপারটাও কারু কাছে পরিষ্কার নয়। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, শেষ পর্যন্ত কে ছাড়বেন—সি. পি. এম অজয়বাবুর জন্য স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) ছাড়বেন, না সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাংলা কংগ্রেস জ্যোতিবাবুকে পুরো স্বরাষ্ট্র দফতর ছেড়ে দেবেন।

এইখানেই এল অ্যাসেসমেণ্টের প্রশ্ন। সকলেই সকলের প্রতিপক্ষকে অ্যাসেস করতে বসলেন। আলিপুরের বৈঠক ভেঙ্গে যাওয়ার পরই সব ইনার সার্কেলের বৈঠক সুরু হল। পরদিন কে কোন্ পথে এগোবেন সেইটা স্থির করে নেওয়ার জন্য সবাই গভীর রাত পর্যন্ত শলাপরামর্শ করলেন।

সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা বসলেন অজয়-বাবুর ফ্লাটে। যৌথভাবে তখনও তাঁরা পুরনো অ্যাসেসমেণ্টেই অবিচল। তখনও তাঁদের ধারণা, ডেটে বসে থাকলে সি. পি. এম শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) দফতর ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

যৌথভাবে বললাম এইজন্য যে, আলাদা আলাদাভাবে তিন পারটিরই অ্যাসেস-মেণ্টে বেশ কিছুটা ফারাক ছিল। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব আসলে স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তৃত্ব নিয়ে এসপার ওসপার অবস্থায় যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা হোম পেলে, এমনকি হোমের প্রশাসন শাখা পেলে খুশী হতেন; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর হাতে হোম না এলে মন্ত্রিসভায় যোগই দেব না এটা তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল না।

তাঁরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অর্থ দফতর পেলেই রফা করবেন বলে গোড়া থেকে স্থির করে রেখেছিলেন।

বাংলা কংগ্রেসের দুটো সিদ্ধান্ত ছিল—একটা প্রকাশ্য, আর একটা গোপন। প্রকাশ্য সিদ্ধান্তটা নিয়ে রেখেছিলেন দলের কর্মপরিষদ : মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং তৎসহ স্বরাষ্ট্র দফতর চাই। না হলে অজয়বাবু মন্ত্রিসভায় যাবেন না। তবে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল অজয়বাবু, সুশীল ধাড়া এবং সুকুমার রায়ের উপর।

যেদিন কর্মপরিষদ এই প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত নিলেন সেইদিনই আবার দলের সম্পাদকমণ্ডলী গোপনে সিদ্ধান্ত করলেন : মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং তৎসহ অর্থ দফতর পেলেই রফা করা হবে। এই দুটো সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছিলেন ১৪ই। দলের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসার আগেই বাংলা কংগ্রেস নেতৃত্ব সি. পি. আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। দুদলেরই কিন্তু বক্তব্য ছিল : ডেটে বসে থাকুন, ওঁরা শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের একাংশ ছাড়তে বাধ্য হবেই। বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলী কিন্তু তবু ঠিক করে রেখেছিলেন অর্থসহ মুখ্যমন্ত্রিত্ব পেলে তাঁরা সি. পি. এম-কে হোম ছেড়ে দেবেন।[১]

সি. পি. এম শেষ পর্যন্ত অজয়বাবুর জন্য মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের একাংশ ছাড়বেনই, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা ১৯শে দুপুর পর্যন্ত এই ধারণায় অবিচল ছিলেন। তাছাড়া তাঁরা মনে করছিলেন যে, সি. পি. এমের হাতে গোটা স্বরাষ্ট্র দফতরটা গেলে তাঁরা পুলিশ এবং প্রশাসনকে পুরোপুরি দলের স্বার্থে ব্যবহার করবেন। তাই সেই বিবেচনায়ও তাঁরা সি. পি. এমের হাতে পুরোপুরি স্বরাষ্ট্র দফতর ছেড়ে দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তবে, সি. পি. আই-কে তাঁরা এর মধ্যেও বেশ কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, সি. পি. আই স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) অজয়বাবুর জন্য এবং স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) জ্যোতিবাবুর জন্য বরাদ্দ করে নিজেরা অর্থ দফতরটা বাগিয়ে নিতে চান।

সি. পি. আই-র রাজ্য নেতাদের মধ্যে অন্তত বিশ্বনাথবাবুর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত সি. পি. এম স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) দফতর অজয়বাবুর জন্য ছাড়তে বাধ্য হবেন। কারণ, অজয়বাবুকে বাদ দিয়ে ওঁরা কিছুতেই সরকার গড়তে সাহস পাবেন না। তাই, যেটা একান্ত প্রয়োজন তা হলো অজয়বাবুর ডেটে বসে থাকা। ১৮ই রাত্রের বৈঠকেও বিশ্বনাথবাবু বার বার সেই ডেটে বসে থাকার পরামর্শই দিয়েছিলেন।

আলিপুরের মিটিং ভেঙে যাওয়ার পর উত্তেজিত হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং সরোজ মুখার্জী যখন জরুরী আলোচনার জন্য প্রমোদবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন, তখন শঙ্কর ঘোষ ও আমি সি. পি. এম সম্পাদকের সঙ্গে এই স্বরাষ্ট্র দফতর ছাড়ার ব্যাপার নিয়েই কথা বলছিলাম। প্রমোদবাবু বলছিলেন : আমরা ওদের, অর্থাৎ সি. পি. আই-কে এক্সপোজ করতে চাই। দেখুক সবাই, ওরা কেমন

[১] সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ১৮-৭-৭০। সুশীল ধাড়া। সাক্ষাৎকার ২৭-৭-৭০।

কমিউনিস্ট।

শঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন : যদি ধরুন ওঁরা শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন) ছাড়তে রাজী না হন, তাহলে আপনারা কী করবেন? ব্রেক করবেন?...অফ দি রেকর্ড-ই শুনি আপনাদের বক্তব্যটা কী?

আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রমোদবাবু বলেছিলেন : অফ দি রেকর্ড, সি. পি. আই-কে আরও এক্সপোজ করে তারপর আমরা না হয় হোম অ্যাডমিনস্ট্রেশন ছেড়ে দেব।

শঙ্করবাবুরও এই কথা মনে আছে। কিন্তু প্রমোদবাবু বলছেন, আমরা তাঁর বক্তব্য ভুল বুঝেছিলাম, ওরকম কোনও কথাই তিনি বলেননি। বলতে পারেনও না। কারণ, দলের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল, স্বরাষ্ট্র দফতর কিছুতেই ছাড়া হবে না।[১০]

হরেকৃষ্ণবাবুও বলছেন : আমরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব চাইব এটা ঠিক করেছিলাম। তবে এটা নিয়ে ব্রেক করব না বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। স্বরাষ্ট্র দফতরের ব্যাপারে কিন্তু আমরা ব্রেক করতেও রাজী ছিলাম। অর্থাৎ, বলতাম যে স্বরাষ্ট্র দফতর না দিলে আমরা সরকারে যাব না। কারণ, আমরা আগের বারই বুঝেছিলাম স্বরাষ্ট্র দফতরের গুরুত্ব কতটা। এবং আমরা এও বুঝেছিলাম যে, স্বরাষ্ট্র দফতর হাতে না পেলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার যে লক্ষ্য নিয়ে সরকারে যাচ্ছি তা পূর্ণ করতে পারব না।[১১]

সি. পি. এম শেষ পর্যন্ত হোমের একটা অংশ ছাড়তে রাজী হতেন, কি হতেন না, সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। কারণ, ১৯শে সকালে সি. পি. এম যে চালটা দিলেন প্রধানত তাতেই তাঁদের কাজ হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ একেবারে ছত্রাকার। কার্যত গোটা স্বরাষ্ট্র দফতর পাকা ফলটির মত তাঁদের হাতে এসে পড়ল।

১৮ই যখন ফ্রণ্টের মিটিং ভেঙেগ গেল তখন পরবর্তী বৈঠকের কথা কেউই তুললেন না। সকলেই মোটামুটি ধরে নিলেন যে, বড় পারটিগুলি কোনও রফা করার আগে পর্যন্ত আর ফ্রণ্টের মিটিং বসবে না।

১৯শে সকালে সি. পি. এম আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটে তাঁদের অফিসে সমর্থক পারটিগুলির এক ঘরোয়া বৈঠক ডাকলেন। এতে উপস্থিত ছিলেন আর. এস. পি, ওয়ারকার্স পারটি এবং আর. সি. পি. আই। সি. পি. এম নেতারা এই বৈঠকেই প্রস্তাব দিলেন : যখন অজয়বাবু স্বরাষ্ট্র দফতর ছাড়তে রাজী নন এবং বলছেন তা না হলে তিনি মন্ত্রিসভায় আসবেন না, তখন আসুন আমরা অজয়বাবুকে বাদ দিয়েই মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করি।[১২]

এই প্রস্তাব উপস্থিত সবাই মেনে নিলেন এবং তখনই স্থির হল কে কিভাবে প্রস্তাবটা নিয়ে অন্যান্য দলের কাছে যাবেন। এই বৈঠকে আরও স্থির হল যে, আহবায়ক হিসাবে সুধীনকুমার ২০শে ফ্রণ্টের বৈঠক ডেকে দেবেন অন্য কাউকে

---

[১০] প্রমোদ দাশগুপ্ত। সাক্ষাৎকার ১৬-৭-৭০।

[১১] হরেকৃষ্ণ কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৭-৭০।

[১২] যতীন চক্রবর্তী। সাক্ষাৎকার ২০-৭-৭০।

না জিজ্ঞেস করেই।[১৩]

দুপুরের ভেতরেই তিন "বন্ধু" পারটি আসরে নেমে পড়লেন এবং সি. পি. এম নেতারা প্রতিক্রিয়াটা দেখার জন্য চুপচাপ আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে বসে রইলেন।

ওঁরা বাংলা কংগ্রেস এবং সি. পি. আই-কে বাদ দিলেন। এছাড়া আর সব পারটিকেই কিন্তু প্রস্তাবটা জানালেন। অবশ্য বললেন না যে, এটা সি. পি. এমের প্রস্তাব। ভাবটা দেখালেন যেন ওটা তাঁদেরই প্রস্তাব।

সি. পি. এমের লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে আগে ফরওয়ার্ড ব্লককে ভাঙিয়ে আনা। তাই আর. এস. পি-র ত্রিদিব চৌধুরী, ওয়ারকার্স পারটির জ্যোতি ভট্টাচার্য এবং আর. সি. পি. আই-র সুধীনকুমার প্রথমেই লেগে গেলেন সেই উদ্দেশ্যে। তাঁরা মোটামুটি একই বক্তব্য নিয়ে বিকেলের ভেতরেই আলাদা-আলাদা অশোক ঘোষের সঙ্গে কথা বললেন। ত্রিদিববাবু বললেন, অজয়বাবু যদি হোম ছাড়তে রাজী না হন, তাহলে আর কতদিন অপেক্ষা করা যায়। বাংলা কংগ্রেস তো বলেইছে যে, ওঁরা অজয়বাবুকে বাদ দিয়েও মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজী। তাহলে আসুন এবার জ্যোতিবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করা যাক।[১৪]

অশোকবাবু বলেন, তাঁরা সোজাসুজি ত্রিদিববাবুকে, জ্যোতি ভট্টাচার্যকে এবং সুধীনকুমারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অজয়বাবুকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁরা কোনও মতেই রাজী হবেন না। কারণ সেটা জনগণের রায়ের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হবে। কিন্তু এইদিনই অশোকবাবুর পরবর্তী ক্রিয়াকলাপে ধরা পড়ে যে, সি. পি. এম ও তাঁর বন্ধু পারটিগুলির এই মুড দেখে তিনি বেশ কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।

সন্ধ্যে নাগাদ আর একটা জিনিস প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করল সি. পি. এম-কে। যুগান্তর কাগজ থেকে একটা খবর রটল যে, তাঁদের দিল্লি অফিস জানিয়েছেন সি. পি. আই-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের ক্রিয়াকলাপ মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না। অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করা এবং তাঁর হাতে স্বরাষ্ট্র দফতর দেওয়া নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব যেভাবে প্রকাশ্যে "ওকালতি" করছেন সি. পি. আই-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তার ঘোরতর বিরোধী। এও রটল যে, পশ্চিমবঙ্গ সি. পি. আই-কে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ২০শে সকালেই ডাঙ্গে, ভূপেশ গুপ্ত, রাজেশ্বর রাও, ভবানী সেন প্রভৃতি কলকাতা আসছেন।

এই খবরটা সবচেয়ে আগে পেলেন সি. পি. এম নেতারা। বলা বাহুল্য খবরটা পেয়ে তাঁরা প্রচণ্ড উৎসাহিত হলেন। সন্ধ্যেবেলা সি. পি. এম অফিসে পেঁৗছে দেখি জ্যোতিবাবু, সরোজবাবু প্রভৃতি বসে। জ্যোতিবাবু প্রথমেই ওই খবরটার কথা জিজ্ঞেস করলেন : আপনারা এরকম কোনও খবর পেয়েছেন?

আমি বললাম : অনেকক্ষণ অফিসের বাইরে। ঠিক জানি না। চেক আপ

---

[১৩] প্রমোদবাবু অবশ্য বলেন যে, এ প্রস্তাব তাঁরা দেননি, ওই তিন পারটিই দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকার ১৬-৭-৭০।

[১৪] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ২২-৭-৭০।

করে দেখছি।

অফিসে ফোন করলাম। কিন্তু না, আমাদের অফিসে ওরকম কোনও খবর আসেনি। কোনও নিউজ এজেন্সি দেয়নি, আমাদের দিল্লি অফিসও জানায়নি।

জ্যোতিবাবুকে জানালাম। উনি বললেন, কিন্তু যুগান্তরে এখবর এসেছে।

অফিসে ফিরে সি. পি. আই অফিসে খোঁজ নিলাম। সুকুমার গুপ্ত ছিলেন। বললেন: ওরকম কোন খবরই তাঁরা শোনেননি। এমনকি পরদিন তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কলকাতা আসছেন বলেও জানেন না।

ফোন করলাম ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে। তাঁরাও যুগান্তরের খবরের কথা বললেন। তাঁরাও জিজ্ঞেস করলেন, আমরা অমন কোনও খবর পেয়েছি কিনা। তাঁরাও বললেন, সি. পি. আই অফিস বলছেন এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না— এমনকি নেতারা যে আসছেন তাও শোনেননি। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা বার বার বিশ্বনাথ মুখার্জীর খোঁজ করলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে ধরতে পারলেন না।

প্রথমে সি. পি. এম-এর তিন দূতের মুখে জ্যোতিবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব শুনে এবং পরে যুগান্তরের সূত্রে সি. পি. আই-র জাতীয় নেতাদের দ্রুত কলকাতা আগমনের উদ্দেশ্যের কথা জেনে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা অত্যন্ত শংকিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের আশংকা হল, সি. পি. আই-র জাতীয় নেতৃত্ব বাংলা কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে ল্যাং মেরে এখন সি. পি. এমের সঙ্গে রফা করতে চাইছেন।

এসব খবর তখন বাংলা কংগ্রেস নেতাদের কানেও গিয়ে পেঁছেছে। তাঁরাও শংকিত। তাঁরাও কিছুতেই বিশ্বনাথবাবুকে ধরতে পারছেন না।

এই অবস্থায় রাত প্রায় দশটা নাগাদ ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ এবং বাংলা কংগ্রেসের সুকুমার রায় গোপন আলোচনায় বসলেন ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে। সারাদিনে যত গুজব শুনেছেন একে অপরকে সব বললেন। বললেন ত্রিদিব-বাবুদের প্রস্তাবের কথা, যুগান্তরের খবরের প্রসঙ্গও। দুজনেই তখন মোটামুটি ধরে নিয়েছেন যে, সি. পি. আই-র জাতীয় নেতৃত্ব ভেতরে ভেতরে সি. পি. এমের সঙ্গে একটা কোনও রফা করে ফেলেছেন। দুজনের কাছেই তখন প্রশ্ন, এই অবস্থায় কী করা?

সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁরা ফোনে হঠাৎ বিশ্বনাথবাবুকে পেয়ে গেলেন এবং বিশ্বনাথবাবুর কাছে যা শুনলেন, তাতে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। বিশ্বনাথ-বাবু বললেন: এটা সত্যি যে আমাদের নেতারা দিল্লি থেকে আসছেন। তবে কেন আসছেন আমরাও সঠিক জানি না। ওঁরা এসে যদি সি. পি. এমের সঙ্গে রফা করার জন্য তোমাদের প্রেসার দেয় তো তোমরাও উল্টো প্রেসার দিও। কিছু যেন ছেড়ে দিও না।

এদিক থেকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা কী করবেন?

এইবার বিশ্বনাথবাবু ঢোক গিলে বললেন: বুঝতেই তো পারছ আমাদের নেতারা আসছেন, আমাদের পক্ষে কি বেশী বলা সম্ভব![১৫]

অশোক ঘোষ এবং সুকুমার রায় দুজনেই বুঝলেন অবস্থা খারাপ। তখন

---

[১৫] অশোক ঘোষ। সাক্ষাৎকার ২২-৭-৭০। সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার। ১৮-৭-৭০।

তাঁরা দুজনেই ঠিক করলেন যে, রফা যদি করতেই হয় তো, সরাসরি সি. পি. এমের সঙ্গেই করবেন—সি. পি. আই নেতাদের খবরদারী মানবেন না। দুজনেই তখন ছুটলেন বসন্ত বোস রোডে বাংলা কংগ্রেস অফিসে সুশীল ধাড়ার সঙ্গে পরামর্শ করতে। সুশীল ধাড়াও যুগান্তরে টেলিফোন করলেন। তিনিও শুনে খাপ্পা যে, সি. পি. আই নেতারা কলকাতা আসছেন সি. পি. এম-কে পুরো স্বরাষ্ট্র দফতর পাইয়ে দেওয়ার জন্য। সেইখানে তাঁরা আবার সিদ্ধান্ত নিলেন, রফা যদি করতে হয় তো সোজাসুজি সি. পি. এমের সঙ্গে করব—সি. পি. আই-র মাধ্যমে যাব কেন।

সেই মত সুকুমার রায় তখনই ফোন করলেন সি. পি. এমের সরোজ মুখার্জীকে। সরোজ মুখার্জীর সঙ্গে সুকুমার রায়ের কলেজ জীবন থেকেই বন্ধুত্ব। সুকুমার রায়ের ফোন পেয়েই সরোজবাবু বললেন : না, হোমের কিছু ছাড়তে পারব না। মাফ করবেন। সুকুমার রায় জবাব দিলেন : ছাড়তে বলছে কে। কথা বলতে আপত্তি কেন। তখনই ঠিক হল, পরদিন ভোর সাতটায় সুকুমার-বাবু সরোজ মুখার্জীর বাড়ি যাবেন।[১৬]

রাত তখন সাড়ে বারোটা। অজয়বাবু তখনও এর কিছুই জানেন না।

পরদিন অর্থাৎ ২০শে সকাল সাতটায়ই সুকুমার রায় সরোজ মুখার্জীর বাড়ি গিয়ে পেঁছলেন। সুকুমারবাবু জানালেন যে, তাঁরা স্বরাষ্ট্র (পুলিস ও প্রশাসন) জ্যোতিবাবুকে ছাড়তে রাজী। সরোজবাবু প্রমোদ দাশগুপ্তকে টেলিফোন করলেন। ঠিক হল প্রমোদবাবুর ফ্লাটে ন'টা নাগাদ সুশীল ধাড়া এবং সুকুমার রায় যাবেন। সরোজবাবুও উপস্থিত থাকবেন।

ন'টায় সেই বৈঠকে সব রফা হয়ে গেল। প্রায় পুরো স্বরাষ্ট্র দফতরটাই সি. পি. এম পেলেন। শুধু স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) মুখ্যমন্ত্রীর জন্য থাকল। সুশীল ধাড়া এবং প্রমোদ দাশগুপ্তে সেদিন নিবিড় বন্ধুত্ব। দুজনেই সি. পি. আই-কে শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু তখনও কিছু জানেন না। সুশীলবাবুই প্রস্তাব করলেন, সবটা বুঝিয়ে বলার জন্য এবং অন্যান্য দফতরের ব্যাপারে আরও আলোচনার জন্য সি. পি. এম নেতারা চলুন অজয়বাবুর ফ্লাটে।

প্রমোদবাবু সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন : বিকেল তিনটায় জ্যোতিবাবুরা গিয়ে সব সেটেল করে আসবেন। অন্য কাজ আছে বলে আমি নিজে যেতে পারব না।

প্রমোদবাবুর ফ্লাট থেকে বেরিয়ে এসে সুকুমার রায় প্রথমেই সবটা জানালেন অশোক ঘোষকে। টেলিফোনে। তারপর সুশীলবাবু এবং তিনি ছুটলেন বেলভেডিয়ারে অজয়বাবুকে সব জানাতে।

রফার এই খবর শুনে অজয়বাবু তো অবাক। প্রথমেই জানতে চাইলেন, ফরওয়ার্ড ব্লক রাজী হয়েছে? ওঁরা জানালেন, হ্যাঁ, অশোক ঘোষ সব জানে।

---

[১৬] সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ১৮-৭-৭০।

সি. পি. আই-র জাতীয় নেতারা কলকাতা এসেই দলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানলেন। বুঝলেন, তাঁদের তেমন আর কিছুই করার নেই। তবু তাঁরা অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সি. পি. এমের সঙ্গে রফার কথা মুখেও তুললেন না। শুধু বললেন : আপনারা যে নীতির লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তা চালিয়ে যান। আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছি।

তাঁদের কথা শুনে অজয়বাবু আবার কিছুটা অবাক হলেন—তাহলে কি যুগান্তরের খবর ভুল ছিল!

ইতিমধ্যেই সি. পি. এম নেতারা এসে হাজির। ওঁদের ঢুকতে দেখেই সি. পি. আই-র কর্তারা উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক তিনটের সময় সি. পি. এম ও বাংলা কংগ্রেসে আলোচনা সুরু হলো। তখন দুপক্ষে বেশ ভাই-ভাই ভাব। সুকুমার রায় এবং সরোজ মুখার্জী দুজনেই প্রস্তাব করলেন, তাহলে অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু একা বসে নিজেদের মধ্যে কিছুটা কথাবার্তা বলে নিন, মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ বোঝা-পড়া একান্ত প্রয়োজন। জ্যোতিবাবুও বিশেষ উৎসাহে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। আসলে সুকুমারবাবুরা আগেই এই প্রস্তাবে সি. পি. এম-কে রাজী করিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের অনুরোধটা ছিল এই রকম : জ্যোতিবাবু নিজে যদি একটু অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে ভুল-বোঝাবুঝি অনেকটা দূর হয়ে যাবে। দুজনের সম্পর্ক মধুর হবে। কাজেও সুবিধা হবে। জ্যোতিবাবুরা সে প্রস্তাবে সোৎসাহে সায় দিলেন। তাঁদেরও তখন লক্ষ্য অজয়বাবুকে সি. পি. আই-র প্রভাব থেকে সরিয়া আনা।

অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু পাশের ঘরে গিয়ে আলোচনায় বসলেন। সেই আলোচনা সম্পর্কে অজয়বাবুর বিবরণ : জ্যোতিবাবু বললেন : আপনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ভাল কথা। আমরাও তাই-ই চেয়েছিলাম গোড়া থেকেই। তবে আমার পারটির সিদ্ধান্ত ছিল স্বরাষ্ট্র চাই। সেই জন্যই দেরী হল। গোড়ায়ই মিটমাট হতে পারত যদি না মাঝখান থেকে কিছু লোক ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি করত। হোমের ব্যাপারে যা কিছু করার আমি সব সময় আপনাকে পরামর্শ করে করব। অর্থাৎ কার্যত আপনিই হোম চালাবেন আর আমি পারটিকে সন্তুষ্ট করব যে, আমার হাতে হোম আছে।[১৭]

জ্যোতিবাবু অবশ্য বলেন, এমন কোনও কথা তিনি অজয়বাবুকে বলেননি।

দুপুরেই মিটমাটের খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। প্রথম ছেপে বের হল সি. পি. এমের দৈনিক গণশক্তিতে। দুপুরেই। অজয়বাবু-জ্যোতিবাবু সাক্ষাৎ-কারেরও আগে। বামপন্থী মহলে বিরাট উৎসাহ। যদিও সি. পি. আই বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ। কূলে এসে তাঁদের তরী ডুবে গেল!

---

[১৭] অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সেই স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতেই আবার যুক্তফ্রণ্টের বৈঠক বসল। একেবারে অন্য আবহাওয়া। বিচ্ছেদের পর মিলন। পরিবেশটা ভাই-ভাইয়ের চেয়েও বেশি। দোতলায় বৈঠক, নীচতলায় আমরা রিপোরটাররা অপেক্ষমান। গৃহস্বামী স্নেহাংশুকান্ত বললেন : পাঁজিপুথি দেখে নিয়েছি, আজকের বৈঠক ভাল সময়েই বসেছে; ফল ভাল হবে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে অজয়বাবু নেতা এবং জ্যোতিবাবু উপনেতা নির্বাচিত হয়ে গেলেন। অজয়বাবুর নাম প্রস্তাব করলেন জ্যোতিবাবু। সমর্থন করলেন ত্রিদিব চৌধুরী। জ্যোতিবাবুর নাম প্রস্তাব করলেন অজয়বাবু। সমর্থন করলেন যতীন চক্রবর্তী।

সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর পেঁছে দেওয়া হল নীচতলায়। অনুরোধও ছিল একটা, যেন রেডিওর সন্ধ্যের বুলেটিনেই খবরটা বলা হয়। সাড়ে সাতটা বাজতে তখন মিনিট দশেক বাকি। সাড়ে সাতটার বুলেটিনেই খবরটা শোনা গেল।

প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে নেতা এবং উপনেতা নির্বাচিত হওয়ার পরই মন্ত্রিসভার গঠন নিয়ে আলোচনা সুরু হল।

প্রথমেই প্রশ্ন এল, মন্ত্রিসভার আকার কী হবে? বড় বড় দলগুলির সকলেরই নীতিগত বাসনা, মন্ত্রিসভা ছোট হোক। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল ছোটদলগুলিকে নিয়ে। একেবারে ছোট দলগুলি থেকেও একজন করে মন্ত্রী তো নিতেই হয়! তখন আবার এল প্রোপোরসনের প্রশ্ন। বড় দলগুলি বললেন, দলগত এম. এল. এ-র হারে মন্ত্রিসভায় দলীয় আসন ঠিক হোক। আর. এস. পি-র আবার একটা বাড়তি সংকট ছিল। তাঁদের দল থেকে দুজন মন্ত্রী না নিলে যতীন চক্রবর্তীর আসা কঠিন। অথচ জ্যোতিবাবু চান, যতীনবাবু ক্যাবিনেটে আসুন। সুতরাং সবাই বুঝলেন, নীতিগত সিদ্ধান্ত যাই থাক, কার্যত মন্ত্রিসভাটা বড়ই করতে হবে। ত্রিশ বত্রিশের কমে হবে না। ঠিক হল তাই হবে। এও ঠিক হল প্রত্যেক দল থেকেই মন্ত্রী হবেন। মায় বলশেভিক পারটি থেকে—যে দলের একজনও এম. এল. এ নেই।

দফতর বণ্টনের ব্যাপারে দুপুরেই সি. পি. এম এবং বাংলা কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। দুদলই বড় বড় দফতরগুলি সব নিজেদের ভাগে ফেলেছিলেন। এর ফলে সি. পি. আই পড়লেন সবচেয়ে বেশী ফাঁপড়ে। তাঁদের সোমনাথবাবুর জন্য বড় কোনও দফতর নেই! বিশ্বনাথবাবু বহু অনুরোধ উপরোধ করে অজয়বাবুর হাত থেকে উন্নয়ন দফতরটা চেয়ে নিলেন সোমনাথ লাহিড়ির জন্য। সি. পি. এম অজয়বাবুকেই উন্নয়ন দফতর দিয়ে দিয়েছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক বড় দফতর বলতে শুধু কৃষি পেলেন। সুশীল ধাড়ার সাহায্যে তারও দুটো অংশ বের করে নিলেন বিশ্বনাথবাবু : নিজের জন্য ক্ষুদ্র সেচ এবং সুশীল ধাড়ার জন্য অ্যাগ্রো-ইনডাসট্রিজ।

মন্ত্রিসভার আকার এবং দফতর বণ্টনের ব্যাপারে পুরোপুরি ফয়সালা কিন্তু

সেদিনই হতে পারল না। পরদিন আবার বৈঠক বসল। সেখানে এস. ইউ. সি এবং এস. এস. পি-র প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বড়রা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করলেন।

মন্ত্রিসভার ভাগাভাগিটা এই রকম দাঁড়াল : সি. পি. এম ৯, বাংলা কংগ্রেস ৪, সি. পি. আই ৪, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩, আর. এস. পি ২, এস. ইউ. সি ও এস. এস. পি পূর্ণ মন্ত্রী ১ এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী ১, লোকসেবক সংঘ, ওয়ারকার্স পারটি, গোর্খা লীগ ও আর. সি. পি. আই ১ জন করে পূর্ণ মন্ত্রী এবং বলশেভিক পারটি ও মারকসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ১ জন করে রাষ্ট্রমন্ত্রী। বিদ্রোহী পি. এস. পি গোষ্ঠী তখনও গঠিত হয়নি। ফ্রণ্টে তখনও তেরো দল।

সবাইকেই অবশ্য পূর্ণ মন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন ফ্রণ্টের নেতারা। কিন্তু তা হল না রাম চ্যাটার্জীর জন্য। হরেকৃষ্ণ কোঙার বললেন, রাম চ্যাটার্জীকে মন্ত্রী করতে তাঁদের আপত্তি আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সি. পি. এম ও নিয়ে বেশি বাধা দিলেন না। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে রাম চ্যাটার্জীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বহুদিন থেকেই খুব ভাল। ঠিক হল রামবাবু মন্ত্রী হবেনই—তবে পূর্ণ মন্ত্রী নয়, রাষ্ট্রমন্ত্রী। এটারও আবার একটা নীতিগত রূপ দেওয়া হল! যাঁদের মাত্র একজন এম. এল. এ বা কোনও এম. এল. এ নেই তাঁরা পাবেন রাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব। সেই নীতিতে পড়ে গেলেন বলশেভিক পারটিও—কারণ তাঁদের একজনও এম. এল. এ ছিলেন না।

এস. এস. পি কিন্তু একজন পূর্ণ ও একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাগটা মানতে রাজী হলেন না। তাঁরা অন্তত দুজন পূর্ণমন্ত্রী চাইলেন। বললেন, না হলে আমরা মন্ত্রিসভায়ই যোগ দেব না।

এস. ইউ. সি দফতর বণ্টন এবং মন্ত্রী ভাগাভাগি দুটো নিয়েই চটলেন। তাঁরা সুবোধবাবুর জন্য শ্রম দফতর চাইলেন। আর একটা পূর্ণ মন্ত্রিত্বও দাবি করলেন। কিন্তু কোনটাই পেলেন না। দলের চিফ নেগোসিয়েটর নীহার মুখার্জী একে একে ফ্রণ্টের সব নেতাকে বললেন : আপনারা নিশ্চয়ই নীতিগত দিকটা ভেবে দেখবেন। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতিটা বিচার করবেন। জনগণের কাছে বিগত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার প্রতিশ্রুতির কথাও নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে।

কিন্তু কেউই কিছু করলেন না। সি. পি. এম শ্রম বা খাদ্য দফতর ছাড়তে কিছুতেই রাজী হলেন না। এস. ইউ. সি-কে দুজন পূর্ণ মন্ত্রী দিতেও অনেকেরই আপত্তি।

সুকুমার রায় তখন নীহার মুখার্জীকে পরামর্শ দিলেন : মশাই, ওসব সামগ্রিক পরিস্থিতি-টিতি ভুলে যান, এটা হল জোচ্চোরের বাড়ির ফলার, আগে এসে খেয়ে যেতে পারলেন তো পেলেন, দেরি করলে কিছুই পাবেন না।[১৮]

এস. ইউ. সি আর বসে থাকলেন না। এস. এস. পি কিন্তু বসেই থাকলেন। কারণ, তখন তাঁদের ভেতরের ঝগড়াও চরমে। জোচ্চোরের বাড়ির ফলার তাঁদের ভাগ্যে আর জুটলই না।

---

[১৮] সুকুমার রায়। সাক্ষাৎকার ১৮-৭-৭০।

দিল্লির সঙ্গে লড়াই

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ নিলেন ২৫শে ফেব্রুয়ারি।

কেউ কেউ মনে করেছিলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের ঝগড়াঝাটির ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ইতিমধ্যেই কিছুটা কমে গিয়েছে। মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ার দিন কিন্তু দেখা গেল যে, আশংকা অমূলক। হাজার হাজার মানুষ এসে জড় হলেন রাজভবন আর রাইটারস বিলডিংসের চতুর্দিকে। এত ভিড় যে, শপথ নিয়ে রাজভবন থেকে রাইটারসে পৌঁছতেই মন্ত্রিদের প্রাণ বেরিয়ে গেল। ভিড়ের চাপে কয়েকজন মন্ত্রীর জামা-কাপড়ও ছিঁড়ে গেল। প্রতিভা মুখার্জী তো ছিটকেই গেলেন। কিছুতেই রাইটারসের গেটের কাছাকাছি এগোতে পারছিলেন না। একজন রিপোর্টার তাঁকে কোনও মতে নিয়ে এলেন গেট পর্যন্ত। তারপর পুলিস নিয়ে গেলেন দোতলায়।

বলাবাহুল্য এত লোক দেখে এবং এত জয়ধ্বনি ও হাততালির মধ্যে দাঁড়িয়ে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী এবং নেতারা প্রবল উৎসাহিত হলেন। দুদিন আগে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের বিশাল জনসভাও তাঁদের মনে বিরাট আশার সঞ্চার করেছিল। দিন দশেক তাঁরা নিজেদের ঝগড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারপর আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই মনে পড়ল, বহু আশা করে এই সব মানুষই তাঁদের আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

ময়দানের জনসভায় তাই প্রতিশ্রুতি দিলেন ফ্রন্টের নেতারা : আমরা নতুন বাংলা গড়ার শপথ নিয়েছি। আমরা সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করে যাব।

নতুন করে আবার রাইটারস বিলডিংসে বসেও তাই বললেন নেতারা। অজয়বাবুকে রিপোর্টাররা জিজ্ঞেস করলেন, কী কী করতে চান আপনারা? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন : আমাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে তা আমাদের আরও সজাগ করেছে। জনসাধারণের মনে যে আশা জেগেছে আমরা কাজ করে তার কিছুটা যদি পূর্ণ করতে পারি তবেই সে আশা সফল হবে—এ জয় সার্থক হবে।

জ্যোতিবাবু বললেন : আজ থেকে কাজ সুরু হল। আমরা যোগ্য হবার চেষ্টা করব। মানুষ যা আশা করেন তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করব।[১]

এ তো যুক্তফ্রন্টের হয়ে ঘোষণা, যুক্তফ্রন্টের নেতা বা মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি। পারটিগত ভাবে কিন্তু অন্য কথা বলা হল। যাঁরা নিজেদের মারকসবাদী দল

---

১ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬-২-৬৯।

বলে দাবি করেন বিশেষভাবে তাঁরাই বেশ কিছুটা ভিন্নসুরে কথা বললেন।

সবচেয়ে বেশী ভিন্ন সুর ঠেকল সি. পি. এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের কথায়। বললেন : গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্যই আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ নিয়েছি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। আমাদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র এবং সেজন্য প্রয়োজন রক্তাক্ত বিপ্লব। সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ ধরে আমরা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংঘাত এমন একটা স্তরে নিয়ে যেতে চাই যেখানে সেই রক্তাভ বিপ্লবের সূচনা হবে।...আমরা একটা সংগ্রামকে পেরিয়ে আসতে পেরেছি। সামনে বৃহত্তর সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম হচ্ছে দেশের বৃহত্তর আন্দোলনকে তীব্রতম করা। এখন আমাদের লড়তে হবে জোতদার, জমিদার, একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। জনগণের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা।[২]

প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই দেখা গেল প্রমোদবাবুর লাইনেই সরকার এগোচ্ছেন। ক্যাবিনেট প্রথম দিনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। তার সবগুলিরই মূল উদ্দেশ্য "গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করা।"

দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক হল ২৭শে ফেব্রুয়ারী। সেই বৈঠকের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি :

(১) নিবারক নিরোধ আইনে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে।

(২) 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন' সম্পর্কে পুলিস অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের কেসগুলি পর্যালোচনা করা হবে। যাঁরা রাজনৈতিক কারণে আটক হয়েছেন বা যাঁদের বিরুদ্ধে পুলিস কেস হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি তুলে নেওয়া হবে।

(৩) নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত বিচারাধীন বন্দীদের উচ্চতর শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করা হবে।

(৪) ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের আন্দোলন সম্পর্কে যাঁদের বিরুদ্ধে পুলিস কেস হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি তুলে নেওয়া হবে।

(৫) যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অপসারণের পর পুলিসী নির্যাতনের অভিযোগগুলি সম্পর্কে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[৩]

এ তো গেল একটা দিক। আরও একটা দিক সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল। সেই দিকটা কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইয়ের, দিল্লির বিরুদ্ধে 'সংগ্রামের'।

রাজ্যপালকে নিয়ে আগে থেকেই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের দারুণ একটা ঝগড়া চলছিল। প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার বরখাস্ত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বামপন্থী নেতারা সবাই ধর্মবীরের উপর মহাখাপ্পা ছিলেন। তখন থেকেই তাঁদের দাবি ছিল : ধর্মবীরকে হটাও।

---

[২] আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭-২-৬৯।

[৩] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮-২-৬৯।

স্বভাবতই নির্বাচনে বিরাট বিশাল সাফল্যের পর যুক্তফ্রন্ট প্রথমেই দাবি তুললেন, ধর্মবীরকে অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে। বললেন, যে লোক চক্রান্ত করে আমাদের গদীচ্যুত করেছিলেন তাঁকে কিছুতেই আর কলকাতা থাকতে দেওয়া হবে না।

কেন্দ্র কিন্তু তাঁদের সে দাবি মানতে রাজী হলেন না। দিল্লির কর্তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, কারু দাবির কাছে নতিস্বীকার করে আমরা রাজ্যপালকে সরাবো না; আর গোপনে ফ্রন্টের নেতাদের বলে পাঠালেন, বেশী হইচইর প্রয়োজন নেই, কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মবীরকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

কিন্তু বামপন্থীরা তাতে ছাড়বেন কেন! অজয়বাবু নিজে অবশ্য ধর্মবীর প্রসঙ্গে খুব বেশি মাতামাতির বিরুদ্ধে ছিলেন। তবে, তাঁর কথা কে শোনে। সাচ্চা বামপন্থীরা কবেই বা এমন একটা মওকা ছেড়েছেন! কেন্দ্র গোপনে গোপনে যত নরম নরম কথা বলেন, ওঁরা প্রকাশ্যে ততই হুঙ্কার দেন। আবার এ'রা যত হুঙ্কার দেন কেন্দ্রের তত মুসকিল বাড়ে—চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছেন এটাই বা তাঁরা দেখান কি করে!

এই অবস্থায় ফ্রন্টের কয়েকজন নেতা প্রস্তাব করলেন : তাহলে আসুন আমরা বলি, এই রাজ্যপালের কাছে শপথ নেব না।

যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন : সে কি ছেলেমানুষী! এ যে চোরের উপর রাগ করে থালায় ভাত না খাওয়ার মত বোকামো ! বললেন : অনেক পথ আছে কেন্দ্র এবং রাজ্যপালকে জব্দ করার। আগে আমরা রাইটারস বিলডিংসে বসি, তারপর দেখাবো মজাটা।

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই কেন্দ্র ও ধর্মবীরকে জব্দ করার একটা জবরদস্ত পরিকল্পনা দিলেন সোমনাথ লাহিড়ি। প্যাঁচে তাঁর জুড়ি নেই। তিনি বললেন : বিধানসভার অধিবেশন উদ্বোধন করতে হবে রাজ্যপালকে। সেই অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ পাঠ করবেন তা রচনা করে দেবে মন্ত্রিসভা। সুতরাং আসুন আমরা মন্ত্রিসভা থেকে এমন একটা ভাষণ তৈরী করে দেই যে ভাষণে রাজ্যপালের ক্রিয়াকলাপেরই নিন্দা থাকবে। রাজ্যপাল তা পড়তে বাধ্য।

মন্ত্রিরা সবাই "বাহবা" বলে সোমনাথবাবুর প্রস্তাবটা লুফে নিলেন।

অন্যদিকে প্রকাশ্যেও তাঁরা রাজ্যপালকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি অব্যাহত রাখলেন। সভা সমিতিতে ধর্মবীরের শ্রাদ্ধও চলতে থাকল। ২রা মার্চ গোটা মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে টেলিগ্রাম করা হল : ৬ই মার্চের মধ্যে রাজ্যপালকে সরিয়ে নিন।

৬ তারিখই নতুন রাজ্য বিধানমন্ডলীর অধিবেশন সুরু হওয়ার কথা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চবন জবাব দিলেন দিল্লিতে : না, ৬ই মার্চের মধ্যে ধর্মবীরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।

যুক্তফ্রন্টের নেতারাও জানতেন যে, ৬ তারিখের ভেতরে দিল্লি রাজ্যপালকে ফিরিয়ে নেবেন না। তাই, বাইরে তাঁরা যাই বলুন, যে সব দাবিই তুলুন, ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমেই রাজ্যপালকে অপমান করতে।

খবরের কাগজে কাগজেও জল্পনাকল্পনা সুরু হয়ে গেল এই ব্যাপারটা নিয়ে। সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা উঠল : রাজ্যপাল যদি মন্ত্রিসভা রচিত ভাষণটা পড়তে রাজী না হন তাহলে কি হবে?

এব্যাপারে রীতিটা এইরকম : বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন কেন ডাকা হয়েছে উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যপাল তা বলবেন। সরকার কী কী করতে চান, ইতিমধ্যে কী কী করেছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি বলা হয় সেই ভাষণে। কথাগুলি বলেন রাজ্যপাল, কিন্তু আসল বক্তব্য সরকারের অর্থাৎ মন্ত্রিসভার। ভাষণ তৈরী করেন মন্ত্রিসভা। খসড়াটা পাঠিয়ে দেন রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল তা দেখে ফেরত পাঠান। তারপর সরকার তা ছাপতে দেন। রাজ্যপাল সেই মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন। বিধানমণ্ডলীর সদস্যদেরও সেই মুদ্রিত ভাষণ দেওয়া হয়। এ নিয়ে কোনও দিনই মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাজ্যপালের কোনও ঝগড়া হয়নি।

কিন্তু এবার যখন ঝগড়াটা সুরু হল তখনই প্রশ্ন দেখা দিল, রাজ্যপাল যদি মন্ত্রিসভার তৈরী পুরো ভাষণটা পড়তে রাজী না হন? তাহলে? তাহলে কী হবে?

যুক্তফ্রন্টের নেতারা এবং মন্ত্রিরা বললেন : রাজ্যপাল গোটা ভাষণটাই পড়তে বাধ্য। এব্যাপারে সংবিধান তাঁকে কোনও স্বাধীনতা দেয়নি। মন্ত্রিসভা যা যা লিখে দেবেন তার সবটাই তাঁকে পড়তে হবে। কোনও অংশ বাদ দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু অন্য রকম রায় দিলেন। তাঁরা বললেন: সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলতেই বাধ্য। কিন্তু যদি কোনও মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের মুখ দিয়েই রাজ্যপালের নিন্দা করাতে চান, তাহলে রাজ্যপাল তা করতে বাধ্য নন। সেইজন্য মন্ত্রিসভা রচিত ভাষণের যে অংশে রাজ্যপালের বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের নিন্দা থাকবে রাজ্যপাল তা পড়বেন না, সেটা তিনি বাদ দিয়ে যাবেন।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই কথাগুলি প্রকাশ্যে বললেন না। কথাটা পরোক্ষে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিদের জানিয়ে দিলেন। আর জানালেন রাজ্যপালকে এবং তাঁকে সেই মতই চলতে বললেন।

কিন্তু কথাগুলি তাঁরা প্রকাশ্যে না বললেও তাঁদের বক্তব্য খবরের কাগজে বের হল।

এই সময় সি. পি. এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের একটা হুংকার পরিস্থিতিটাকে আরও জটিল করে তুলল। প্রমোদবাবু ঘোষণা করলেন : রাজ্যপাল যদি পুরো ভাষণ পড়তে রাজী না হন, যদি তার কোনও অংশ বাদ দেন, তাহলে তাঁকে ঘেরাও করা হবে। যতক্ষণ সেই বাদ দেওয়া অংশটা না পড়বেন ততক্ষণ এম. এল. এ-রা তাঁকে ঘেরাও করে বিধানসভার মধ্যেই আটকে রাখবেন।[৪]

---

[৪] আনন্দবাজার পত্রিকা ৪-৩-৬৯। প্রমোদবাবু এই সঙ্গে আরও বললেন : আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতাম তাহলে ধর্মবীরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক চবন কলকাতা নামামাত্র সমাজবিরোধী ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে পি. ডি. অ্যাকটে গ্রেফতার করতাম।

খবরের কাগজে প্রমোদবাবুর এই বক্তব্য দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির। কেন্দ্রের কর্তারা আতংকিত হয়ে উঠলেন। সংগে সংগে কলকাতায় জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কী? বেশ কিছুটা বিস্মিত হলেন ফ্রণ্টের বহু মন্ত্রীও। তাঁরা বললেনঃ এমন কোনও সিন্ধান্ত তো যুক্তফ্রন্ট নেয়নি। তাহলে প্রমোদবাবু কথাটা বললেন কি করে?

সবাই গিয়ে ধরলেন জ্যোতিবাবুকেঃ সত্যিই কি আপনারা রাজ্যপালকে ঘেরাও করবেন? আটকে রাখবেন?

জ্যোতিবাবু ঢোক গিলে বললেন ঃ না, না, ওরকম কোনও সিন্ধান্ত আমরা করিনি।

দিল্লির কর্তারা কিন্তু তখনও জ্যোতিবাবুর এই আশ্বাসবাণী শোনেননি। তাঁরা জরুরী বৈঠক করলেন। তারপর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীকে। জানালেন, কেন্দ্রীয় সরকারই রাজ্যপালকে বলেছেন আপত্তিজনক অংশ বাদ দিয়ে ভাষণ পড়তে। অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে ঘেরাও না করা হয়। এমনও বুঝিয়ে দিলেন যে ঘেরাও করে রাজ্যপালকে আটক রাখার চেষ্টা করলে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সৈন্যবাহিনী গিয়ে তাঁকে মুক্ত করে আনবেন।

এই ঘটনা ৪ঠা মারচের। ৫ই রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে জানালেন যে তাঁদের রচিত খসড়ার সবটা তিনি পড়তে রাজি নন। কোন্ কোন্ অংশ তিনি পড়তে অরাজী তাও জানালেন।

৬ই বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন বসল। প্রবল উত্তেজনা। কী হয় ভাব। রাজ্যপালকে ঘেরাও যে করা হবে না সেটা আগের দিনই জানা গিয়েছিল। কিন্তু তবু মন্ত্রীরা বলেছিলেন, জোরদার একটা প্রতিবাদ তাঁরা জানাবেনই। কী ধরনের প্রতিবাদ তাঁরা জানান সেইটা দেখার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সবাই।

ঘড়ি ধরে ধর্মবীর এলেন। যথাবিহিত শোভাযাত্রা সহকারে তিনি সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। যুক্তফ্রণ্টের এম. এল. এ-রা সবাই একযোগে শ্লোগান তুললেন ঃ ধর্মবীর ফিরে যাও।

ধর্মবীর কিন্তু ফিরে গেলেন না। তিনি আসনে গিয়ে ভাষণ পড়তে সুরু করলেন এবং পূর্ব সিন্ধান্তমত মন্ত্রিসভা রচিত ভাষণের দুটি প্যারা বাদ দিয়ে গেলেন। সেই অংশে প্রথম ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার জন্য রাজ্যপালেরই সমালোচনা করা হয়েছিল।

সংগে সংগে দাঁড়িয়ে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবাদ জানালেন। বাদ দেওয়া অংশটা পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ধর্মবীর কিন্তু থামলেন না। তিনি পড়ে চললেন এবং পাঠ শেষ হতেই আবার শোভাযাত্রা সহকারে বেরিয়ে গেলেন। যুক্তফ্রণ্ট এম. এল. এ-রা আবার ধর্মবীর বিরোধী শ্লোগান দিলেন।

পরে, রীতি অনুসারে ভাষণের জন্য রাজ্যপালকে ধন্যবাদ দিয়ে সরকার পক্ষ যে প্রস্তাব আনলেন তাতেও এই ঘটনার উল্লেখ করা হল।

পরদিন সকালেই মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাত্রা করলেন। একই প্লেনে

দিল্লি গেলেন রাজ্যপাল ধর্মবীরও।

মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যে দিল্লি যাবেন এ সিম্ধান্ত ক্যাবিনেট আগেই নিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে মন্ত্রিসভার নির্দেশেই তাঁরা দিল্লি যাচ্ছিলেন। কেন দিল্লি যাত্রা সে কথাও অজয়বাবু সাংবাদিকদের বলেছিলেন। বলেছিলেন, "আমরা পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনেক বেশী টাকা চাই। অনেক বেশী চাল ও খাদ্যশস্য চাই। এবং এইজন্যই দিল্লি যাচ্ছি।"[*]

দিল্লিতে কিন্তু তাঁদের প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়াল ধর্মবীরের অপসারণ। মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর কাছেও সেই দাবি পেশ করলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করলেন, ধর্মবীরকে কেন্দ্র ফিরিয়েই নেবে। তবে, এ নিয়ে বেশী হইচই করলেই আসল কাজে দেরী হয়ে যাবে। তিনি তাঁদের অনুরোধ জানালেন, আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সম্পাদোষে না গুণে বলা মুস্কিল, অজয়বাবুর কণ্ঠেও তখন বেশ কিছুটা কেন্দ্রবিরোধী সুর। দুই নেতার গমন উপলক্ষে দিল্লিতে জনসভার আয়োজন করা হল। সেই সভায় অজয়বাবু বললেন ঃ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ১৯৬৭ সনের মত ব্যবহার করা হলে তাঁরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান। কিন্তু কোনও রকম অন্যায় বরদাস্ত করবেন না।

জ্যোতিবাবু দিল্লিতে খুব বেশী কিছু বললেন না। তিনি সবটা তুলে রাখলেন দলের কলকাতার জনসভার জন্য। ৯ই মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিরাট জনসভা করলেন সি. পি. এম। সেই সভায় জ্যোতিবাবু বললেন ঃ দেশ রক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর উন্নতি ছাড়া আর সব ক্ষমতা রাজ্যের হাতে দিতে হবে। এজন্য সংবিধানও সংশোধন করতে হবে।[*]

অজয়বাবু কিন্তু ঠিক এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এ দাবির সমর্থকও নন। থমকে দাঁড়ালেন। কলকাতা ফিরেই রিপোর্টারদের বললেন ঃ দিল্লির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমরা ঝগড়া করতে চাই না। ওঁরাও চান বলে মনে হয় না। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহানুভূতির মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

ঠিক এরই কয়েকদিন পরে কেন্দ্রের সঙ্গে একটা লড়াই পাকিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং সি. পি. আই-কে জব্দ করার জন্য সি. পি. এম আর একটা ইস্যু নিয়ে এলেন। সেই ইস্যুটা রাজ্য বিধান পরিষদ বিলোপের। সি. পি. এমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী হঠাৎ একদিন ঠিক করলেন ঃ রাজ্য বিধান পরিষদ তুলে দিতে হবে এবং কাজটা অবিলম্বেই করতে হবে। সেইদিনই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। সম্পাদকমণ্ডলী দলের মন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন, আজই মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবটা পাশ করিয়ে নিতে হবে।

হলও তাই। সেইদিন মন্ত্রিসভার আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে ওটা ছিলও

---

[*] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯-২-৬৯।

[*] আনন্দবাজার পত্রিকা ১০-৩-৬৯।

না। তবু সি. পি. এম মন্ত্রীরা প্রসঙ্গটি তুললেন এবং অন্য সবাইও বেশী আপত্তি না করেই প্রস্তাবটা পাশ করে দিলেন।

না পাশ করে অবশ্য উপায়ও ছিল না। কারণ, যুক্তফ্রণ্টের ৩২ দফা কর্মসূচীর একটা ছিল বিধান পরিষদ বিলোপের প্রতিশ্রুতি। সি. পি. এম সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে বললেন : তাহলে অবিলম্বে বিধান পরিষদ তুলে দেওয়ার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব আনা হোক। নীতিগতভাবে কোনও দলই এই প্রস্তাবে আপত্তি জানাতে পারলেন না। মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবটা পাশ হয়ে গেল।

বিধান পরিষদ তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিটা যুক্তফ্রণ্টের কর্মসূচীর অন্তর্গত হওয়ার পেছনেও একটা ছোট্ট মজার ইতিহাস আছে। ফ্রণ্ট কর্মসূচী রচনার জন্য যে কমিটি গঠন করেছিলেন, তাতে ছিলেন প্রণব মুখার্জী, নির্মল বসু এবং জ্যোতি ভট্টাচার্য। বিধান পরিষদ তুলে দেওয়া হোক, বিধান পরিষদ অপ্রয়োজনীয় এরকম একটা কথা বহুদিন ধরেই নির্মল বসু বলে আসছিলেন—যদিও তিনি নিজেই ছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য। তাই, যুক্তফ্রণ্টের কর্মসূচীতেও এটা তিনি ঢোকাতে চাইলেন। জ্যোতি ভট্টাচার্য কিন্তু তাতে আপত্তি জানালেন। বললেন, ওটা এমন একটা কি জরুরী বিষয় যে কর্মসূচীতে রাখতে হবে? নির্মল বসুও ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন নেতা বললেন, থাক না ওটা ক্ষতি কি—বলা হচ্ছে বলেই যে আজই করা হচ্ছে তা তো নয়। তাই হল। ৩২ দফা কর্মসূচীর ৩১তম দফা হল বিধান পরিষদ বিলোপের প্রতিশ্রুতি।[১] সি. পি. এম, সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি দল যে খসড়া কর্মসূচী ফ্রণ্টের সামনে পেশ করেছিলেন, তাতে কিন্তু পরিষদ বিলোপের কথা ছিল না।

যে মনোভাব নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট কর্মসূচীতে প্রস্তাবটা ঢুকিয়েছিলেন সেই মনোভাব নিয়েই মন্ত্রিসভাও প্রস্তাবটা পাশ করে দিলেন। মূল সুর : বলা হচ্ছে বলেই যে হয়ে যাচ্ছে তা তো নয়। সবাই ধরে নিলেন, রাজ্য বিধানসভায় রাজ্য বিধান পরিষদ লোপের প্রস্তাব ঠিকই পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে রাজি হবেন না। কারণ রাজ্য বিধান পরিষদে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে সংসদে প্রস্তাবটা পাশ হবে না এবং তাই রাজ্য বিধান পরিষদ থেকেই যাবে।

বিধান পরিষদ বিলোপের ব্যাপারে সংবিধানের নির্দেশটা এইরকম : যদি কোনও রাজ্যের বিধানসভার উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে সেই রাজ্যের বিধান পরিষদ বিলোপের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে সংসদ সেই রাজ্যের বিধান পরিষদ তুলে দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট নেতারা ধরে নিলেন, রাজ্য বিধানসভা বিধিমত প্রস্তাবটা পাশ করে দেবেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে তেমন কোনও প্রস্তাব আনবেন না। কারণ, কংগ্রেস দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেই।

সি. পি. এম-এরও সেই ধারণাই ছিল। তাঁরা ঠিক করে নিয়েছিলেন, যে মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকার বলবেন যে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ বিলোপ বিল আনতে অনিচ্ছুক অমনি

---

[১] ১৩-৩-৬৯।

[২] নির্মল বসু। সাক্ষাৎকার ২০-৭-৭০।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ ঘোষণা করবেন।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে উল্টো হয়ে গেল। রাজ্য কংগ্রেস বিধান পরিষদ বিলোপের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারও ঘোষণা করলেন, রাজ্য বিধানসভা যদি তাই চান তাহলে আমরাই বা আপত্তি করব কেন—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ বিলোপ বিল যথাশীঘ্র সম্ভব পাশ করে দেব।

এই অবস্থায় সবচেয়ে অসুবিধায় পড়লেন সি. পি. আই। তাঁদের দলের অন্যতম মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জী ছিলেন রাজ্য পরিষদের সদস্য। আর একজন মন্ত্রী রেণু চক্রবর্তী আবার বিধানসভা বা পরিষদ কোনওটারই সদস্য নন। সি. পি. আই বুঝলেন মন্ত্রী রাখতে হলে এদের দুজনকেই এম. এল. এ করে আনতে হবে। কিন্তু তাতে নানা অসুবিধা। সি. পি. আই নেতারা তাই দিল্লিতে তদবির সুরু করলেন যাতে সংসদে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ বিলোপ বিল পাশে দেরী করানো যায়।

আবার, সি. পি. এম যখন দেখলেন সি. পি. আই-র ঘোরতর বিপদ তখন তাঁরাও বিল পাশের জন্য তাড়াহুড়ো সুরু করে দিলেন। পরিষদীয় দফতরের মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকে তাঁরা অনুরোধ জানালেন যেন তিনি দিল্লি গিয়ে ব্যাপারটা তরান্বিত করেন। যতীনবাবুও সোৎসাহে কাজে লেগে পড়লেন।

বিধান পরিষদ বিলোপে অসুবিধা কিন্তু সি. পি. এমেরও ছিল। তাঁদেরও দুজন মন্ত্রী ছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য। সেই দুজনকে এম. এল. এ করে আনার প্রশ্নও ছিল। সি. পি. এম নেতারা ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছিলেন যে এদের একজন অর্থাৎ আবদুল্লা রসুলকে তাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে নেবেন। তাঁরা জানতেন আর একজন অর্থাৎ সত্যপ্রিয় রায়ের জন্য একটা আসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা অনুমান করলেন, সি. পি. আই-র পক্ষে বিশ্বনাথ-বাবুর জন্য সিট বের করা সম্ভব হলেও রেণু চক্রবর্তীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে—দলের কোনও এম. এল. এ-কেই রেণু চক্রবর্তীর জন্য পদত্যাগ করানো সহজ হবে না। হলও তাই। বিশ্বনাথবাবুর জন্য শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরে একটা আসন পাওয়া গেলেও রেণু চক্রবর্তী বহু তদবির করেও দলের কোনও এম. এল. এ-কে পদত্যাগ করাতে পারলেন না। তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তেই হল। সি. পি. এমের একটা লক্ষ্য পূর্ণ হল।

রাজ্য বিধান পরিষদ বিলোপের ফলে আরও দুজন মন্ত্রীর চাকুরী গেল। তাঁরা হলেন আর. সি. পি. আই-র সুধীন কুমার এবং বলশেভিক পারটির বরদা মুকুটমণি। দুজনেই মন্ত্রী হওয়ার সময় ভেবেছিলেন এম. এল. সি হয়ে মন্ত্রিত্বটা বজায় রাখবেন। যখন মন্ত্রী হলেন তখন তাঁরা না এম. এল. এ না এম. এল. সি। কিন্তু বিধান পরিষদ বিলোপে তার কোনও আশাই রইল না। সুধীনবাবুর দলের দুজন এম. এল. এ ছিলেন। তিনি নানাভাবে তাঁদের চাপ দিলেন যেন পদত্যাগ করে তাঁর জন্য একটা সিট করে দেন। কিন্তু তাতে কোনও সুবিধা তো হলই না, বরং কেলেঙ্কারী বাড়ল। দুজনেই প্রকাশ্যে অভিযোগ করলেন, সুধীন-বাবু তাঁদের ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে পদত্যাগ করাতে চাইছেন।

সে নিয়ে আবার আর এক মহাভারত রচিত হল। সুধীনবাবু বরাবরই সি. পি. এমের প্রিয়পাত্র। তাঁকে সি. পি. এম তো প্রোটেকসন দিলেনই। অন্যদের

কাছ থেকেও তিনি কৌশলে সমর্থন আদায় করে নিলেন। আর. সি. পি. আই-র ঐ দুই এম. এল. এ অনাদি দাস ও মকসেদ আলিকে ফ্রন্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সুধীন কুমারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু সে তদন্ত আর কোনও দিনই হল না। সুধীন কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ অভিযোগই থেকে গেল।

বিধান পরিষদ বিলোপের ব্যাপারে তাই সি. পি. এমের মূল লক্ষ্যটা সফল হল না। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার সুযোগ তাঁরা পেলেন না। যদিও সি. পি. আই-কে নাস্তানাবুদ করার ব্যাপারে তাঁরা বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেন।

ধর্মবীরকে নিয়ে বেশী জল ঘোলা করার সুযোগও এই সময় কেন্দ্র কেড়ে নিলেন।

১৯শে মারচ চবন টেলিফোনে অজয়বাবুকে জানালেন যে তাঁরা লণ্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনার শান্তিস্বরূপ ধাওয়ানকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল করতে চান। অজয়বাবু, জ্যোতিবাবু এবং বিশ্বনাথবাবু পরামর্শ করে রাজ্যপাল পদের জন্য তিনটা নাম দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন। চবন তিনটাই বাতিল করে দিলেন। অজয়বাবুও চবনকে জানালেন যে তিনি ধাওয়ানকে মানতে রাজি নন। জ্যোতিবাবুও অজয়বাবুর সঙ্গে একমত হলেন। তাঁরা দাবি করলেন, ঐ তিনজনের মধ্যে যে কোনও একজনকে রাজ্যপাল করতেই হবে। চবন তাতে কিছুতেই রাজি নন। ইন্দিরাও নন। আসলে ধাওয়ানের নাম প্রস্তাব করেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী অরুণা আসফ আলিকে কলকাতা পাঠালেন যাতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের ধাওয়ানের নামে রাজী করাতে পারেন। ধাওয়ানকে তখন পশ্চিমবঙ্গের কেউই তেমন চিনতেন না। নেতারাও না। অরুণা আসফ আলি তাঁর ব্যাকগ্রাউণ্ড বললেন। জানালেন, ধাওয়ান সাহেব অত্যন্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিও বটে। তাঁকে নিয়ে কোনও অসুবিধা হবে না। অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু তখন রাজি হয়ে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভাকে ধাওয়ানের নাম জানালেন ২২শে মারচ।

২৮শে ধর্মবীর কলকাতা থেকে বিদায় নিলেন। ১লা এপ্রিল (অস্থায়ী) রাজ্যপালরূপে শপথ নিলেন দীপনারায়ণ সিংহ। তিনি তখন কলকাতা হাই-কোরটের প্রধান বিচারপতি। স্থায়ী রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে সাধারণত হাইকোরটের প্রধান বিচারপতিই অস্থায়ী রাজ্যপাল হন।

ধর্মবীরের ইস্যুটা এইভাবে মিটে গেলেও এই সময় একেবারে আচমকা পর পর আর তিনটে ইস্যু এসে হাজির হল। একটা দুর্গাপুরের ঘটনা, আর একটা কাশীপুরের অস্ত্রকারখানায় গুলী চালনা এবং তৃতীয়টা রবীন্দ্র সরোবরে এক জলসায় তাণ্ডবলীলার প্রসঙ্গ। এই তিনটা ইস্যু নিয়েই কলকাতা এবং দিল্লিতে জোর ঝগড়া সুরু হয়ে গেল।

দুর্গাপুরের ঘটনাটা ঘটে ২৪শে মারচ।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সিকিউরিটি ফোর্স পরিবর্তন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউনিয়নের বিরোধ চলছিল। দিল্লির নির্দেশে ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সিকিউরিটি ফোর্স তুলে দিয়ে দুর্গাপুর কারখানার জন্য কেন্দ্রীয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সকে আনছিলেন। কেন্দ্র কয়েক বছর আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বড় বড় কেন্দ্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান পাহারা দেবে কেন্দ্রীয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স। কোনও কারখানারই আর আগের মত নিজস্ব সিকিউরিটি ফোর্স থাকবে না। সেইমত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নিজস্ব সিকিউরিটি ফোর্সও তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে, এই সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়েছিল যে, দুর্গাপুর কারখানার নিজস্ব সিকিউরিটি ফোর্সের যাঁরা যাঁরা যোগ্য বিবেচিত হবেন, তাঁদের কেন্দ্রীয় সিকিউরিটি ফোর্সেই নিয়ে নেওয়া হবে। বাদবাকিকে কারখানায় অন্য কাজ দেওয়া হবে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কমিউনিস্ট প্রভাবিত ইউনিয়ন কিন্তু এই প্রস্তাব মানতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সিকিউ-রিটি ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনই থাকবে, কেন্দ্রীয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সকে আনা চলবে না। দিল্লি তাতে রাজী হতে পারলেন না। তাঁরা কারখানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন, কেন্দ্রীয় ফোর্স বসাতেই হবে। ফলে দুর্গাপুরে উত্তেজনা বাড়ল এবং উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে সি. আর. পি বাহিনী গেল। যুক্তফ্রন্ট যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলেন তখনও কিন্তু দুর্গাপুরে সি. আর. পি মোতায়েন ছিল।

নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সিকিউরিটি ফোর্স মোতায়েনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইস্পাত কারখানার কমিউনিস্ট ইউনিয়ন খুব সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁরা কার্যত প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করে দিলেন। উত্তেজনা আরও বাড়ল। একদিন দুর্গাপুর কারখানার সিকিউরিটি ফোর্সের কিছু কর্মী কারখানার সদর দফতরে অভিযান করলেন। তাঁরা এগিয়ে গেলেন। দফতরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই ফোর্সেরই চিফ অফিসার। তাঁর সঙ্গে ছিল বেশ কিছু সি. আর. পির লোক। সি. আর. পির লোকেরা অভিযানকারী সিকিউরিটির লোকদের বাধা দিলেন। ফলে সংঘর্ষ হল। সি. আর. পি গুলী, লাঠি এবং কাঁদানে গ্যাস চালালো।

ব্যস সুরু হয়ে গেল। একেই দুর্গাপুরে তখন বেশ উত্তেজনা। তারপর এই ঘটনা। কমিউনিস্ট ইউনিয়ন এমনিই বেশ শক্তিশালী। তায় তাঁদের নিজেদের লোকেরা তখন রাজ্য সরকারের পরিচালক। থমথমে ভাব গোটা দুর্গাপুরে। শত শত বিক্ষুব্ধ কর্মী এসে হাজির হলেন সদর দফতরের সামনে। ইউনিয়নের নেতারা দাবি করলেন, গুলী চালনার অপরাধে খোদ চিফ সিকিউরিটি অফিসারকে গ্রেফতার করতে হবে। কারখানার কর্তা ওয়াধেরাকেও ধরতে হবে। না হলে গোটা দুর্গাপুরে আগুন জ্বলবে। জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনিও ইউনিয়নের সঙ্গে একমত হলেন। ওয়াধেরাকে ঠিক গ্রেফতার করা হল না। তবে চিফ সিকিউরিটি অফিসার পালকে গ্রেফতার করে পুলিশ ভ্যানে তোলা হল।

পরদিন পারলামেনটে এই ঘটনা নিয়ে জোর হইচই। কিছু কমিউনিস্ট এম.

পি দাবি করলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি. আর. পি সরাতে হবে। ততক্ষণে কলকাতায় এই দাবি তুলেছেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবাবু। চবন কিন্তু সাফ জবাব দিলেন ঃ পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় পুলিশ থাকবেই। তবে, এব্যাপারে যা নিয়ম তা পশ্চিমবঙ্গেও মানা হবে, রাজ্য সরকার না চাইলে তাঁরা কিছু করবেন না।

কাশীপুর অস্ত্রকারখানার ঘটনাটা ঘটল ৮ই এপ্রিল।

কাশীপুরেও কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউনিয়নের বিরোধ চলছিল। ওই ইউনিয়নও কমিউনিস্ট প্রভাবিত। ঘটনার দিন সকালে কারখানায় ঢোকা নিয়ে ইউনিয়নের কিছু সক্রিয় কর্মীর সঙ্গে কারখানার গার্ডদের ঝগড়া হয়। ঝগড়া থেকে হাঙ্গামা। গার্ডরা গুলী চালালো। ৪জন কর্মী তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। আরও একটি মৃতদেহ পরে উদ্ধার করা হল।

সঙ্গে সঙ্গে কাশীপুরে প্রবল উত্তেজনা। কারখানার সামনে বিরাট জনতার ভিড়। জনতা ও ইউনিয়ন দাবি করলেন, যেসব সেন্ট্রি গুলী চালিয়েছে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করুক। জ্যোতিবাবু ঘটনাস্থলে গিয়েও সেই দাবি সমর্থন করলেন। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন, গার্ডরা সামরিক বাহিনীর কর্মরত কর্মী। পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করতে পারে না। তাঁদের সম্পর্কে যা করার করব আমরা। সাধারণ আদালতেও তাঁদের বিচার হতে পারে না। বিচার হবে সামরিক আদালতে।

পরদিন পারলামেনটে এ ঘটনা নিয়েও জোর হইচই। কমিউনিস্ট এম. পিরা সবাই জ্যোতিবাবুকে সমর্থন করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন করলেন কারখানা কর্তৃপক্ষকে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বর্ণ সিং আবার ঘোষণা করলেন, কাশীপুরের ঘটনা নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। রাজ্য সরকার তাতেও আপত্তি জানালেন। বললেন, রাজ্যে এই রকম কোনও তদন্ত কমিশন বসাবার অধিকার কেন্দ্রের নেই।

১০ই কাশীপুরের ঘটনা নিয়ে বাংলা বন্ধের ডাক দেওয়া হল। রাজ্য সরকারও এই বন্ধের ডাক সমর্থন করলেন। সেই বন্ধ উপলক্ষে আবার কাঁচরাপাড়া এলাকায় দুই দল শ্রমিকে সংঘর্ষ হল। একজন মারাও গেলেন। পুলিশ গুলী চালাল। কারফু হল।

পরদিনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চবন মন্তব্য করলেন ঃ প্লেন ও ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেননি।

গুলী যাঁরা চালিয়েছিল সেই গার্ডদের বিচার নিয়েও রাজ্যের সঙ্গে সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরোধ দেখা দিল। রাজ্য পুলিশ তাঁদের নামে সাধারণ আদালতে মামলা করতে চাইলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দিলেন। আদালতে শেষ পর্যন্ত সামরিক কর্তৃপক্ষই জিতলেন।

দুর্গাপুর এবং কাশীপুরের ঘটনা থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের ব্যাপার বলেই রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য বিরোধের কোনও সংগত কারণ ছিল না। কিন্তু তবু বেশ কিছুটা বিরোধ দেখা দিল এই ব্যাপারে।

রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা ঘটে ৬ই এপ্রিল। দক্ষিণ কলকাতার একটা সংগঠন

রবীন্দ্র সরোবরে একটা বিরাট জলসার আয়োজন করেন। সেই জলসায় হাঙ্গামা হয়। পুলিশ গুলী চালায়। একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। বহু আহত হয়।

যা নিয়ে গণ্ডগোলটা সুরু হয় তা অবশ্য পুলিশের গুলী চালনা নয়। ঘটনার দু তিন দিন পর থেকেই গোটা শহরে শোনা যেতে থাকে ওই হাঙ্গামার রাত্রে রবীন্দ্র সরোবরে মেয়েদের উপর অত্যাচার হয়েছে। বহু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর স্ত্রীকন্যাও অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তাঁরাই অত্যাচারের অভিযোগটা সব চেয়ে বেশী করে তুলে ধরলেন। তাঁরা দিল্লিতেও তদবির করলেন। ক্রমে ক্রমে গোটা ভারতে এই নিয়ে হইচই সুরু হল। ব্যাপারটা পারলামেণ্টেও উঠল। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও অভিযোগের পর অভিযোগ গেল। নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি উঠল।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবাবু প্রথম এতে আপত্তি করলেন। তিনি বললেন, এটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু ব্যবসায়ীর যুক্তফ্রণ্ট সরকার বিরোধী চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়।

জ্যোতিবাবুর এই অভিযোগ শুনে দিল্লি তো মহাখাপ্পা।

তখন স্বয়ং জ্যোতিবাবুর নামেই পাল্টা অভিযোগ উঠল যে তাঁর বন্ধু স্নেহাংশুকান্ত আচার্য এবং স্নেহভাজন মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী ওই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে জড়িত বলেই তিনি নিরপেক্ষ তদন্তে রাজি হচ্ছেন না।

ফ্রণ্টের কয়েকটি শরিক দল, বিশেষভাবে এস. এস. পিও মেয়েদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তুললেন। তাঁরাও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করলেন। দলের সর্বভারতীয় নেতা রাজনারায়ণ এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিরাট বিশাল অভিযোগ তুললেন। মন্ত্রিসভার ভেতর থেকেও চাপ এল। বাধ্য হয়ে জ্যোতিবাবু ১৬ই এপ্রিল বিচারপতি শম্ভু ঘোষকে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দিলেন। বিচারপতি ঘোষ অবশ্য দীর্ঘ তদন্তের পর রায় দিলেন যে রবীন্দ্র সরোবরে ওই রাত্রে মেয়েদের উপর কোনও অত্যাচার হয়নি।[১]

এইভাবে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সুরু থেকেই আরম্ভ হয়েছিল কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ। মারচ-এপ্রিল নাগাদ তো মনে হল এ বিরোধ খুব জটিল আকার ধারণ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। কারণ কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়াটা তিক্ততম পর্যায়ে যেতে না যেতেই সুরু হয়ে গেল আর এক অধ্যায়—যার নাম শরিকী সংঘর্ষ। এপ্রিলে যুক্তফ্রণ্ট শরিকী সংঘর্ষ নিয়ে এত বিব্রত হয়ে উঠলেন যে তখন তাঁদের আর দিল্লির দিকে নজর দেওয়ার ফুরসুৎ নেই।

---

[১] যদিও এখনও অনেকেই মনে করেন যে ঘোষ কমিটি সত্য উদ্ঘাটন করতে পারেননি।

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-27

শরিকী বিরোধের সূত্রপাত

প্রথমবার যখন যুক্তফ্রন্ট গদিতে বসলেন কংগ্রেস তখনও বেশ শক্তিশালী। বিধানসভায় তখনও তাঁদের ১২৭জন এম. এল. এ। গদিতে বসলেও ফ্রণ্টের অনেক শরিকই তখন তাই কংগ্রেস সম্পর্কে বেশ ভীত। তাঁরা জানতেন, জনা পনেরো এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। তাঁরা এও জানতেন, কংগ্রেসী নেতারা এই জন্য সচেষ্ট। ফ্রণ্ট থেকে এম. এল. এ ভাঙ্গাবার তালে তাঁরা ওত পেতে আছেন। তাই, গদি হারাবার ভয়েই ফ্রণ্টের বহু নেতা প্রথম প্রথম বেশ কিছুটা সংযত হয়ে চলতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার কিন্তু পরিস্থিতিটা একেবারে পাল্টে গেল। বিধানসভায় ২৮০-র মধ্যে কংগ্রেস দাঁড়ালো মাত্র ৫৫। বাদবাকি প্রায় সবটাই যুক্তফ্রণ্ট। ফলে, ফ্রণ্টের বহু নেতার মনে তখন একটা চরম ডোণ্ট কেয়ার ভাব। তাঁরা ধরেই নিলেন, এবার আর '৬৭-র ভয় নেই, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এ সরকারের পতন ঘটাবার কথা কেউ ভাবতেও পারবেন না। ৫০-৬০জন এম. এল. এ দলত্যাগ করলেও ফ্রণ্ট সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবেই। সুতরাং যাই ঘটুক, ফ্রণ্ট সরকার চলতে বাধ্য।

আরও একটা বড় পার্থক্য ছিল প্রথমবারের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের। ১৯৬৭ সনে ফ্রণ্টের মধ্যে ছোটবড় দল থাকলেও এম. এল. এ-র বিচারে কোনও এক দল আর সকলের চেয়ে খুব বেশী বড় ছিলেন না। ১৯৬৯ সনের নির্বাচনের পর কিন্তু দেখা গেল, সি. পি. এম শুধু ফ্রণ্টের বৃহত্তম দল নন, তাঁরা অন্যান্য শরিকের চেয়ে অনেক অনেক বড়।

এই বড় ভাবটা গোড়া থেকেই সি. পি. এমের নেতা ও কর্মীদের আচার আচরণে ফুটে উঠল। বড় দলের দাবিতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রিত্ব চাইলেন, বড় দলের দাবিতে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিলেন এবং বড় দল বলেই তাঁদের মধ্যে 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাবটা সবচেয়ে বেশী করে এল। সি. পি. এম নেতা ও কর্মীরা তাই গোড়া থেকেই টপ গিয়ারে চলতে সুরু করলেন।

গদিতে বসতে না বসতেই তাঁরা আরও একটা জিনিস ঠিক করে নিলেন ঃ "যুগপৎ সংগ্রামী আন্দোলন চালাতে হবে এবং সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে হবে।" মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সি. পি. এমের রাজ্য কমিটি সংগঠন বাড়ানোর ব্যাপারে একটা বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। সেই কর্মসূচীটা এই রকম ঃ

(১) ১ লক্ষ লোককে অর্কাজিলারি গ্রুপে নিয়ে আসতে হবে;
(২) পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগঠিত করতে হবে;
(৩) পারটিতে নতুন আট হাজার সদস্য নেওয়া হবে;
(৪) ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে ১ লক্ষ নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে হবে;

(৫) ছাত্র ও যুব সংগঠনে ১ লক্ষ নতুন সদস্য নেওয়া হবে;
(৬) কিষাণ সভায় সাড়ে ৪ লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করতে হবে; এবং
(৭) বিভিন্ন ফ্রণ্টে মোট ১ লক্ষ মহিলা সদস্য জোগাড় করতে হবে।

রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষ হল ১২ই মার্চ। ১৩ই প্রমোদ দাশগুপ্ত এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। আর বললেন, সংগ্রামী গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

প্রমোদবাবু রাজ্য কমিটির যে সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে বললেন না সেটা হল ঃ দলের মন্ত্রীরা সংগ্রামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই প্রশাসন যন্ত্রকে পরিচালিত করবেন। অর্থাৎ, মন্ত্রীরা সর্বদা দলীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করবেন।

ফ্রণ্টের অন্যান্য শরিক যে এ জিনিস কল্পনাও করতে পারেননি তেমন নয়। সি. পি. এম এবার প্রচণ্ড গতিতে এগোতে চাইবে, সি. পি. এম প্রশাসন যন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যই স্বরাষ্ট্র সহ সব গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি চাইছে—এটা গোড়ায়ই অনেকে বুঝেছিলেন। এবং বুঝেছিলেন বলেই মুখ্য-মন্ত্রিত্ব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্ব সি. পি. এম-কে ছেড়ে দিতে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি ছিল।[১]

ফ্রণ্টের ভেতরে যাঁরা মারকসবাদী পারটি, প্রশাসন যন্ত্রকে দলের এবং সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করা তাঁদের দৃষ্টিতে কোনও অপরাধেরও কাজ নয়। কখন কতটা করা উচিত এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু নীতিগত ভাবে তাঁরা সবাই এটাকে পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে করেন। তবু সি. পি. এমের ক্রিয়াকলাপ দেখে তাঁরা গোড়া থেকেই চটলেন। এর একটা কারণ, সি. পি. এম প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলল। তাই তাঁরা সবাই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। এবং তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেও তাঁরাও প্রায় সবাই সেই পথই ধরলেন।

ফলে, গোড়ায়ই সরকারী দলগুলির মধ্যে একটা বিচিত্র প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল—যার প্রধান ও মূল লক্ষ্য যত দ্রুত তালে সম্ভব পারটি বাড়িয়ে যাওয়া এবং সেজন্য যতটা সম্ভব প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করা।

এই দলবৃদ্ধির অদম্য উৎসাহে যে যেমন পেলেন লোককে দলে টেনে নিলেন। খারাপ ভাল, সাধু চোর, গুণ্ডাবদমাস, কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী জেলায় জেলায় সব রাতারাতি সি. পি. এম, সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি, আর. এস. পি প্রভৃতির সমর্থক, এমন কি সক্রিয় কর্মীও হয়ে উঠলেন।

ক্রমে ক্রমে এই দলবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা থেকেই সুরু হল শরিকী সংঘর্ষ—শরিকে শরিকে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি।

স্বরাষ্ট্র দফতরের ক্ষমতা হাতে নিয়েই জ্যোতিবাবু কাজ সুরু করে দিলেন। প্রথমেই তিনি আই. জি. উপানন্দ মুখার্জীকে সরাবার ব্যবস্থা করলেন। উপানন্দ-

---

[১] নির্মল বসু। সাক্ষাৎকার ২০-৭-৭০। "সি. পি. এমের হাতে স্বরাষ্ট্র দফতর না গেলে এত তাড়াতাড়ি ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ভাঙগত না।"

বাবুর চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি একসটেনসনে ছিলেন। জ্যোতিবাবু মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই আই. জির প্রসঙ্গটা তুললেন। ঠিক হল, উপানন্দবাবুকে অবিলম্বে অবসর নিতে বলা হবে।

উপানন্দবাবুকে যখন একসটেনসন দেওয়া হয় তখনই যুক্তফ্রন্ট এক বিবৃতিতে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। সি. পি. এম এবং সি. পি. আই দুই বড় পক্ষই তাঁর উপর চটেছিলেন। সি. পি. এম মনে করতেন, এই লোকটা তাঁদের পথে একটা বড় কাঁটা। সি. পি. আই-র বক্তব্য ছিল, এই ভদ্রলোকই তাঁদের "ছোড়দাকে" ভুল বুঝিয়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার যখন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা পেল এবং জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন তখন পুলিশের ভেতরের ও বাইরের উপানন্দ-বিরোধী লবিও সক্রিয় হয়ে উঠল। ফলে, উপানন্দ মুখাজীর্কে যেতেই হল।

জ্যোতিবাবু এরপর মনোমত পুলিশের ওপরতলায় অদলবদল করে নিলেন। তিনি খুঁজে খুঁজে বের করলেন কারা সবচেয়ে মেরুদণ্ডহীন, কারা বিনা প্রশ্নে তাঁর আজ্ঞামত চলবেন। তাঁদের এনে সব গুরুত্বপূর্ণ পদে বসালেন। পুলিশের সর্বস্তরে একটা ত্রাসের সঞ্চার হল।

জ্যোতিবাবু অবশ্য শুধু পুলিশের ওপরতলায় অদলবদল করেই ছাড়লেন না। খোদ স্বরাষ্ট্র দফতরেও হাত দিলেন। সেখানে তিনি মোস্তাক মোরসেদকে জয়েণ্ট সেকরেটারি করে নিয়ে এলেন। মোরসেদকে জ্যোতিবাবু আগে থেকেই ভাল করে চিনতেন। প্রথমবার যখন তিনি পরিবহন মন্ত্রী মোরসেদ তখন ওই দফতরেরই অফিসার। মোরসেদ স্বরাষ্ট্র দফতরে বসেই সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন— জ্যোতিবাবুর পরেই দফতরে মোরসেদের স্থান হল।

এইভাবে জ্যোতিবাবু গোটা স্বরাষ্ট্র দফতরটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এলেন।

অন্যদিকে তখন হরেকৃষ্ণ কোঙার, কেষ্ট ঘোষ এবং সত্যপ্রিয় রায়ও এগোচ্ছেন। এর মধ্যে আবার সবচেয়ে দ্রুততালে এগোলেন সত্যপ্রিয় রায়। তাঁর কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও ছিল। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব সি. পি. এমের হাতেই ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সত্যপ্রিয়বাবুর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করলেন। সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষা দফতর সম্পর্কে ফ্রণ্টের সিদ্ধান্তগুলিও পুরোপুরি অমান্য করে চললেন। প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন নিয়ে ফ্রণ্ট যে সুপারিশ করলেন শিক্ষামন্ত্রী সেটাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করলেন।

এইভাবে যখন বিভিন্ন দফতরের সক্রিয় সহযোগিতায় সি. পি. এমের সংগঠন গড়ার কাজ প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে ফ্রণ্টের শরিকরা তখন চরম শংকিত হয়ে উঠলেন। তাঁরাও দফতরগুলি মনোমত ব্যবহার করতে চাইলেন। করলেনও। কিন্তু কতটাই বা করবেন! বড় জোর ইলা মিত্রকে ফ্লাট বিলি কমিটির মাথায় বসানো অথবা হেমন্ত বসুকে খাদি বোরডের চেয়ারম্যান করা অথবা বাড়ির লোককে শিলপ দফতরে একটা বড় চাকুরী দেওয়া! কিন্তু তাতে সংগঠন কতটা এগোবে! পুলিশ, জমি, ট্রেড ইউনিয়ন, স্কুল কলেজ, বাস পারমিট সবই যে সি. পি. এমের হাতে!

এই সব জিনিস ওপরে যতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তার চেয়ে অনেক বেশী করল নীচে। নীচের তলায় এই সরকারী দফতর নিয়ে প্রচণ্ড রেষারেষি সুরু হয়ে গেল। গ্রামে গ্রামে সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রভৃতি দলের কর্মীরা দেখলেন, পুলিশ তাঁদের কথা মোটেই শোনে না—তাঁরা সি. পি. এমের হুকুম মানে। দেখলেন জে. এল. আর. ও-ও জমি বিলির ব্যাপারে সহযোগিতা করেন সেই সি. পি. এমেরই সঙ্গে। শ্রম দফতরের অফিসারদের পক্ষপাতিত্বও সি. পি. এম ইউনিয়ন নেতাদের প্রতিই।

এইভাবে সি. পি. এমের ক্ষমতা ও প্রভাব যতই বেড়ে চলল ফ্রণ্টের অন্যান্য শরিকের সি. পি. এম বিরোধিতাও ততই বাড়ল।

প্রথম প্রথম সুরু হল শুধু ওপরতলায় সমালোচনা—কাগজেপত্রে লেখালেখি। সি. পি. আই এবং এস. ইউ. সি এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। সি. পি. আই চিরকালই একটু কৌশলে চলার পারটি, তাই তাঁরা ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে সি. পি. এমের সমালোচনা সুরু করলেন। সুরটা এই যে, সি. পি. এম যা করছে তাতে যুক্তফ্রণ্টের "ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হচ্ছে" এবং "ঐক্য বিঘ্নিত হচ্ছে"।

এস. ইউ. সি কিন্তু ক্রোধটা প্রকাশ করলেন একেবারে অন্যভাবে। দলগত স্বার্থে প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহারের কথা প্রথমে তাঁরা মুখেই আনলেন না। তাঁরা বরং আদর্শগত পর্যায়ে সি. পি. এমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইলেন। বললেন, ওঁরা মেহনতী মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন না। এস. ইউ. সির মুখপত্রে অভিযোগ করা হল, "মারকসবাদী কমিউনিস্ট দল পুঁজিপতিদের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়ার জন্য কেরল সরকারের মতই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমনীতি রচনা করতে চাইছেন। সেইভাবেই তাঁরা এগোচ্ছেন। তাই তাঁরা এই দফতরটি হাতে রেখেছেন।" 'গণদাবী'তে এই সঙ্গে সরকারী খাদ্যনীতি ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার জন্যও সমালোচনা করা হল। আর বলা হল, খাদ্য সংগ্রহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দফতরকে দেওয়া হোক।

এদিকে তখন জমি এবং ভেড়ি দখল নিয়েও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সি. পি. এম, সি. পি. আই ও এস. ইউ. সি-তে বেশ কিছুটা মারামারি সুরু হয়ে গিয়েছে। তিন পার্টিরই কিছু কিছু সংগঠন ছিল এই এলাকায়। তিন দলের তীব্র প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল। দিনে চারটা পাঁচটা করে ভেড়ি দখল হওয়া আরম্ভ হল। দখল মানে লুট। লুটে লোক পেতেও অসুবিধা হল না। মারদাঙ্গাও বেশ কিছুটা হল। প্রথম প্রথম ভেড়ির মালিকের লোকজনরা বাধা দিতে গেল। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে তারা পারবে কেন! পুলিশও এল না। কারণ, হরেকৃষ্ণবাবু এর আগেই সরকারী নির্দেশ দিয়েছেন যে, জমি দখলের লড়াইয়ে পুলিশ যাবে না। সাতাশে মার্চই হরেকৃষ্ণবাবু সাংবাদিকদের বলেছেন ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে কোনও ক্ষেত্রেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এ সম্পর্কে একটি সারকুলার স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে পাঠানো হয়েছে।[২] ভেরি দখল

[২] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮-৩-৭০।

এবং লুটও জমি দখলের নামেই চলল।

কিন্তু তিন দলের প্রতিযোগিতার ঠেলায় পাঁচ দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁাছল। ভেড়ির মালিকরা দলের নেতাদের কাছে ছুটাছুটি সুরু করলেন। গেলেন রাইটারস বিলডিংস-এও। কিন্তু কাজ কিছুই হল না। কারণ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও তখন ভেড়ি দখলের বিরুদ্ধে নন। অজয়বাবু এই সময় একদিন রিপোর্টারদের বললেন ঃ ভেড়ি দখলের ব্যাপারটা একটা জটিল সমস্যা। মাছের ভেড়ির নামে যে কোনও পরিমাণ জমি রাখা যাবে—আইনে এই ব্যবস্থা করা ভুল হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাছের চাষ না করে ভেড়ির নামে রাখা জমিতে ধান চাষ হচ্ছে। যারা ভেড়ি দখল করছেন তাঁরা ন্যায্য কাজ করছেন, না অন্যায্য কাজ করছেন তা বলতে পারি না।[৩]

দিন তিন চার পরেই কিন্তু ভেড়ি দখল নিয়ে চব্বিশ পরগণায় ফ্রণ্টের তিন শরিকে বেশ একচোট ঝগড়া সুরু হয়ে গেল। এস. ইউ. সি, সি. পি. আই এবং সি. পি. এম পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলতে লাগলেন। মাছ লুটের জন্য ভেড়ি লুট হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠল। লুটের লোভ দেখিয়ে পারটি বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও ওদের মুখেই শোনা যেতে লাগল। ভেড়ির মালিকের কাছ থেকে গোপনে টাকা নিয়ে রেহাই দেওয়া হচ্ছে বলেও ওঁরাই অভিযোগ করলেন।

এই অবস্থায় স্বয়ং ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী। হরেকৃষ্ণ কোঙার একদিন প্রকাশ্যে সি. পি. আই-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন যে ওরা মাছ লুটের জন্য ভেড়ি লুট করছে। তিনি আরও বললেন ঃ জমি পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে দল বাড়াবার চেষ্টা করা ভুল। এই চেষ্টা চলছে বলে আমি নানা অভিযোগ পেয়েছি।

হরেকৃষ্ণবাবু যেদিন রিপোর্টারদের কাছে এই কথা বললেন সেইদিনই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে ১২টি ভেড়ি লুটের খবর এল।[৪]

পারস্পরিক দোষারোপ চলছে, দলীয় কাগজেপত্রে একে অপরের সমালোচনা করছেন, জেলায় জেলায় কর্মীদের মধ্যে রেষারেষি চলছে—কিন্তু সব মিলিয়ে তখনও শরিকী ঝগড়াটা আয়ত্তের বাইরে যায়নি। মাঝখানে কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচন নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁটি হল। মনে হল বোধহয় পৌর নির্বাচনে রফাই হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হল। কিছু সি. পি. এম সমর্থক একদিন রাইটারস বিলডিংস-এ পূর্তমন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জীকে ঘেরাও করলেন। এস. ইউ. সি-র লোকজনেরা এসে তাঁদের হটিয়ে দিলেন। এই নিয়েও কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি হল। নীহার মুখার্জী যুক্তফ্রণ্টের কাছে এক চিঠি লিখে বললেন ঃ অবিলম্বে এ ব্যাপারে একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত চাই। না হলে অন্যান্য দলের মন্ত্রীরাও হয়ত এইভাবে ফ্রণ্ট অন্তর্ভুক্ত দলের লোকজনের দ্বারা ঘেরাও হবেন।[৫]

---

[৩] আনন্দবাজার পত্রিকা ৭-৪-৬৯।

[৪] ১১-৪-৬৯।

[৫] আনন্দবাজার পত্রিকা ১২-৪-৬৯।

কিন্তু এই ঘটনা নিয়েও শেষ পর্যন্ত আর তেমন উত্তাপ বাড়ল না।

কারণ তখনও সামগ্রিকভাবে যুক্তফ্রন্টের শরিকরা নির্বাচনে বিপর্যস্ত কংগ্রেসকে প্রত্যেকটা ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করতে ব্যস্ত। তখনও কংগ্রেসের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্য তাঁদের পূর্ণ হয়নি।

২৪ ও ২৫শে মার্চ এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভা দুটি বড় সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথম সিদ্ধান্তে একটা অর্ডিন্যান্স মারফৎ সরকার সব জেলা স্কুলবোর্ড বাতিল করে দিলেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে আর একটা অর্ডিন্যান্সে সব জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল করে দেওয়া হল। জেলা স্কুলবোর্ড এবং জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদগুলির অধিকাংশ তখনও কংগ্রেসের দখলে।

১১ই মে কলকাতা পৌরসভারও নির্বাচন হয়ে গেল। সেখানেও ফ্রন্টের জয়জয়কার। তাঁরা পেলেন ৭১টা আসন। কংগ্রেস মাত্র ২২টা। জনসংঘ ২। বামপন্থীরা এই প্রথম পৌরসভা দখলে পেলেন।

এই সময় নেতারা একটু রাশ টানার চেষ্টা করলেন। ভেড়ি দখল, জমি দখল প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন জেলায় তখন বেশ গরম গরম ভাব। সেই সুযোগে গুন্ডা বদমাস শ্রেণীর লোকেরাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। কতকগুলি এলাকা থেকে পারটিগত হামলা হুজ্জুতী ছাড়াও ব্যক্তিগত জোরজুলুম এবং মারামারির খবর এল। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে তাই সব জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের কলকাতা ডেকে নির্দেশ দেওয়া হল ঃ অবিলম্বে সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচন্ড অভিযান সুরু করুন।

এই নির্দেশ দেওয়া হল ২৭শে এপ্রিল। ২রা মে যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে শরিকী বিরোধ নিয়েও দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হল। শরিকদের জন্য একটা মোটামুটি আচরণ বিধিও তৈরী করলেন ফ্রন্ট। সেই আচরণ বিধির প্রধান নির্দেশ ঃ বিভিন্ন পার্টির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা প্রথমে সংশিলষ্ট পার্টিগুলি একত্রে বসে মিটমাটের চেষ্টা করবেন। এরপর বিরোধের ব্যাপার ফ্রন্ট কমিটির কাছে পেশ করতে হবে। তার আগে সংশিলষ্ট পারটিগুলি সংবাদপত্রে কোনও বিবৃতি দেবেন না।

জ্যোতিবাবু ফ্রন্টের বৈঠকে এই সম্পর্কিত আলোচনার সময়ই এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেন। মন্তব্যই করে ফেললেন ঃ ভাল সিদ্ধান্তই হল। তবে সবাই এটা মানবে কি!

আচরণ বিধি হল, প্রকাশ্য সমালোচনাও কিছুটা কমল, কিন্তু শরিকী সংঘর্ষ থামল না। সি. পি. এমের সঙ্গে বিভিন্ন ফ্রন্ট শরিকের সংঘর্ষ বেড়েই চলল। ততদিনে শ্রমিক ফ্রন্টে অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নেও সংঘর্ষ চলে এসেছে। গ্রামে গ্রামে জমি দখল আর ভেড়ি দখল নিয়ে বিরোধ তো চলছেই।

এই সময় আবার প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করে বসলেন যে তাঁর পারটি কুৎসারটনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধ সুরু করবেন। প্রমোদবাবু বললেন ঃ

আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে প্রধানত সি. পি. আই এবং এস. ইউ. সি। ওরা মিথ্যা অভিযোগ করছে যে আমরা দলগত স্বার্থে পুলিশ ও প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করছি। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। আমরা এই কুৎসারটনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধ সুরু করব।[৬]

চারদিন পরেই জলপাইগুড়ি থেকে যে ভয়াবহ খবর এল তাতে কিন্তু দেখা গেল সি. পি. এমের সঙ্গে শুধু সি. পি. আই ও এস. ইউ. সিরই ঝগড়া নয়—ঝগড়া অন্যান্য দলেরও। আলিপুরদুয়ারে সি. পি. এম ও আর. এস. পিতে প্রচণ্ড মারামারি হল। পাঁচজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন।

এমন যে আর. এস. পি—যাঁরা এতদিন নানাভাবে সি. পি. এমের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, যাঁরা অজয়বাবুকে বাদ দিয়ে জ্যোতিবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন—তাঁরাও এই ঘটনার পর অভিযোগ তুললেন যে, পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করছে, পুলিশের যোগসাজসেই সি. পি. এম এই হামলাবাজী চালিয়েছে।[৭]

এরপরই সুরু হল বিভিন্ন এলাকা থেকে শুধু শরিকী সংঘর্ষের খবর আসা। ১৯শে তিনটা বড় রকমের সংঘর্ষের খবর এল। নদীয়ার তাহেরপুরে আর. এস. পি বনাম সি. পি. এম। হরিণঘাটায় সি. পি. আই বনাম সি. পি. এম। দিন তিনেক পরে আবার বড় সংঘর্ষের খবর। একদিনে দু যায়গায় সি. পি. আই বনাম সি. পি. এম। রাণাঘাটে এবং ক্যানিংয়ে। রাণাঘাটে একজন মারা গেলেন। তিনদিন পরেই উত্তরবঙ্গ থেকে আবার কতকগুলি শরিকী সংঘর্ষের খবর এল। ৩০শে একেবারে কলকাতার কাছেই জোর শরিকী সংঘর্ষ হল—যাদবপুরে সি. পি. এম বনাম এস. ইউ. সি লড়াইয়ে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হলেন।

নেতারা এবার বুঝলেন, না, একটা কিছু করতেই হয়। ৩১শে মে তাই ফ্রণ্টের পাঁচ প্রধানদলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হল। সি. পি. এম, সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর. এস. পি-র পক্ষ থেকে যৌথভাবে ঘোষণা করা হল ঃ শরিকী সংঘর্ষ অংকুরেই বিনাশ না করলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ আকার নিতে বাধ্য।

কীভাবে শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করা সে সম্পর্কে কিন্তু তাঁরা একটা বিচিত্র দাওয়াই বাতলালেন। তাঁরা বললেন ঃ ফ্রণ্টে ৩২ দফা কর্মসূচীর কয়েকটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা নিয়ে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তাতেই শরিকী সংঘর্ষ কমবে!

সবাই আশা করলেন, এবার তাহলে শান্তি ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে কলকাতায় সি. পি. এম এবং সি. পি. আই-র শীর্ষ নেতৃত্বের একটা বৈঠকও হয়ে গিয়েছে এবং

---

৬ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩-৫-৬৯।

৭ আর. এস. পি রাজ্য কমিটির অভিযোগ। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯-৫-৬৯।

সেই বৈঠকের পর দুই পার্টিরই সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যৌথ ইস্তাহারে ঘোষণা করেছেন যে "কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করতে দুই কমিউনিস্ট পার্টিই দৃঢ় সংকল্প"।[৮] দুই প্রধান শরিকের এই ঘোষণাও যুক্তফ্রন্ট মহলে বেশ কিছুটা আশার সঞ্চার করল।

কিন্তু অন্যদিকে তখন আবার ঘেরাও নিয়েও আসরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। ঘেরাও আবার যতটা না শিল্পে, তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষায়তনে। বিভিন্ন স্কুলে ঘেরাও করে প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের পদত্যাগ করানোর একটা হিড়িক পড়ে গেল।

ঘেরাও এত বেড়ে গেল যে মন্ত্রিরা সবাই একের পর এক বিবৃতি দিতে সুরু করলেন। ২০শে মে শ্রমমন্ত্রী কেষ্ট ঘোষ বললেন ঃ মালিকপক্ষ ন্যায্য দৃষ্টিভংগী না নিলে ঘেরাও বন্ধ করা যাবে না। ২২শে জ্যোতিবাবু বললেন ঃ ঘেরাওয়ে সমস্যার সমাধান হবে না।[৯] ১লা জুন শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় মন্তব্য করলেন ঃ জোর করে শিক্ষকদের পদত্যাগ করানো মোটেই উচিত নয়।

অবশ্য ইতিমধ্যেই ঘেরাও নিয়ে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে জলঢাকায়। শিল্পমন্ত্রী সুশীল ধাড়া গিয়েছিলেন জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখতে। ২৪শে মে কর্মীরা তাঁকে ঘেরাও করলেন। এই ঘেরাওয়ের প্রতিবাদে মন্ত্রীমশাই নিজেই অনশন সুরু করলেন। কলকাতায় সরকারী মহলে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বেশ উত্তেজিত। উত্তরবংগে তখন কুটিরশিল্প মন্ত্রী শম্ভু ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবার বিদ্যুৎ কর্মীদেরও নেতা। তিনিও ছুটে গেলেন জলঢাকায়। নানাভাবে মিটমাটের চেষ্টা হল। সুশীলবাবু বললেন ঃ কর্মীরা যতক্ষণ না ঘেরাও তুলবেন ততক্ষণ তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী আবার কলকাতা থেকে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন ঃ ঘেরাওকারীদের হটিয়ে দিয়ে সুশীল ধাড়াকে বের করে নিয়ে আসুন। বহু আলাপ-আলোচনায় যখন ফল হল না তখন করতেও হল তাই।

সুশীল ধাড়া শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা ফিরে আসতে ঘেরাও বিরোধীরা তাঁকে বীরের সম্বর্ধনা জানালেন।

১৮ই জুন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যুক্তফ্রণ্টে বললেন ঃ ঘেরাও-র বাড়াবাড়ি বন্ধ করতেই হবে।

ইতিমধ্যে যুক্তফ্রণ্টের মোটামুটি আবহাওয়াটাও বেশ গরম হয়ে উঠেছে। জুনের মাঝামাঝি প্রমোদ দাশগুপ্ত মন্তব্য করলেন ঃ বাইরে থেকে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ফ্রণ্টে ভাঙ্গন ধরানোর কাজ করছে যুক্তফ্রণ্টে ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস. ইউ. সি প্রতিনিধিদের আচরণে তাঁদের সুরে সুর মিলিয়েছে।

---

[৮] ২৭-৫-৬৯।

[৯] দুর্গাপুর থেকে ইউ. এন. আইর খবর।

১৭ই এস. ইউ. সি তার জবাব দিলেন : প্রমোদবাবুর মন্তব্যে ফ্রন্টের ইমেজ নষ্ট হয়েছে।

২০শে সি. পি. আইর দৈনিক মুখপত্র কালান্তরে সম্পাদকীয় লেখা হল : সি. পি. এম কয়লা খনি অঞ্চলে দলীয় জমিদারী স্থাপনের হীন পথ ধরেছে।

তারও পরদিন বাংলা কংগ্রেস এবং সি. পি. আই আলাদা আলাদা ভাবে হলেও মোটামুটি একই অভিযোগ আনলেন সি. পি. এমের বিরুদ্ধে। সি. পি. আইর রাজ্য পরিষদ বললেন : সি. পি. এম পারটির স্বার্থে খুব বেশী করে সরকারী ক্ষমতাকে ব্যবহার করায় জনমানসে ফ্রন্টের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হচ্ছে। সি. পি. এমের কাজকর্মে ফ্রন্টের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হচ্ছে। আর বাংলা কংগ্রেসের প্রদেশ কর্ম পরিষদ ঘোষণা করলেন : সি. পি. এম পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে। ওঁরা পারটির স্বার্থে প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করছে।

৩০শে আর. এস. পির পক্ষ থেকে বলা হল : ফ্রন্টের কাজ কর্মে ঐক্য বজায় থাকছে না।

৪ঠা জুলাই ফরওয়ার্ড ব্লকও অভিযোগ করলেন : সি. পি. এম দলের স্বার্থে সরকারী যন্ত্র ব্যবহার করছে।

যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ শরিকই যখন এইভাবে ঘোষণা করছেন যে ফ্রন্ট ঠিক মত এগোচ্ছে না, কাজ কর্ম ঠিক ঠিক হচ্ছে না, তখন একমাত্র সি. পি. এম কিন্তু বললেন : যুক্তফ্রন্ট সরকার মোটামুটি ভালভাবেই এগোচ্ছেন।[১০] কতগুলি দফতরের নাম করেও তাঁরা বললেন : ওইসব দফতর ভাল কাজ করছেন। বলা বাহুল্য, দফতরগুলি সবই সি. পি. এম মন্ত্রীদের।

এই রকম যখন অবস্থা তখন সুরু হল বিধানসভার অধিবেশন।

বিধানসভা বসার আগের দিন অর্থাৎ ১লা জুলাই ফ্রন্টের এম. এল. এদের যে বৈঠক হল তাতে জ্যোতিবাবু আবেদন করলেন : বিধানসভায় যেন শরিকী সংঘর্ষের ছাপ না পড়ে।

ফ্রন্টের পঞ্চপ্রধানদলও তখন আবহাওয়াটাকে যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছেন। ১১ই জুলাই তাঁরা শরিকী লড়াই থামাবার জন্য পাঁচটি মূল্যবান দাওয়াই খুঁজে বের করলেন :

(১) কতকগুলি জরুরী সমস্যা নিয়ে এবং চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে গণআন্দোলন করতে হবে।

(২) সব পারটিই দলের ভেতরে সমাজবিরোধী ও কায়েমী স্বার্থের লোকের প্রবেশ বন্ধ করবেন।

(৩) কোথাও শরিকী সংঘর্ষ হলেই সংশ্লিষ্ট দলগুলি বসে মিটমাটের চেষ্টা করবেন।

(৪) জেলাভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠিত হবে। এবং,

---

[১০] রাজ্য কমিটির প্রস্তাব। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭-৬-৬৯।

(৫) পারস্পরিক দোষারোপ বন্ধ করতে হবে।

একটা কল্পিত শত্রু দাঁড় করিয়ে ফ্রণ্টের ফাটল-ধরা ঐক্যে জোড়া লাগাবারও চেষ্টা হল। ১৪ই সারা পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদ দিবসও পালিত হল।

যে জমিদখল নিয়ে তখন ফ্রণ্টের শরিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিরোধ সেই ব্যাপারেও নেতারা একটা নীতি দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের তখন ধারণা, একটা নীতি মেনে সবাই জমি দখল করলে শরিকী মারামারিটা কম হবে। সেইজন্য ১৫ই জুলাই যুক্তফ্রণ্ট কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন : বেনামা জমি দখলের লড়াই চলবে, তবে ভুলত্রুটিগুলিও সংশোধন করা হবে। "লুঠের মাল" নিয়ে যাতে নিজেদের মধ্যে বিরোধ না হয় সেইজন্য ঠিক হল : খাস জমি ও উদ্ধার করা জমি বণ্টনে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার একটা করে উপদেষ্টা কমিটি করবেন।

বাইরের দুটো বড় ঘটনাও এই সময়ে যুক্তফ্রণ্টকে কিছুটা সাহায্য করল। এই দুটো ঘটনার প্রভাবে ফ্রণ্টের ভেতরের ঝগড়া কয়েকদিনের জন্য একটু যেন চাপা পড়ল।

এর প্রথমটা হল কেন্দ্রীয় কংগ্রেসে বিরোধ—দিল্লির সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া : ১৫ই জুলাই ইন্দিরা গান্ধী মোরারজী দেশাইকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরালেন এবং কিছুদিন পরে প্রকাশ্যেই রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেসপ্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডিকে হারিয়ে "নির্দল প্রার্থী" ভি. ভি. গিরিকে জেতাবার জন্য কোমর বেঁধে নামলেন! গোটা দেশে তখন তাই নিয়েই বিরাট হইচই। সকলেরই দৃষ্টি দিল্লির দিকে। গোটা দেশের রাজনৈতিক দলগুলি মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট একযোগে প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী গিরিকে সমর্থন করলেন। ২০শে আগষ্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল বের হল, গিরি জিতলেন। ইন্দিরা গান্ধী জিতলেন। এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট নেতারা মনে করলেন, তাঁরাও জিতে গিয়েছেন!

দিল্লির লড়াইটা যতদিন পুরোদমে চলল পশ্চিমবঙ্গের রণক্ষেত্রে ততদিন বেশ কিছুটা ঠাণ্ডাভাব বিরাজ করল। তখন এ রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট নেতাদের প্রধান ভয় সঞ্জীব রেড্ডির সমর্থকদের। তাঁদের তখন আশংকা, সঞ্জীব রেড্ডি ও তাঁর সমর্থকরা জিতলে দক্ষিণপন্থীদের জয় হবে এবং দক্ষিণপন্থীদের জয় মানেই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী যুক্তফ্রণ্টের বিপদ।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল ৩১শে জুলাই বিধানসভা ভবনে। বিধানসভা তখন চলছিল। দুপুরে হঠাৎ কয়েকশ পুলিশের এক উত্তেজিত মিছিল এসে বিধানসভায় চড়াও হল। তাঁদের এক সহকর্মীর মৃতদেহ নিয়ে তাঁরা মিছিল করে রাইটারস বিলডিংসের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মিছিল পথ পরিবর্তন করে বিধানসভায় চলে আসে। মিছিলের অধিকাংশটা উত্তেজিতভাবে বিধানসভা ভবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। হাতের কাছে যা পেল সব ভেঙে চুরে সেই উত্তেজিত পুলিশ বাহিনী সভাকক্ষের দিকে ছুটে গেল। স্পীকার বিজয় ব্যানার্জী তখন সভা চালাচ্ছিলেন। লবিতে প্রচণ্ড

হট্টগোল শুনে তিনি হঠাৎ সভা মুলতুবী ঘোষণা করে সরে পড়লেন। উত্তেজিত মারমুখী পুলিশ যখন সভাকক্ষে ঢুকল তখন উপস্থিত এম. এল. এ এবং মন্ত্রীরাও সব ছুটে পালালেন। দুজন এম. এল. এ শুধু আসনে বসে রইলেন—পান্নালাল দাশগুপ্ত এবং নলিনাক্ষ সান্যাল। মন্ত্রীরা কয়েকজন অন্ধকার ঘরের কোণে আশ্রয় নিলেন। কয়েকজন আবার দোতলায় সরে পড়লেন। কয়েকজন পুলিশ গিয়ে জ্যোতিবাবুর ঘরে হাজির হল। তাঁরা চিৎকার করছিল : জ্যোতিবাবুকে চাই, জ্যোতিবাবুকে চাই। জ্যোতিবাবু তখন ঘরে বসে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাঁরা জ্যোতি-বাবুর ঘরেও বেশ কিছুক্ষণ দাপাদাপি করলেন। জ্যোতিবাবু আস্তে আস্তে অবস্থাটা আয়ত্তে আনলেন। ক্রমে ক্রমে চড়াওকারীদের উত্তেজনাও কমে এল। ইতিমধ্যে লালবাজার থেকেও সশস্ত্র পুলিস বাহিনী এসে হাজির হয়েছে। চড়াওকারী সব পুলিশকে ঘিরে ধরল সেই সশস্ত্র বাহিনী। চড়াওকারীরা তখন একেবারে চুপচাপ। অজয়বাবুও তখন বিধানসভা ভবনে তাঁর ঘরে। সব বড় অফিসারদের ডেকে পাঠানো হল। অজয়বাবুর ঘরে কিছুক্ষণ মন্ত্রিদের বৈঠক হল। চড়াওকারী পুলিশদের মধ্য থেকে নেতা গোছের ব্যক্তিরা সকলের কাছে ক্ষমা চাইলেন। জ্যোতিবাবু হুকুম দিলেন : কাউকে এখন গ্রেফতার করার কোনও প্রয়োজন নেই। সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হোক, পরে দেখা যাবে।

এই ঘটনাটা ৩১শে জুলাই ঘটলেও পেছনে একটা দীর্ঘকাহিনী আছে।

জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েই পুলিশকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আনার চেষ্টা করেন। গোটা মন্ত্রিসভা আই. জি. উপানন্দ মুখার্জীকে মাঝপথে সরাবার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাওয়ায় এই ব্যাপারে জ্যোতিবাবুর প্রচণ্ড সুবিধা হয়ে যায়। উপানন্দবাবুর পর আই. জি. হলেন শচীন ঘোষ। জ্যোতিবাবু জানতেন, শচীন ঘোষ উপানন্দ মুখার্জী নন, তাঁকে নিয়ে তেমন কোনও অসুবিধা হবে না। কতকগুলি ডি. আই. জি পদে তিনি এমন কিছু লোককে আনলেন, যাঁরা ধরে আনতে বললে বেঁধে আনবে। দু একজন এস. পিকেও এধার ওধার করা হল। এইভাবে প্রথমে উপানন্দ মুখার্জীকে সরিয়ে এবং পরে উঁচুপদে কতকগুলি রদবদল করে জ্যোতিবাবু গোটা রাজ্যের পুলিশ ফোর্সকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন—হয় আমরা যেমন চাইব তেমন চলবে, না হয় ফল ভুগতে হবে।

সুফলও পেলেন হাতে হাতে। গোটা রাজ্য পুলিশের ওপর তলায় আগে প্রাণ দেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল! অধিকাংশ অফিসার ধরে নিলেন : জ্যোতিবাবু এবং তাঁর পারটিকে খুশী রাখাই তাঁদের প্রধান কাজ। তাঁরা সেইভাবে চলতে সুরু করলেন।

কিন্তু মুস্কিল হল নীচের তলার পুলিশকে নিয়ে। আসল পুলিশ তো তাঁরাই। ইংরেজ আমলে দুশ বছর ধরে এরাই দেশে কর্তৃত্ব করেছেন। কংগ্রেস আমলেও এদের কর্তৃত্বে হাত পড়েনি। সব পর্যায়ের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেই এদের বেশ একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। উভয়ে উভয়ের স্বার্থ দেখতেন। উভয়ে উভয়কে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করতেন। দু একটা ক্ষেত্রে যে গণ্ডগোল হয়নি তা নয়। তবে তা ব্যতিক্রম মাত্র।

যুক্তফ্রন্টের প্রথমবারেই পুলিশের উপর কিছুটা আঘাত এল। তবে তাও বেশী নয়। কারণ, সেবার অজয়বাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপানন্দ মুখার্জী আই. জি। দ্বিতীয়বার জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে এবং প্রথম ধাক্কায়ই উপানন্দ মুখার্জী বিদায় হওয়ায় পরিস্থিতিটা একেবারে পাল্টে গেল। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন পুলিশের উপর বামপন্থীদের রাগ ছিল। সুযোগ পেয়েই তাঁরা বদলা নেওয়া সুরু করলেন। থানা পুলিশ ঘেরাও হওয়া আরম্ভ হল। প্রকাশ্যে ছোট ছোট পুলিশ অফিসার এবং কর্মীদের চূড়ান্ত অপমান সুরু হল। সমাজে পুলিশের প্রাধান্য তো গেলই, উল্টে তাঁদের উপর আসতে লাগল আঘাত।

এই অবস্থা প্রথম প্রথম সবাই মুখ বুঝে সহ্য করলেন। কিন্তু ক্রমে বিক্ষোভটা বাড়তে লাগল। নীচু তলার পুলিশ ওপর তলার পুলিশের কাছে আবেদন নিবেদন জানালেন। কিন্তু তাতে কিছুই হল না। তাঁরাও তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। নীচু তলার পুলিশের রাগ তাতে আরও বাড়ল। ততদিনে তাঁদের ক্ষমতাও কমে গিয়েছে। জমি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কোনও বিরোধে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না বলে হুকুম জারি হয়ে গিয়েছে। এমনি কাজে কর্মেও তাঁদের প্রধানত পারটি-গুলির নির্দেশেই চলতে হয়। গোটা পুলিশ বাহিনী এই অবস্থায় রাগে একেবারে ক্ষেপে উঠল। এই বিক্ষোভকে কিছুটা ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করলেন পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন। তাঁরা সংগঠনের নামেই ওপর তলায় প্রতিবাদ জানালেন এবং নীচের তলায় চাপা প্রচার অভিযান সুরু করলেন।

ব্যাপারটা জ্যোতিবাবুরও কানে গেল। তিনিও বুঝলেন, অবস্থাটা ভাল নয়। ওপরতলা হাতের মুঠোর মধ্যে এলেও নীচেরতলা আসেনি। বরং সেখানে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে। তিনি তখন সব পুলিশ লাইনে গিয়ে নিজে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে অবস্থাটা ঠাণ্ডা করতে চাইলেন। লালবাজারে[১১] তিনি এমনও বললেন : দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও শরিক দল, এমনকি আমাদের সি. পি. এম দল থেকেও নানা এলাকায় পুলিশের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। এ ব্যাপারে কি করা যায় তা নিয়ে ফ্রণ্টের মধ্যে আলোচনা চলছে।

এই সময় জ্যোতিবাবু আরও একটা কাজ করলেন। তিনি তাঁর নিজের পারটির কাগজ গণশক্তিতে এক "বিশেষ সাক্ষাৎকারে" বললেন : দাঙ্গাহাঙ্গামা-কারীরা, সমাজবিরোধীরা এবং যুক্তফ্রন্টের শত্রুরা পুলিশে বিদ্রোহের উসকানি দিচ্ছে। এদের সঙ্গে কিছু পুলিশ অফিসারও আছে।

কিন্তু পরদিনই যখন অন্যান্য কাগজের রিপোর্টাররা জানতে চাইলেন, তাহলে এইসব পুলিশ অফিসারকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না কেন, জ্যোতিবাবু তখন অফিসার প্রসঙ্গটাই বাদ দিয়ে দিলেন। বললেন : আমি অফিসারদের কথা বলিইনি। গণশক্তি ভুল ছেপেছে।

কয়েকদিন পরেই একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটল দুর্গাপুরে। নকশালপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের মারামারি হল। প্রথম দিন পুলিশই কিছুটা মার খেল। দ্বিতীয় দিন তারা বদলা নিল। কলেজের হস্টেলে গিয়ে গুলি চালাল এবং ঘরে ঢুকে ঢুকে ছাত্রদের পেটালো। পরদিন অর্থাৎ ১লা জুন কলকাতায় নকশালপন্থী

[১১] ৬-৬-৬৯। আনন্দবাজার পত্রিকা ৭-৬-৬৯।

ছাত্ররা তার বদলা নিল কলেজ স্ট্রীটে ট্রাম পুড়িয়ে। তারও পরদিন তাঁরা বড় একটা মিছিল বের করে জ্যোতিবাবুর কুশপুত্তলিকা দাহ করল।

সি. পি. এমের সঙ্গে তখন নকশালপন্থীদের বেশ তিক্ত সম্পর্ক। কয়েক সপ্তাহ আগেই কলেজ স্ট্রীট এলাকায় তাদের বড় সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে। নকশালদের হাতে সেখানে একজন সি. পি. এম কর্মী নিহতও হয়েছিলেন। তারপর তিনদিন ধরে হস্টেলে এবং কলেজে সি. পি. এমের বাহিনী তার বদলা নেয়। দুপারটিতে ১লা মে (ময়দানের) বিরাট মারামারিও হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুরে তাই পুলিশ ভেবেছিল নকশালপন্থীদের পেটালে জ্যোতিবাবু কিছুই বলবেন না।

কিন্তু যখন সেই পেটানোটা মারাত্মক হয়ে গেল এবং যখন গোটা যুক্তফ্রন্টই দাবি করলেন যে "দুর্গাপুরের ঘটনায় জড়িত পুলিশদের সবাইকে সাসপেন্ড করা হোক" জ্যোতিবাবু তখন চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। ফ্রন্টের এক তদন্ত কমিটি দুর্গাপুরে ঘুরে এসে এস. পি সহ ছয়জন অফিসারকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং যুক্তফ্রন্ট সেই রিপোর্টটা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন : দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। তবে কাকে কাকে শাস্তি দেওয়া তা ঠিক করবেন জ্যোতিবাবু নিজেই।

জ্যোতিবাবু এই সিদ্ধান্ত মত প্রথমেই সাসপেন্ড করলেন পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুবোধ দত্তকে। সুবোধ দত্তের উপর সি. পি. এমের বেশ কিছুদিন থেকেই রাগ ছিল। তাঁদের খবর ছিল, তিনিই পুলিশকে বিদ্রোহের উসকানি দিচ্ছেন। ঘটনার দ্বিতীয় দিন সুবোধবাবু দুর্গাপুরেও গিয়েছিলেন। ফ্রন্টের তদন্ত কমিটি যেদিন সুপারিশ করলেন "দুর্গাপুরের ঘটনায় জড়িত পুলিশদের সাসপেন্ড করা হোক" তার পর দিনই সি. পি. এম রাজ্য কমিটির পক্ষে প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রকাশ্যে দাবি করলেন : অবিলম্বে সুবোধ দত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।[১২] সুবোধ দত্তও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আদালতে গেলেন। আদালত সাসপেনসন অরডারের বিরুদ্ধে ইনজাংশনের আবেদন মঞ্জুর করলেন। সুবোধ দত্তের সাসপেনসন নিয়ে পুলিশের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ল।

এই সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মন্ত্রিসভায়ও একদিন জোর আলোচনা হল। ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সির মন্ত্রীরা পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন : তাঁরা বললেন : পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে বলেই রাজ্যে এত মারামারি কাটাকাটি। তাঁরা আরও অভিযোগ তুললেন, পুলিশ এখন কায়েমী স্বার্থ এবং একটি বিশেষ দলের নির্দেশে চলছে।

এই আলোচনার খবর কাগজে কিছুটা কিছুটা বের হল। পুলিশ তাতে আরও চটল। অন্যদিকে তখনও পুলিশের উপর চড় চাপড় তো চলছেই।

ঠিক এরই কয়েকদিন পরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় একজন পুলিশ নৃশংসভাবে নিহত হলেন। একদিন পরে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসা হল আলিপুর পুলিশ লাইনে। একে তাঁরা তখন বিক্ষুব্ধ, তার উপর সহকর্মীর এই বিকৃত বীভৎস মৃতদেহ দেখে পুলিশ একেবারে ক্ষেপে উঠল।

সেই মৃতদেহ নিয়েই উত্তেজিত কয়েক শ' পুলিশ মিছিল করে যাচ্ছিলেন

---

[১২] আনন্দবাজার পত্রিকা ১১-৬-৬৯।

পুলিস গার্ড অব অনার!

রাইটারস বিলডিংসে। কথা ছিল, রাইটারস থেকে তাঁরা শ্মশানে যাবেন। এও ঠিক ছিল স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পুলিশের বড় কর্তারা সেই শবদেহে মালা দেবেন।

কিন্তু রাইটারসে পেঁছবার আগেই হঠাৎ মিছিল বিধানসভার দিকে ঘুরল এবং প্রায় ছুটতে ছুটতে বিধানসভায় ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করতে সুরু করল।

সেদিন কী কী ঘটেছিল সেটা মোটামুটি সকলেরই জানা। কিন্তু এই ব্যাপারে এখনও একটা রহস্য থেকে গিয়েছে : যারা বিধানসভায় হামলা করল, জ্যোতিবাবুর ঘরে গিয়ে দাপাদাপি করল তাঁদের ধরে না রেখে, এমন কি তাঁদের নাম-ধাম টুকে না রেখেও ছেড়ে দেওয়া হল কেন?

এ নিয়ে নানাজনে নানাকথা বলেন। অনেকে বলেন, এটা পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনকে খতম করার একটা পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত। জ্যোতিবাবুরা অবশ্য সেইদিনই অভিযোগ তুলেছিলেন, এটা কংগ্রেসী চক্রান্ত—পুলিশকে ক্ষেপিয়ে ওঁরা সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তা বলে সেদিন বিদ্রোহী পুলিশকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া হল কেন? সি· পি· এম-সৃষ্ট পাল্টা পুলিশ সংগঠনের কিছু পাণ্ডাও এই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন বলেই কি? বহু খুঁজে আমি একটা তথ্য শুধু জানতে পেরেছি, যাঁরা জ্যোতিবাবুর ঘরে দাপাদাপি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন পাল্টা পুলিশ সংগঠনের নেতা—সি· পি· এম নেতা জীবন মাইতির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি।

সে যাই হোক, এই ঘটনার পরদিনই যুক্তফ্রণ্ট দাবি করলেন : পুলিশের চার বড় কর্তা আই· জি· শচীন ঘোষ, কমিশনার পি কে সেন, ডি আই জি আই বি রণজিৎ গুপ্ত এবং প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের ডি আই জি দেবব্রত ধরকে অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে।

জ্যোতিবাবু কিন্তু তাঁদের শাস্তি দিলেন না। এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত করার দায়িত্ব দিলেন রণু গুপ্তকে। তারপর ক্যাবিনেটের মত নিয়ে সুবোধ দত্ত প্রভৃতি পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও সক্রিয় কর্মীকে সংবিধানের ৩১১ ধারা অনুসারে একেবারে বরখাস্ত করে দিলেন। এই ধারায় বরখাস্ত করার প্রধান সুবিধা, সে আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে কোনও আপিল করা চলে না!

প্রধানত দিল্লির রাজনৈতিক নাটকের প্রভাবে এবং কিছুটা পুলিশ বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট রাজনীতি জুলাই-আগস্টে মোটামুটি শান্তভাবেই কাটল। কিছুই যে ঘটছিল না তেমন নয়; তবে, তুলনামূলকভাবে তখন শরিকী সংঘর্ষ ও বিরোধ কম।

কিন্তু বেশীদিন এই শান্তভাব চলল না। দিল্লির লড়াইয়ে হারজিৎ স্পষ্ট হয়ে

যেতেই পশ্চিমবঙ্গে শরিকী বিরোধ আবার পুরোদমে সুরু হয়ে গেল।

এই পর্যায়ের প্রথম বড় ঘটনা বরাহনগরে সি পি আই, সি পি এম সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে স্থানীয় কয়েকজন সি পি আই নেতা গুরুতর আহত হলেন। সি পি আইর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হল যে স্থানীয় সি, পি, এম নেতাদের নেতৃত্বেই তাঁদের আঞ্চলিক নেতাদের উপর এই হামলা হয়েছে। তাঁরা সেইসব সি· পি· এম নেতার নামও করলেন। স্বয়ং সোমনাথ লাহিড়ি প্রথমে স্থানীয় পুলিশের কাছে এবং পরে জ্যোতিবাবুর কাছে দাবি করলেন যে ওইসব সি· পি· এম নেতাকে গ্রেফতার করতে হবে। কিন্তু কোনও দাবিই কেউ মেনে নিলেন না।

সি. পি. আই তখন ঘোষণা করলেন, তাঁরা সি. পি· এম ও জ্যোতিবাবুর এই আচরণের প্রতিবাদে যুক্তফ্রণ্টের পরবর্তী বৈঠকেই যোগ দেবেন না। সেই ঘোষণা মত তাঁরা ২রা সেপ্টেম্বরের যুক্তফ্রণ্ট বৈঠক বর্জন করলেন।

সি· পি· এম জবাব দিলেন : সি. পি. আইর সব অভিযোগ মিথ্যা। আমাদের কোনও আঞ্চলিক নেতার নেতৃত্বে সি. পি. আই নেতাদের উপর হামলা হয়নি। তাঁরা আরও বললেন, কিছু সি. পি. আই নেতা অভিযোগ করেছেন বলেই যে আঞ্চলিক সি. পি এম. নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে তার কোনওই মানে নেই।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস. ইউ. সি সি· পি· আইর পক্ষ নিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটি বললেন, "সি· পি· এমের হামলাবাজী এবং দলের স্বার্থে পুলিশ ব্যবহারের সমগ্র বিষয়টি নিয়েই এবার হেস্তনেস্ত করতে হবে।"

সি· পি· আই-ও বললেন : সি. পি. এমের হামলাবাজি বন্ধ না হলে ফ্রণ্ট টিঁকবে না।

তিনদিন পরে[১০] প্রমোদবাবু ময়দানে দলের বিরাট জনসমাবেশে বললেন : আমি সবাইকে এই বলে সতর্ক করে দিতে চাই যে সি. পি. আই পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট ভাঙগার চক্রান্ত সুরু করেছে।

সেইদিনই রাত্রে মুখ্যমন্ত্রী ইউ. এন. আইকে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বললেন : শরিকী সংঘর্ষের ঘটনায় আমি অসুখী। এই ধরনের সংঘর্ষ হ্রাস না পেয়ে যদি চলতেই থাকে তবে ভবিষ্যতে হয়ত এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যখন সহজভাবে সরকারের কাজ চালানো কঠিন হবে।

ততদিনে পশ্চিম দিনাজপুরে কানকির ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। সি. পি· এমের হামলা। বেশ বড় দরেরই। এ জিনিসটা আবার একটু হিন্দু মুসলমান কালারও নিল। হিন্দু উদ্বাস্তুরা ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে। মন্ত্রী-মিশন গেলেন সরেজমিন তদন্তে। সেখানে জেলাশাসক এবং এস· পি. প্রকাশ্যে বললেন. স্বরাষ্ট্র দফতরের চাপে সি. পি· এম সমর্থক সমাজবিরোধীদেরও ধরা যাচ্ছে না। হরেকৃষ্ণ কোঙার স্থানীয় কমরেডদের কিছুটা ধমকালেনও।

দিনকয়েক এইভাবে বেশ একটা উত্তপ্ত পরিবেশ চলার পর ৮ই সেপ্টেম্বর জ্যোতিবাবু ফ্রণ্টের মিটিং-এ ঘোষণা করলেন : বরাহনগরের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হবে। পরিস্থিতিটা তখন একটু ঠাণ্ডা হল এবং ১৭ই যুক্তফ্রণ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন : আমরা শরিকী সংঘর্ষ মেটাবই।

---

[১০] ৭-৯-৬৯।

তারপর থেকে নেপথ্যেও নানা চেষ্টা চলল অবস্থাটা আয়ত্তে আনার—শরিকী সংঘর্ষ ও বিরোধ থামাবার। সি· পি. আই ও সি. পি. এমের বিরোধ মেটাবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ এবং বাংলা কংগ্রেসের সুকুমার রায়।

এই সময়[১৪] রাজ্যপালরূপে শপথ নিলেন ধাওয়ান সাহেব। তিনিও আশা প্রকাশ করলেন : পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার সুস্থিত হবে।

অজয়বাবুরও তখন বেশ শান্তভাব। ২০শে তিনি সাংবাদিকদের বললেন : রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খুন-জখম নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন হলেও সাধারণভাবে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেনি। রাজনৈতিক দলের ঝগড়া বা মারামারি সাধারণভাবে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির মধ্যে পড়ে না।[১৫]

২৪শে শরিকী সংঘর্ষ মেটাবার উপায় নিয়ে ফ্রন্টে বিস্তারিত আলোচনা হল। সোমনাথ লাহিড়ি একটা খসড়া প্রস্তাব রাখলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শরিকী সংঘর্ষ ও বিরোধ বেড়েই চলল।

১৯শে জলপাইগুড়ি চা বাগানে এস. এস· পির সঙ্গে সি· পি. এমের জোর সংঘর্ষ হল। ২২শে রাণীগঞ্জ কয়লাখনিতে সি. পি. আই-সি. পি· এম সংঘর্ষে ১জন মারা গেলেন এবং ৮২জন আহত হলেন। ওইদিনই জলপাইগুড়ি জেলায়ও সি. পি. এমের সঙ্গে আর. এস· পির সংঘর্ষে ১৯জন আহত হলেন। ৩রা অক্টোবর মথুরাপুরে সি· পি. এম-এস. ইউ. সি· লড়াইয়ে ১জন নিহত হলেন।

বিবৃতির লড়াইর উত্তাপও ক্রমেই বেড়ে চলল। ২৪শে প্রমোদবাবু বললেন : সি. পি· আইর মত ডিজঅনেস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে কোনও লাভ নেই। ওরা প্রতিদিনই আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনছে।...এখন ওদের নীতিই হল ইন্দিরার সঙ্গে জাতীয় সরকার গঠন। তাই আজ শ্রমিক শ্রেণীর কাজ হল ওদের মুখোস খুলে ধরা। ২৬শে বিশ্বনাথবাবু জবাব দিলেন : আসলে ওরা মারধরের নীতি নিয়ে এগোতে চান। সেটাকে ঢাকার জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি কুৎসা রটাচ্ছেন। ২৭শে অশোক ঘোষ বললেন : উত্তরবঙ্গে তিনটি জেলায় পুলিশ প্রশাসন এবং কংগ্রেসের একাংশ ও সমাজবিরোধী শক্তিদের যোগসাজসে সি. পি· এম এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে সাধারণ প্রগতিশীল মানুষও ভিন্নমত পোষণ করতে সাহস না পায়।

কিন্তু এই অবস্থাতেও শরিকী সংঘর্ষ মেটাতে ফ্রন্ট সর্বসম্মত একটা প্রস্তাব নিলেন :

(১) নেতারা যৌথভাবে জেলা সফরে বের হবেন।

(২) ব্লক স্তর পর্যন্ত পার্টিগুলি নিজেরা বসে শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করবেন।

---

[১৪] ১৯-৯-৬৯।

[১৫] আনন্দবাজার ২১-৯-৬৯।

(৩) শিল্পাঞ্চলে বিরোধের আশংকা থাকলে প্রয়োজনে শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন বন্ধ রাখতে হবে।

(৪) ধানকাটার সময় বিরোধ এড়াবার জন্য নিম্নস্তরে মিটমাটের চেষ্টা হবে ; এবং,

(৫) পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার বন্ধ হবে।

আর, বিভিন্ন দফতর নিয়ে আলোচনা সুরু হবে। প্রথমেই হবে স্বরাষ্ট্র দফতরের পর্যালোচনা।

সোমনাথ লাহিড়ি এই সঙ্গেই প্রস্তাব করেছিলেন : লাঠি, বল্লম, ইত্যাদি নিয়ে মিছিল বন্ধ রাখতে হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস এবং এস· এস· পি। কিন্তু সি. পি. এম তাতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন : ওসব গ্রামের লোকের আত্মরক্ষার অস্ত্র। চিরকালই সঙ্গে নিয়ে চলে। এখনও চলবে।

ইতিমধ্যে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সেটা হল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অজয়বাবুর নিভৃত আলোচনা। ২৬শে সেপ্টেম্বর দিল্লিতে দুজনে একান্তে অনেকক্ষণ কথা বললেন।

ইন্দিরা গান্ধী দিল্লিতে তখন তাঁর প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিয়েছেন। গোটা দেশে তখন তাঁর বিরাট ইমেজ। বেশ কিছুদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। দিল্লির ঝড়টা কিছুটা কমতেই তাই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কথা বলার জন্য অজয়বাবুকে দিল্লি ডেকে পাঠালেন।

অজয়বাবু কলকাতা ফেরার পর বেশ জল্পনা কল্পনা সুরু হয়ে গেল। সকলেই জানতে উৎসুক, কী আলোচনা হয়েছে দুই প্রধানে। কিন্তু বাইরের কেউই কিছু জানতে পারলেন না। নানা জন শুধু নানা আন্দাজ করলেন।

প্রায় দু সপ্তাহ পরেই সবাইকে চমকে দিলেন অজয়বাবুর দল বাংলা কংগ্রেস। ৭ই অক্টোবর তাঁদের সম্পাদকমণ্ডলী এক প্রস্তাবে বললেন : প্রশাসন যন্ত্রের ঔদাসীন্য জনমানসে এক চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তার সঞ্চার করেছে। দলবিশেষের নামে সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা শান্তিপ্রিয় রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। সেই দলের সদস্য না হলে পথচলা ও জীবন ধারণ করা অসম্ভব করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা, মানুষের সাধারণ অধিকার বিপন্ন হয়ে পড়েছে।...যদি অবিলম্বে এই ব্যবস্থার সুরাহা না হয় তাহলে বাংলা কংগ্রেস গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে এই অসহনীয় পরিস্থিতির প্রতিরোধে আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বেজে উঠল।

আরও উত্তাপ

বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর এই প্রস্তাব দেখে সবাই বুঝলেন, অবস্থাটা বেশ খারাপ। তবে, অবস্থাটা ঠিক কতটা খারাপ তা নিয়ে নানামুনি নানা মত প্রকাশ করলেন।

একটা মত হল : প্রস্তাবে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে অজয়বাবু পুরোপুরি একমত নন। তিনিও মনে করেন, অনেকটা বাড়িয়েই বলা হয়েছে। আসলে এটা সুশীল ধাড়া করিয়েছেন। সুশীল ধাড়া বাংলা কংগ্রেসের নামে যে সব কথা বলিয়েছেন অজয়বাবু মোটেই তা বলতে চান না।

সুকুমার রায়ের দেওয়া কতকগুলি খবর এই মতকেই সমর্থন করল। সুকুমার-বাবু তখনও বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তিনি গোপনে সি. পি. এম সহ বিভিন্ন দলকে জানালেন : এই রকম একটা প্রস্তাব খবরের কাগজে রিলিজ করার জন্য অজয়বাবু সুশীলদের উপর ভীষণ চটেছেন।

প্রধানত এই খবরের উপর ভিত্তি করেই সি. পি. এম মনে করলেন যে, এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করলে কাজ হবে—অজয়বাবু নিজেই সুশীল ধাড়াদের উপর চাপ দেবেন। বাংলা কংগ্রেস বেকায়দায় পড়বে।

যেদিন বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের খবর কাগজে বের হল সেইদিনই তাই সি. পি. এমের পলিটব্যুরো এক কড়া বিবৃতি দিয়ে বললেন : বাংলা কংগ্রেসের অবাস্তব প্রস্তাব সকল ফ্রণ্টবিরোধী শক্তি, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এবং কায়েমী স্বার্থকে খুশী করবে।...এই প্রস্তাবের সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই।

বাংলা কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের ব্যাপারে সি. পি. এমের আরও একটা সুবিধা ছিল। তাঁরা জানতেন, সি. পি. এম বিরোধী অন্যান্য দলও এমন বক্তব্য প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারবেন না।

তাঁদের অনুমানটা ঠিকই ছিল। সেইদিন রাতেই যুক্তফ্রণ্টের বৈঠক বসল। ফ্রণ্টে অবশ্য বাংলা কংগ্রেসের বিবৃতির প্রসঙ্গটা উঠল একেবারে শেষের দিকে। ও নিয়ে যে তেমন কোনও আলোচনা হল তাও নয়। সি. পি. এম তারই মধ্যে বুঝতে পারলেন যে, এ ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে কেউ নেই।

ফ্রণ্টের বৈঠকে অজয়বাবুর কথাবার্তায়ও সেদিন বেশ নরম সুর। তিনি বললেন : ওই প্রস্তাব নিয়ে আপনারা ফ্রণ্টে আলোচনা করতে চাইলে আমার তেমন আপত্তি নেই। তবে, বিস্তারিত আলোচনা করা চাই।

সি. পি. এম তাতে আরও উৎসাহিত হলেন। চাপ আরও বাড়ালেন। তাঁরা তখন সুকুমার রায়ের কাছ থেকে নিয়মিত খবর পাচ্ছেন : অজয়বাবু এই প্রস্তাব নিয়ে সুশীলের উপর ভীষণ চটেছেন। রোজ ধমকাচ্ছেন। ১১ই অক্টোবর জ্যোতিবাবু ফ্রণ্টের সব শরিককে একখানা কড়া চিঠি দিলেন। তাতে বললেন :

বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্পর্কে যতক্ষণ না একটা কিছু করা হচ্ছে, ততক্ষণ ওঁদের সঙ্গে একত্রে জনসভা করতে যাওয়া ভণ্ডামী। সুতরাং, যুক্তফ্রণ্ট জেলায় জেলায় যৌথ জনসভা করার যে প্রস্তাব নিয়েছে তা বন্ধ রাখা হোক। আমরা অবিলম্বে ফ্রণ্টের বৈঠকে বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চাই।

জ্যোতিবাবু যেদিন সবাইকে এই চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রীও সেদিন রিপোর্টারদের প্রশ্নের জবাবে বললেন : যা ঘটছে আমরা তাই বলেছি। ফ্রণ্টের বৈঠকে আমরা সব তথ্য পেশ করতে রাজী। এ নিয়ে আলোচনায় আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আমরা চাই ফ্রণ্টের স্বার্থেই অবিলম্বে এ জিনিষ বন্ধ হোক।

পরদিন[১] ফ্রণ্টের বৈঠকে ঠিক হল বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য ১৬ই বিশেষ বৈঠক হবে। অজয়বাবু তখনও বলছেন : তাহলে ইতিমধ্যে ফ্রণ্টের সিদ্ধান্ত মত যৌথ জনসভাগুলি হোক।

কিন্তু সি. পি. এম তাতে ঘোরতর আপত্তি জানালেন।

এরপর কিন্তু আস্তে আস্তে অবস্থাটা খারাপের দিকে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে ১২ই ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটি এক প্রস্তাব পাশ করে বলেছেন : সি. পি. এম রাজ্যের প্রশাসন যন্ত্র বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র বিভাগ ব্যবহার করে নিজেদের দলীয় সংগঠন বাড়াবার চেষ্টা করছে। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সহায়তা করছে এবং সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের আশ্রয় দান করছে। পরদিনই এস. এস. পি নেতা জর্জ ফারনানডিজও ঘোষণা করলেন : পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এমের উদ্দেশ্য যেমন করেই হোক অন্য দলকে খতম করা।

১৪ই বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী বসে আবার গোটা পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে বললেন : ফ্রণ্ট সরকারের কতকগুলি সাফল্যও আছে। আমরা তাও স্বীকার করি।...কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলছি, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সি. পি. এম দায়ী।...আমরা সি. পি. এম সহ ফ্রণ্টের সব দলের কাছে আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপ বন্ধের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

এই প্রস্তাব দেখে সি. পি. এম ভাবলেন, তাহলে তাঁদের আক্রমণে কাজ হয়েছে। তাঁরা আরও মনে করলেন, তাহলে অজয়বাবুর সঙ্গে একবার সোজাসুজি কথা বলে দেখা যাক। সুকুমার রায়ও সি. পি. এম নেতাদের পরামর্শ দিলেন যে, ফ্রণ্টের বৈঠকের আগে সোজাসুজি একবার অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে নেওয়াই ভাল।

সেইমত ১৫ই জ্যোতিবাবু এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার রাইটারস বিলডিংসেই অজয়বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা। কিন্তু তাতেও তাঁরা অজয়বাবুর মনোভাবটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

সেই বৈঠকের পরই আমি হরেকৃষ্ণবাবুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কী বুঝলেন?

---

[১] ১২-১০-৬৯।

হরেকৃষ্ণবাবু চিন্তিত ভাবে জবাব দিলেন : অনেক কথা বলেও তো ঠিক বুঝতে পারলাম না মশাই!

সেই বৈঠকের কথাবার্তার কিছুটা—

অজয় মুখার্জী : সব পারটিকে ফ্রণ্টের সব সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। সি. পি. এমকে জুলুম বন্ধ করতে হবে।

জ্যোতিবাবু : এইসব জুলুমের নজির দিন।

অজয় মুখার্জী : ফ্রণ্টের মিটিং-এ দেওয়া হবে।

হরেকৃষ্ণ কোঙার : বাজারে কিসব কাণাঘুষা শুনছি—ফ্রণ্ট নাকি ভেঙে যাবে!

অজয় মুখার্জী : সব মিথ্যা। আমিও চাই ফ্রণ্টকে শক্তিশালী করতে এবং সেইজন্যই মনে করি, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই হবে।[২]

পরদিন ফ্রণ্টের বৈঠক বসল বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য। জ্যোতিবাবুই প্রথম বলতে শুরু করলেন : বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব। নানা অসত্য অভিযোগে ভর্তি। কেন এইসব অসত্য কতকগুলি অভিযোগ খবরের কাগজে দেওয়া হল আমি তা জানতে চাই। বাংলা কংগ্রেসের জবাব দিতে হবে। জ্যোতিবাবু বেশ কড়া মেজাজেই বলছিলেন কথাগুলি।

তাই শুনে অজয়বাবু রেগে লাল হয়ে উঠলেন। ফ্রণ্টের বৈঠকে সাধারণত তিনি বেশী কথা বলেন না। কিন্তু এইদিন বললেন : কাল তো জ্যোতিবাবু এই ভাষায় কথা বলেননি! আজ এমন সুর কেন?...আমি কি মুখ্যমন্ত্রী, না মুখ্যমন্ত্রী? আমি কি বোবা, কালা, কানা? আমি কি দেখতে পাচ্ছি না রাজ্যে কী হচ্ছে? কী ঘটছে?...

তারপরই তিনি সুশীলবাবুকে বললেন : সুশীল, সব ফ্যাক্টগুলি প্লেস কর তো।

সুশীলবাবু তখন ফাইল টেনে নিয়ে সব তথ্য পেশ করতে সুরু করলেন—লুঠতরাজ, খুন জখম, মারামারি, কাটাকাটি, নারী নিগ্রহের এক ভয়াবহ চিত্র!

তিনি শেষ করতে না করতেই চেঁচিয়ে উঠলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নির্মল বসু : দিকে দিকে পুলিশ সি. পি. এমের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সি. পি. এম ফ্রণ্টের নির্দেশ মানছে না। জোরজুলুম চলছে সর্বত্র। এবার আমাদেরও দলের কর্মীদের বলতে হবে, পাল্টা মার চালাও।

সোমনাথ লাহিড়ি কোনও দিনই খুব খারাপ ভাষা ব্যবহার করেন না। চটে গেলেও না। এইদিনও তিনি কোনও খারাপ কথা বললেন না। শুধু সি. পি. এমের কাছে জানতে চাইলেন : আপনাদের নেতা সুন্দরায়া বলেছেন, ফ্রণ্টে সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, এস ইউ সি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক এই কয়টি জনবিরোধী দল আছে। আগে তাই আপনারা স্থির করুন এই জনবিরোধী দলগুলির সঙ্গে

---

২ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৬-১০-৬৯।

থাকবেন কিনা, তারপর অন্যসব আলোচনা হবে।

সি. পি. এম কোনও জবাবই দিতে পারলেন না।

কনফিউশনের মধ্যেই সেদিন ফ্রণ্টের বৈঠক ভেঙ্গে গেল।

একদিকে যখন মারামারি কাটাকাটি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলছে অন্যদিকে তখন মারামারি কাটাকাটিও অবিরাম চলছে। এই সময় বারুইপুরে সি. পি এমের সঙ্গে এস. এস. পির একটা বিরাট মারামারি হয়ে গেল। সি· পি· এমের সমর্থকরা এস. এস. পি সমর্থকদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিলেন। কয়লা খনি অঞ্চলেও মারামারি চলছে। শ্রীপুর খনি অঞ্চলে এর আগেই একটা বড় দরের মারামারি হয়ে গিয়েছে। ১৯শে সুশীল ধাড়া সেখানে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলেন। তাই নিয়েই আবার একটা বড় হাঙ্গামা হল। শ্রীপুরে কারফ্যুও জারি করা হল। ২৩শে কোচবিহারে সি. পি. এমের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের একটা বড় সংঘর্ষ হয়ে গেল।

সব মিলিয়ে যখন এই রকম উত্তপ্ত অবস্থা তখন ২৪শে অক্টোবর ত্রিভেন্দ্রাম থেকে কেরলের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতনের খবর এল।

নেতারা অনেকেই যদিও বললেন যে, কেরলের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না, বাইরের কারুরই কিন্তু বুঝতে তেমন অসুবিধা হল না যে, এর পর আর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্টও বেশীদিন টিঁকবে না।

সি. পি. এম পলিটব্যুরো অবশ্য স্বীকার করলেন যে, এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পড়বে। তিক্ততা আরও বাড়বে। তবে, এই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সব দোষটা চাপাবার চেষ্টা করলেন সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস· ইউ· সির ঘাড়ে। এক বিবৃতিতে পলিটব্যুরো বললেন : কেরলের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা পশ্চিমবঙ্গেও আঘাত হানার চেষ্টা করবে। সি. পি. আই. বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ· সি যে পথ ধরেছে সেটা প্রতিক্রিয়াশীলদের চরকায় তেল দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। জনগণের সতর্কতাই এই ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করতে পারে।

সি. পি. এম এই সময় থেকেই ঠিক করে ফেললেন : শরিকী আলাপ আলোচনার উপর আর খুব বেশী ভরসা না করে জনগণকে প্রস্তুত করতে হবে এবং বিভিন্ন সি. পি. এম-বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের উপর জনগণকে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করাতে হবে যাতে তাঁরা পথ পাল্টাতে বাধ্য হন।

তবে, এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আরও স্থির করলেন যে, এমন কিছু করবেন না যাতে জনগণ মনে করেন সি. পি. এমই যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভাঙছে।

তবু কিন্তু ২৫শে যুক্তফ্রণ্ট বৈঠকে মনে হল অবস্থাটা তত খারাপ নয়! সেইদিনের বৈঠকে কয়েকজন নেতা প্রস্তাব করলেন : বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা বন্ধ করা হোক এবং দফতরওয়ারী আলোচনা সুরু হোক। সুশীল

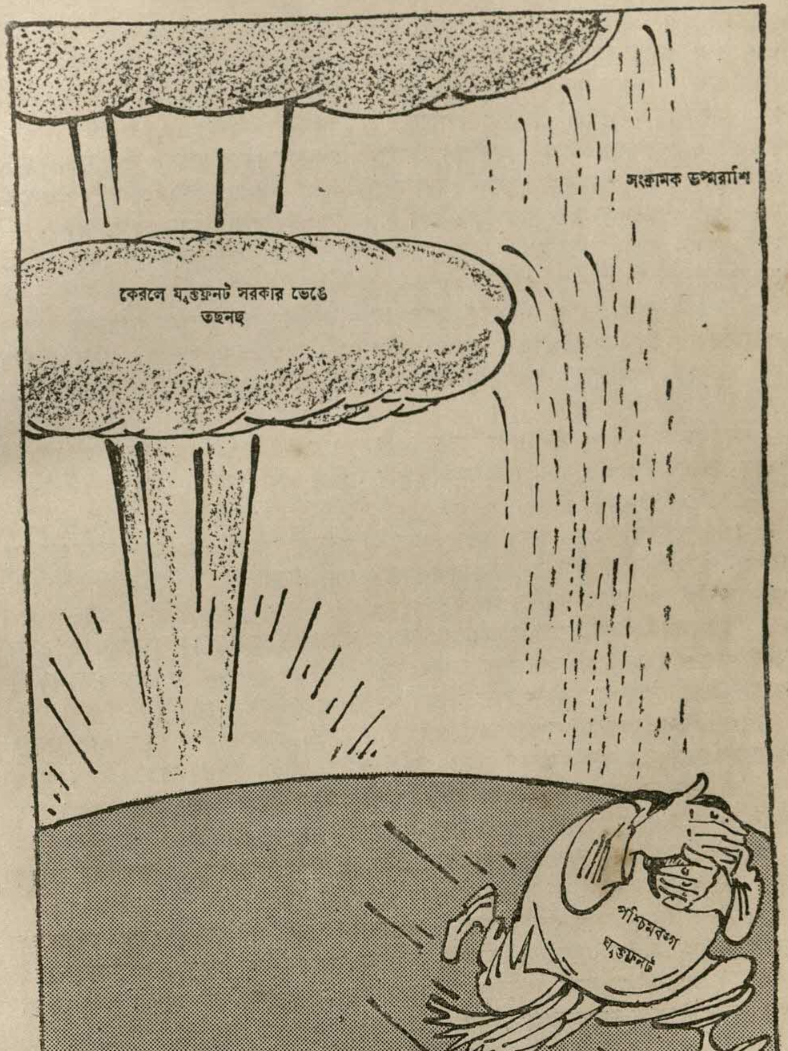
সংক্রামক ভস্মরাশি
কেরলে যুক্তফ্রনট সরকার ভেঙে
তছনছ
পশ্চিমবঙ্গ
যুক্তফ্রন্ট

ধাড়া কিন্তু তাতে আপত্তি জানালেন। বললেন, যে সব অভিযোগ আমরা করেছি সেগুলি প্রমাণ করার সুযোগ চাই।

সি. পি. এম সহ অন্যদের কিন্তু তখন সে আলোচনায় তেমন উৎসাহ নেই। তাই নমঃ নমঃ করেই বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শেষ হল।

সুশীল ধাড়া তাঁদের দলের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন : আমরা দুটো প্রস্তাবে ফ্রন্ট শাসনের দুটো দিক দেখিয়েছি। প্রথমটায় ব্যর্থতার দিকটা বলেছি, দ্বিতীয়টায় সাফল্য উল্লেখ করেছি। আমাদের প্রস্তাব নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। যে সব অভিযোগ করেছি তা নতুন নয়। অন্যান্য দলও করেছেন। এইসব অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সব অভিযোগই সত্য এমন কথা বলব না। সত্য মিথ্যা যাচাই করা হোক। আমরাও চাই ফ্রন্ট থাকুক। আমরাও চাই সরকার চলুক।

জোরজুলুম ও খুনোখুনী সম্পর্কে সুশীলবাবু কতকগুলি তথ্য পেশ করলেন। সেই তথ্যগুলি এই রকম : সাত মাসে ২১১জন খুন। ১৫জন মহিলা অত্যাচারিত। হাসপাতালে ডাক্তার নার্স নিগ্রহের ঘটনা ৩৭ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘেরাও ও মারধরের ঘটনা ৪০।

ব্যাপারটা এইখানেই চাপা দেওয়ার চেষ্টা হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্টের "ঐক্য অটুট" রাখার জন্য একটা সাতদফা কর্মসূচীও গৃহীত হল।

সেই সাতটা দফা :

(১) শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য ইতিপূর্বে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তা ছাপিয়ে হাজারে হাজারে জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করে ফ্রন্টের শরিক দল-গুলির কর্মীদের মধ্যে বিলি করা হবে।

(২) সব শরিক দলের কর্মীদের কাছে আবেদন করা হবে যাতে তাঁরা ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং ফ্রন্টকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন—যাত কেউ না পারস্পরিক সংঘর্ষ ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হন।

(৩) ধান কাটার সংঘর্ষ এড়াবার জন্য রাজ্য সরকার যে সার্কুলার জারি করেছেন তাকে কার্যকর করার জন্য একটি গাইড লাইন তৈরী করতে হবে।

(৪) কয়লা খনি অঞ্চলে শরিকী সংঘর্ষ দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট দলের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতাদের অবিলম্বে বৈঠক বসবে।

(৫) শিক্ষা সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট কমিটি যে প্রস্তাব নিয়েছে তা কার্যকর করার জন্য অবিলম্বে যুক্তফ্রন্টের বৈঠক বসবে।

(৬) শরিকী সংঘর্ষের অবসান ঘটানোর জন্য বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সমবেতভাবে বিভিন্ন এলাকায় জনসভা করবেন। সভার দিন পরে ঠিক হবে। এবং,

(৭) শরিকী সংঘর্ষে হতাহতের বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে।

ষোল ঘণ্টা বৈঠকের পর সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তফ্রন্ট এই সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং, অনেকেই আশা করলেন যে, এরপর অন্তত কিছুদিন শান্তিতে কাটবে।

কিন্তু সব আশা বিফল হল। পাঁচদিন পরেই সুন্দরায়া কলকাতায় এক প্রেস

কনফারেনসে বললেন: সি. পি. আই পশ্চিমবঙ্গেও সি. পি. এমকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। কংগ্রেস, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিজোট, এস. এস. পি নেতা রাজনারায়ণ এবং আরও অনেকে অজয়বাবুকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তিনি জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেন। যদি এই কথামত মুখ্যমন্ত্রী কাজ করেন তাহলে তিনি যুক্তফ্রণ্টের পতন ডেকে আনবেন।

তখন বাঁকুড়ায় বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন চলছিল। সেখানে প্রতিনিধিরা একের পর এক দাঁড়িয়ে সি. পি. এমের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ জানালেন। ললিত সিংহ প্রভৃতি প্রকাশ্যেই দাবি তুললেন, জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেওয়া হোক।

অজয়বাবু এবং সুশীলবাবু সরাসরি এই দাবি সম্পর্কে কিছু না বললেও স্বীকার গেলেন যে রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ। তাঁরা এর একটা বিহিত করবেনই।

মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা সংযত ভাষায়ই বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু সুশীলবাবু একেবারে আগুন ছোটালেন। তিনি বললেন: সি. পি. এম দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। তার প্রতিবাদ উঠেছে দিকে দিকে। মানুষ জেগেছে। নারী নিগ্রহ যেমন কুরু বংশ ধ্বংস করেছিল তেমন যুক্তফ্রণ্টকেও ধ্বংস করবে।...যুক্তফ্রণ্ট ভাঙ্গার চেষ্টা সবার আগে সুরু করেছে সি. পি. এম।

সম্মেলন শেষ হল ৩রা নভেম্বর। মূল প্রস্তাবে বলা হল: যদি অবিলম্বে রাজ্যে অরাজকতা ও শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ না হয় তবে বাংলা কংগ্রেস উপযুক্ত সময়ে প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করবেন।

একদিকে সি. পি. এম এবং বাংলা কংগ্রেসের কন্ঠে উত্তাপ, আর একদিকে খুন জখম এবং শরিকী সংঘর্ষ অব্যাহত। ১লা নভেম্বর সোনারপুরে সি. পি. এম, সি. পি. আই সংঘর্ষে ৩জন সি. পি. আই কর্মী মারা গেলেন। ৩রা হল কোচবিহারে সংঘর্ষ—সি. পি. এম বনাম ফরওয়ার্ড ব্লক। মারা গেলেন ২জন। সেইদিন ক্যানিং-এও ধানকাটা নিয়ে সি. পি. এম ও আর. এস. পিতে জোর সংঘর্ষ হল। একটি শিশুকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হল।

৬ই বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী কলকাতায় সিদ্ধান্ত নিলেন: অবস্থার কোনও উন্নতি হচ্ছে না। বরং খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ রাখার মত কোনও কারণ ঘটেনি। প্রতিরোধ আন্দোলন করতেই হবে।

বাংলা কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য বললেন না তাঁরা কীভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনটা করবেন। কিন্তু তা বলে রিপোর্টারদের জানতে বাকি থাকল না যে অজয়বাবু সহ সবাই কিছুদিনের মধ্যেই সত্যাগ্রহ সুরু করবেন।

সি. পি. এম এই সময় মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে অজয়বাবু আর

এই মন্ত্রিসভা চালাতে চান না। তাঁরা বুঝলেন, তিনি বড় রকমের একটা কিছু করবেনই। তাঁরা শুনলেন, অজয়বাবু জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

অজয়বাবুর মনোভাব ভাল করে বোঝার জন্য এই সময় জ্যোতিবাবু নিজেও একবার তাঁর সংগে কথা বলতে বসলেন। ৪৫ মিনিট ধরে কথা হল। কিন্তু তাতেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না।

এই বৈঠকের পরই অজয়বাবু সাংবাদিকদের বললেন: রাজ্যে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি একই রকম চলছে। শরিকী সংঘর্ষ লেগেই আছে। খুনখারাপিও হচ্ছে। আমি জানি না কিভাবে এই সংঘর্ষ বন্ধ হবে।

তার পরদিন সকালেই সি. পি. এমের রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী গোটা বিষয়টা পর্যালোচনা করতে বসলেন। তাঁরা বুঝলেন, এখন আর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোনও ফল পাওয়া যাবে না। তাঁদের তখন বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ যে কোনও দিন জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেবেন। তাঁরা এও ধরে নিয়েছেন যে অজয়বাবু আর তাঁদের নিয়ে সরকার চালাবেন না।

সি. পি. এম নেতৃত্ব তখন দুটো সিদ্ধান্ত নিলেন: (১) তেমন অবস্থার সৃষ্টি হলে অজয়বাবুকে বাদ দিয়েই বিকল্প মন্ত্রিসভা গড়া যায় কিনা তা অত্যন্ত গোপনে যাচাই করে দেখবেন। এবং, (২) বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ চালাবেন।

সি. পি. এম নেতারা জানতেন যে বাংলা কংগ্রেসে কোনও বড় রকমের ভাংগন ধরাতে না পারলে এবং আর. এস. পি, লোকসেবক সংঘ, গোর্খা লীগ ও এস. এস. পি-র বেশ কিছু এম. এল. এ-কে না পেলে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। কারণ, তাঁরা তখন এটা বুঝে গিয়েছেন যে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি, বিদ্রোহী পি. এস. পি পুরোপুরি অজয়বাবুর সংগে।

সি. পি. এম নেতারা সেইমত চেষ্টা সুরু করলেন। তাঁরা বাংলা কংগ্রেসের এম. এল. এ ভাঙ্গাবার জন্য সুকুমার রায়কে ধরলেন। সুকুমার রায়ও তাঁদের ভরসা দিলেন যে তিনি জনা পনেরো এম. এল. এ এনে দেবেন। আর. এস. পির সংগে কথা বলে দেখলেন তাঁদেরও তেমন আপত্তি নেই। আর. এস. পি আরও কোনও এম. এল. এ জোগাড় করতে পারবেন কিনা তাও জানতে চাইলেন সি. পি. এম নেতারা। তাঁরা বিশেষভাবে যতীন চক্রবর্তীর সাহায্য চাইলেন। যতীনবাবু আবার পরামর্শ দিলেন, আশু ঘোষের সাহায্য নিলে হয়। সেইমত একদিন হাইকোর্ট পাড়ায় স্নেহাংশুকান্ত আচার্য এবং যতীন চক্রবর্তী আশুবাবুর সংগে অনেকক্ষণ কথা বলেন। মামলার জন্য আশুবাবুর তখন অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বিশেষ প্রয়োজন। তিনি তাই আচার্য সাহেব ও যতীন চক্রবর্তীকে আশার বাণী শোনালেন। ডিফেকসন করানোর ব্যাপারে আশুবাবুর বেশ নামডাক। তিনি কথা দিলেন:

কিছু ভাববেন না, সময়মত আমি এম. এল. এ এনে হাজির করব।°

অন্যদিকে ৮ই নভেম্বরই জ্যোতিবাবু ফ্রন্টের সব শরিকের কাছে এক চিঠি লিখে বাংলা কংগ্রেসের সেই বহু আলোচিত বিবৃতির প্রসঙ্গটা আবার তুলে ধরলেন। যুক্তফ্রন্টের ২৬শে অক্টোবরের বৈঠকের পর সবাই ধরে নিয়েছিলেন, ও প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গিয়েছে। সেদিন ফ্রন্টে যে সর্বসম্মত মিটমাটের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে সি. পি. এমও পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তবু জ্যোতিবাবু তাঁর চিঠিতে লিখলেন: বাংলা কংগ্রেস যা করছে ও বলছে তাতে সি. পি. এম এবার জনগণকে সব জানাতে বাধ্য হচ্ছে।...বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের সঙ্গে আমরা যে সম্পূর্ণ ভিন্নমত তা বারবার বলেছি।...মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যেভাবে ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা হচ্ছে তা কোনও শত্রুও করতে পারে না। সাতদফা কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার পরও ওরা আমাদের এবং ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েই চলেছে। এ জিনিষ মেনে নেওয়া যায় না।

বুঝতে কারুরই বাকি রইল না সি. পি. এম এবার মনঃস্থির করে ফেলেছে। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী পি. এস. পি এর বহুদিন আগে থেকেই গোপনে আলাদা বৈঠক সুরু করেছেন। জ্যোতিবাবুর এই চিঠি নিয়েও তাঁরা এক গোপন বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। সেই বৈঠকে সুশীল ধাড়াকেও ডাকা হল। তারপর সবাই জ্যোতিবাবুর চিঠি সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে প্রেসকে তাঁদের রিঅ্যাকসন জানালেন।

সি. পি. আই বললেন: দেখা যাচ্ছে, সি. পি. এম পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে চায়।

ফরওয়ার্ড ব্লক বললেন: ওরা যে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গতে চায় এটা তার প্রমাণ।

এস. ইউ. সির সুর একটু নরম। তাঁরা বললেন: হঠাৎ এমন চিঠি লেখা হলো কেন আমরা বুঝেই উঠতে পারছি না।

জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারেও অজয়বাবু তখন প্রায় মনঃস্থির করে ফেলেছেন। তিনি একদিন রাজ্যপালের সঙ্গেও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন। রাজ্যপাল ততদিনে অজয়বাবুর মুখ্য উপদেষ্টা। দিল্লি থেকেও ধাওয়ান সাহেবের কাছে নির্দেশ এসে গিয়েছে—অজয়বাবুর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করুন।

ধাওয়ান সাহেব অজয়বাবুকে বললেন: আইনত আপনি জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে দফতর কেড়ে নিতে পারেন ঠিকই। কিন্তু ফ্রন্টের অন্যান্য দল অর্থাৎ অধিকাংশ

° এইসব আলাপ আলোচনা অত্যন্ত গোপনে চলেছিল। প্রতিপক্ষ তখন কিছুই জানতে পারেননি। প্রথম ধরা পড়েন সুকুমার রায়। বাংলা কংগ্রেসের কিছু নেতার সঙ্গে তিনি একদিন গোপনে গোটা প্ল্যানটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সুশীল ধাড়া সেই আলোচনা বৈঠকে লুকনো টেপ রেকর্ডার সহ তাঁর এক অতিবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ঢুকিয়ে দেন। তিনি চাদরের তলায় ছোট্ট টেপ রেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতেই প্রথম সব ধরা পড়ে।

এম. এল. এ কি আপনার এই অ্যাকশন সমর্থন করবেন? আগে সেটা জেনে নিন। না হলে পরে সব জট পাকিয়ে যেতে পারে।

অজয়বাবু তখন তাই করলেন। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী পি. এস. পি-র নেতাদের কাছে প্রস্তাবটা রাখলেন। বললেন, এটা করলে অনেকটা কাজ হবে—সি. পি. এম আর পুলিশ নিয়ে যথেচ্ছাচার চালাতে পারবে না। প্রশাসনিক যন্ত্রের উপর ওদের নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল হয়ে আসবে, যুক্তফ্রন্ট সরকার বেঁচে যাবে।

কিন্তু তবু সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি সে প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। তাঁরা বললেন: তা হয় না। আমরা এ জিনিষ সমর্থন করতে পারব না।

সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি তিন দলই এই সময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন: সি. পি. এম বা বাংলা কংগ্রেস কাউকে বাদ দিয়েই আমরা সরকার গঠনে সম্মত নই।

অজয়বাবু তখন ওই তিন দলের উপরও চটলেন।

এরপর ভাঙনের ঘণ্টা খুব জোরে বাজতে সুরু করল।

১০ই নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করলেন: এখানে সভ্য সরকার আছে বলে মনে হয় না। ধান আদায় করা, ঘেরাও করা, পিটিয়ে দেওয়া, খুন জখম প্রভৃতি নিগ্রহ রুটিনমাফিক চলতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে—বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। যেখানে এরকম চলে সেখানে সভ্য সরকার আছে বলেই মনে হয় না।

একজন রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করলেন: সরকারের কি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব নেই?

মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন: আমি অসভ্য সরকারের চিফ মিনিসটার! কী করব!

১২ই রিপোর্টারদের কাছেই এর জবাব দিলেন জ্যোতিবাবু: আমি নিজেকে অসভ্য সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলে মনে করি না। বাংলা কংগ্রেস যেসব কথা বলছে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি তেমন হয়ে থাকলে আমি উপমুখ্যমন্ত্রী থাকতাম না।

সেইদিনই বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী আলটিমেটাম দিলেন: ২৭শে নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ১লা ডিসেম্বর থেকে আমরা গণ-অনশন সুরু করব। সেই গণ-অনশনে নেতৃত্ব করবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

এর পরের কয়েকদিনের ঘটনা পর পর তুলে দিচ্ছি।

১৬ই:

ধানকাটা নিয়ে ২৪ পরগণায় সি. পি. এম-এস. ইউ. সি এবং সি. পি. এম-

আর. এস. পি সংঘর্ষ। তিনদিনে ২জন নিহত। আহত ৮০।

কলকাতার ময়দানে ডাঙ্গের বক্তৃতা: সি. পি. এম পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সব দলকে খতম করে একচ্ছত্র আধিপত্য চায়। ফ্রন্টের সব দল ও দেশের মানুষকে এক হয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। যদি ভাল কথায় কাজ না হয় তবে সি. পি. এমের লাঠির জবাব লাঠিতেই দিতে হবে।

১৮ই :

ধানকাটা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, আগুন।

কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য: খুন জখম লুঠপাট দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। এই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যই কি জনসাধারণ ফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিল!

১৯শে :

ধানকাটা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ—নিহত ৩।

২২শে :

প্রমোদবাবুর মন্তব্য: এখন পুঁজিপতির স্বার্থে না চলে জনগণের স্বার্থে পুলিশ চলছে, তাই মুখ্যমন্ত্রী এত বিব্রত।

২৪শে :

প্রমোদবাবুর মন্তব্যের জবাবে অজয়বাবু: বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে সশস্ত্র অভিযান, জোরজুলুম, গুণ্ডামি, লুঠতরাজ, নরহত্যা, গৃহদাহ, প্রভৃতি যেসব অরাজকতা চলছে তার অনেকগুলিই করেছে এবং করছে সি. পি. এম—যার নেতা ও পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং প্রমোদ দাশগুপ্ত।

কয়লা খনি অঞ্চলে সি. পি. এম-এস. এস. পি সংঘর্ষ। ১জন নিহত ও ৩৬জন আহত।

বাংলা কংগ্রেসের ঘোষণা: আমরা ১লা ডিসেম্বর থেকে যে গণ-সত্যাগ্রহ করব তা কোনও দল বা সরকারের বিরুদ্ধে নয়। আমরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে জনমত গড়ার জন্য এইভাবে সত্যাগ্রহ করছি।

রিপোর্টারদের কাছে জ্যোতিবাবু: আইন ও শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী অনশন সুরু করছেন। কিন্তু আসলে তাঁর সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকারকে রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়ার রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে।

২৫শে আরও জোরে দামামা বেজে উঠল।

কলকাতায় সি. পি. এম নেতারা দলের কর্মী ও সমর্থকদের "প্রস্তুত থাকতে" নির্দেশ দিলেন। দলীয় মুখপত্রে বলা হল: বর্তমান কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্টের জায়গায় সি. পি. এমের বিরুদ্ধে একটা নতুন ফ্রন্ট গঠনের চক্রান্ত অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। যে কোনও অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।... সরকার থেকে সি. পি. এমকে বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট শুরু করে দেওয়া হয়।

আর একদিকে দিল্লিতে সি. পি. আই-র জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব নেওয়া হল: সি. পি. এম পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দস্যুবৃত্তি করছে। তাঁরা প্রশাসনিক যন্ত্রেরও

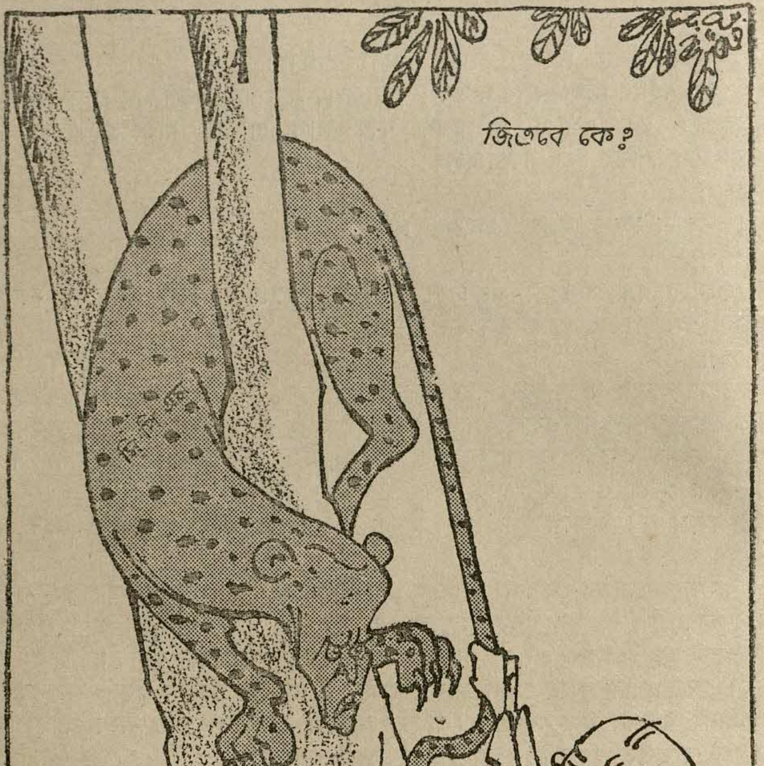

জিতবে কে?

অপব্যবহার করছে।

তখন অজয়বাবুও দিল্লিতে। সেইদিন রাত্রেই তিনি বহুক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। অজয়বাবু নিজেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। দিল্লি যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠতমদের বলে গেলেন: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সব ফাইনাল করব।

এদিকে সি. পি. এম কিন্তু তখন আবার খবর শুনেছেন যে দিল্লি থেকে ফিরে এসেই অজয়বাবু জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেবেন। তাঁরা ঘোষণাই করে রেখেছিলেন, জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নেওয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবে, অর্থাৎ সি. পি. এম এবং তাঁর সমর্থক দলগুলি মন্ত্রিসভা থেকেই বেরিয়ে যাবেন।

কিন্তু তা হল না। অজয়বাবু দিল্লিতেই এক প্রেস কনফারেনসে বলে এলেন: কংগ্রেস বা মিনি ফ্রন্টে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সি. পি. আই-র পক্ষ থেকে রণেন সেনও ঘোষণা করলেন: সি. পি. এমকে বাদ দিয়ে সরকার গড়ার চেষ্টা হচ্ছে না, হবে না, সম্ভব নয় এবং রাজনৈতিক বিচারে তা উচিতও নয়।

তবে, বাংলা কংগ্রেস অনশনের প্রোগ্রাম কিছুতেই বন্ধ রাখতে রাজী হলেন না। সি. পি. এম, আর. এস. পি, লোকসেবক সংঘ, ওয়ারকার্স পার্টি, আর. সি. পি· আই এবং মারকসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক একযোগে অনুরোধ জানালেন বাংলা কংগ্রেসকে। আরও অনেক অনুরোধ উপরোধ হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

১লা ডিসেম্বর অজয়বাবুর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেসীরা গণ-অনশন সুরু করলেন।

এই অনশন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা আরও বাড়ল। অনশনের প্রথম দিনই কারজন পার্কে সি. পি. এম সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখালেন। সন্ধ্যে বেলা শ্লোগান ও পাল্টা শ্লোগানে কারজন পার্ক মুখরিত হয়ে উঠল।

তখন সি. পি. এমও নতুন করে উৎসাহ পেয়েছেন টালিগঞ্জ এবং রায়নার উপনির্বাচনের ফলাফলে। সি. পি. এম প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জিতলেন এবং সমর্থকরা দাবি করলেন: জনগণ অজয়বাবুকে মুখের মত জবাব দিয়েছে। ২রা সি. পি. এম মনুমেন্টের নীচে বিজয় উৎসব করলেন। সেখানেও নেতারা ঘোষণা করলেন: পশ্চিমবঙ্গকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। জ্যোতিবাবু সেইদিনই গৌহাটিতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন : যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেলে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরী আছি।

সেইদিন সন্ধ্যায় আবার অজয়বাবুর অনশন শিবিরে হাঙ্গামা হল। পুলিশ লাঠি চার্জ করল। অজয়বাবু প্রকাশ্যেই বললেন: পুলিশকে বদলি এবং শাস্তির ভয় দেখিয়ে বে-আইনী কাজ করানো হচ্ছে, বিধিমত কর্তব্য পালনে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

পরদিন দুপুরেই জ্যোতিবাবু রাইটারস বিলডিংসে রিপোর্টারদের কাছে তার

জবাব দিলেন: উনি এসব কথা মন্ত্রিসভার বৈঠকে তোলেননি কেন? কে ওঁকে বাধা দিয়েছিল?

এর আবার জবাব দিলেন অজয়বাবু কারজন পার্কে: আমি মন্ত্রিসভার সংকট সৃষ্টি করতে চাইনি। তাই মন্ত্রিসভায় ওসব কথা তুলিনি।

সেইদিনই তিনি প্রকাশ্যে প্রথম ইংগিত দিলেন যে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। কারজন পার্কে প্রতিদিন সন্ধ্যায়ই অজয়বাবু বক্তৃতা দিতেন। ৩রা-র বক্তৃতায় বললেন: আইন ও শৃংখলার যদি উন্নতি না হয় তবে দরকার হলে ছেঁড়া জুতোর মত মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে যাব। মরব, তবু আদর্শভ্রষ্ট হব না। বাংলা দেশের সর্বনাশ হতে দেব না।

রাত্রে যুক্তফ্রন্টের বৈঠক ছিল। কিন্তু হল না। কারণ, বাংলা কংগ্রেস বৈঠকে "যোগ দিতে পারলেন না।"

ফ্রন্ট বৈঠকের নির্দিষ্ট সময়ের একটু পরেই সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী পি. এস. পি গোপনে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। পরদিন সকালেই অজয়বাবুর অনশনের ঘোষিত তিনদিন শেষ হওয়ার কথা। চার পারটি সুশীল ধাড়াকে অনুরোধ করলেন, এইবার যেন বাংলা কংগ্রেস অনশনের কর্মসূচী শেষ করে দেন। সুশীলবাবু কিন্তু তাতে রাজী হলেন না। বললেন, না, এরপরও অনশন সত্যাগ্রহ চলবে।

পরদিনও ফ্রন্টের বিভিন্ন নেতা দফায় দফায় আলোচনায় বসলেন। সকলেরই এক লক্ষ, বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যাগ্রহটা কি করে শেষ করানো যায়। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলেন না। দলের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের পর রাতে সুশীলবাবু ঘোষণা করলেন: সত্যাগ্রহ চলবে। অজয়বাবু অবশ্য পূর্বঘোষণামত সেইদিন সকালেই অনশন ভংগ করেছেন।

৫ই মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আরও স্পষ্ট ইংগিত দিলেন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি বললেন: জনগণ বা যুক্তফ্রন্ট যদি রাজ্যের হিংসাত্মক কাজ বন্ধ করতে না পারেন তবে আমি মন্ত্রিত্বই ছেড়ে দেব।

প্রকাশ্যে তখন মুখ্যমন্ত্রী শুধু এইটুকু বললেও ভেতরে ভেতরে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি, বিদ্রোহী পি. এস. পি প্রভৃতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আর সি. পি. এমকে নিয়ে চলতে রাজী নন।

মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় মনোভাব দেখে তাঁরাও বুঝলেন, অবিলম্বে একটা কিছু করতে না পারলে এ মন্ত্রিসভা আর পনেরো দিনও চলবে না।

তাঁরা তখন দুটো পথ ধরলেন। প্রথমত, অজয়বাবুকে জানালেন যে সি. পি. এমকে বাদ দিয়ে সরকার চালাতে তাঁরা রাজী নন। দ্বিতীয়ত, একটা মিটমাটের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। অশোক ঘোষ, নির্মল বসু, মাখন পাল, বিভূতি দাশগুপ্ত সবাই সেদিন মিটমাটের জোর চেষ্টা করলেন। বার বার প্রমোদবাবুর কাছে নানা

প্রস্তাব গেল। কিন্তু প্রমোদবাবু সবাইকে একটাই জবাব দিলেন: সব কিছুর আগে বাংলা কংগ্রেসকে অনশন সত্যাগ্রহ বন্ধ করতে হবে এবং যুক্তফ্রন্ট ও সি. পি. এম-বিরোধী কুৎসা থামাতে হবে।

ওদিকে বাংলা কংগ্রেসও অনড়। তাঁরা বললেন: যতক্ষণ না রাজ্যে হানাহানি বন্ধ হয় ততক্ষণ অনশন বন্ধ করতে রাজী নই।

এরই মধ্যে ৯ই যেন মিটমাটের একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিল। অজয়বাবু রিপোর্টারদের বললেন: খুন জখমটা কিছুটা কমেছে। শরিকী সংঘর্ষও কম। সবাই মনে করলেন, অজয়বাবু নরম হচ্ছেন।

তখন বিভূতি দাশগুপ্ত এবং মাখন পাল রফার জোর চেষ্টা করছিলেন। যদিও সবাই জানতেন যে আর. এস. পি এবং লোকসেবক সংঘ বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই প্রভৃতির চেয়ে সি. পি. এমের অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ, তবু মাখনবাবু এবং বিভূতিবাবুকে তখন সবাই "শান্তির দূত" বলে মেনে নিয়েছিলেন। অজয়বাবুর এই মন্তব্যে তাঁরাও বেশী উৎসাহী হলেন।

বাংলা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মত এরপর অজয়বাবু বেরিয়ে পড়লেন জেলায় জেলায় বক্তৃতা দিতে।

১৩ই বর্ধমান শহরে বক্তৃতায় বললেন: গোড়ার দিকে ফ্রন্টে যে ঐক্য ছিল আজ তাতে ভাঙ্গন ধরেছে। এবং, তার কারণ কয়েকটি শরিক দল ফ্রন্টের নীতি বিরোধী কাজ করছেন। শ্রেণীসংগ্রামের নামে এরা হত্যা, লুঠ ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছেন। পারটির লোকেরা পুলিশকে ভয় দেখিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখছেন।...ইচ্ছা করলেই ফ্রন্ট ভেঙ্গে দিতে পারি। কিন্তু তা করতে চাই না বলেই জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর নিয়ে নিচ্ছি না। তিনি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন, আপনারা অরাজকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

১৫ই মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার কারজন পার্কে সি. পি. এমের উদ্দেশ্যে বললেন: ডাকাতি করে পারটি ফান্ড না বাড়িয়ে ভিক্ষে করে টাকা তুলুন।

পরদিন এই কথাটাই আরও স্পষ্ট করে বললেন তারাসুন্দরী পার্কে: সি. পি. এমের লোকেরা গলায় লাল রুমাল লাগিয়ে সব জায়গায় উৎপাত ও গোলমাল করছে। জনগণকে এ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। ভোটের ভয় দেখিয়ে ওদের ঠান্ডা করতে হবেই...সি. পি. এম ধাপ্পাবাজি করছে। একদিকে যুক্তফ্রন্টের সভায় তাঁরা শরিকী সংঘর্ষ বন্ধের চুক্তিপত্রে সই করছে, অন্যদিকে চেলাদের লেলিয়ে দিচ্ছে ঢালাও মারামারি করতে। এই চেলারাই পারটি ফান্ডে টাকা তুলতে গ্রামে গ্রামে ধান লুঠ করছে।

১৯শে অর্থাৎ পরদিনই জ্যোতিবাবু জবাব দিলেন: আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না ডাকাতি করা, লুঠ করা ইত্যাদি কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কারণ, একমাত্র পাগলেই এ ধরনের কথা বলতে পারে। এ ধরনের কথা বলা পাগলামির লক্ষণ।

অজয়বাবুও এই বক্তব্যের উত্তর দিলেন ২২শে হাওড়ার জনসভায়। বললেন: ডাকাতি করে পারটি ফান্ড বাড়াবার অভিযোগ মিথ্যা হলে ওরা আমার নামে মামলা করুন।

এইভাবে উত্তাপ বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একেবারে ঝপ করে কিছুটা শান্তি ফিরে এল যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিতে। ৩১শে বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলী ঘোষণা করলেন: ১লা জানুয়ারী থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে।

এবং, সেইদিনই মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্টারদের কাছে বললেন: ফ্রন্ট আরও চার বছর টিকবে।

বাইরের লোক তাই শুনে একেবারে থ! তাঁরা বুঝতেই পারলেন না, ব্যাপারটা কী হল!

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension SERVICE
CALCUTTA-27

শেষ অধ্যায়

উত্তাপ বাড়তে বাড়তে যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন হঠাৎ এই ঠান্ডা হাওয়াটা কোথা থেকে এল? কেনই বা তার আগমন?

আসলে এই ঠান্ডা হাওয়াটা এল দিল্লি থেকে। আর, চার পারটির জোট থেকে। দিল্লি এই সময় রাজ্যপাল এবং কয়েকজন বিশেষ দূত মারফৎ অজয়বাবুকে জানলেন: চট করে কিছু করতে যাবেন না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে যাতে বিকল্প সরকার হয়। যদি সি. পি. এম-বর্জিত বিকল্প সরকার না হয় তাহলে দেখতে হবে যাতে সি. পি. এম নিজে কিছুতেই বিকল্প সরকার না করতে পারে। বাস্তবতার কিছুই নেই।

অজয়বাবু নিজেও এই বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিলেন। তাঁরও প্রথম ইচ্ছা ছিল বিকল্প সরকার গঠন এবং একান্তই তা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রপতির শাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া।[১]

অনশনের আগেই অজয়বাবু বারকয়েক সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী পি. এস. পিকে বলেছিলেন: আমি আর সি. পি. এমের সঙ্গে চলতে পারবো না। ওদের এত অত্যাচার মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জ্যোতিবাবু পুলিসকে ভীষণভাবে পারটির কাজে লাগাচ্ছেন।

ওঁরা বলছিলেন: কী করতে চান?

অজয়বাবু জবাব দিচ্ছিলেন: দুটোই তো পথ আছে। একটা জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর নিয়ে নেওয়া। তাতে যদি ওঁরা মেনে নিয়ে থাকেন ভাল কথা, আর যদি বেরিয়ে যান তাতেও আমাদের হাতে যথেষ্ট মেজরিটি থাকবে। আমরা মন্ত্রিসভা চালিয়ে যেতে পারব। যদি আর সবাই আপনারা মত দেন।[২]

---

[১] অজয় মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০। "একটা জিনিস আমার বরাবরই দেখার ছিল। আমরা মনে করতাম বাংলা কংগ্রেস একা বেরিয়ে গেলে ওঁরা সবাই মিলে যদি সরকার চালান তাহলে জনসাধারণের উপর অত্যাচার বন্ধ হবে না। তা চলতেই থাকবে। বাড়তেই থাকবে। তাই যতক্ষণ না আমি বুঝতে পারলাম যে ওঁদের অর্থাৎ সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রভৃতির অনুরোধ উপেক্ষা করে পদত্যাগ করলেও ওঁরা সি. পি. এমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিত্ব করবেনই না ততক্ষণ পদত্যাগ করলাম না। সেটা যখন পাকা বুঝলাম তখন পদত্যাগ করলাম। না হলে আরও আগে পদত্যাগ করতাম। আমি আমার মুখ্যমন্ত্রিত্বে এত অত্যাচারের দায়িত্ব নিতাম না।"

[২] অজয় মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০।

ওঁরা কিন্তু তাতে কিছুতেই মত দিতে পারছিলেন না। জ্যোতিবাবুর হাত থেকে হোম কেড়ে নিতেও রাজী হতে পারছিলেন না। সি. পি. এম-বর্জিত সরকার চালাবার প্রস্তাবেও না। কারণ, ওঁরা জানতেন, সি. পি. এমকে বাদ দিলে আর. এস. পি. এবং লোকসেবক সংঘ সহ প্রায় একশজন এম. এল. এ তার বিরোধিতা করবেন। সম্ভবত, তাঁরা সরকারের পেছন থেকে সমর্থনও প্রত্যাহার করে নেবেন। তখন সরকার চালাতে গেলে চালাতে হবে নব কংগ্রেসের সমর্থনে।

নব কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার চালাতে সি. পি. আই-র যে কিছু ঘোরতর আপত্তি ছিল তা নয়। কেরলে তখন অচ্যুত মেনন সরকার চলছে কার্যত নব কংগ্রেসেরই সমর্থনে। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি-র কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার চালাতে ঘোরতর আপত্তি ছিল। সি. পি. আই-ও প্রধানত এই দুই দলের প্রচণ্ড আপত্তির জন্যই অজয়বাবুর প্রস্তাবে রাজী হতে পারছিলেন না।

অজয়বাবু মনে করলেন, আসলে ওঁরা সময় চাইছেন। গ্রাউণ্ডটা আর একটু তৈরী হলেই রাজী হবেন। তাই অনশনের পরই আবার বলতে সুরু করলেন: না, আর চলা যাচ্ছে না, এবার একটা কিছু করতেই হবে।

ওঁরা আবার বললেন: না, তা হয় না। এখনও ক্ষেত্র ঠিক প্রস্তুত হয়নি। সবাই মিলে সি. পি. এমের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক প্রচার করে তারপর একটা স্টেপ নেওয়া যেতে পারে। না হলে লোকে ঠিক বুঝতে পারবে না ব্যাপারটা।°

আপত্তি সত্ত্বেও অজয়বাবু তাতে রাজী হয়ে গেলেন। কারণ, তাঁর তখনও ধারণা, শেষ পর্যন্ত ওঁরা সি. পি. এম-বর্জিত সরকার চালাবার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবেনই।

সেইমত স্থির হল: যুক্তফ্রণ্টের বৈঠকে কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে আসা হবে। আপাত দৃষ্টিতে রুকারই প্রস্তাব। যুক্তফ্রণ্টকে শক্তিশালী করারই প্রস্তাব। প্রয়োজনে সেইসব প্রস্তাব ভোটে পাস করিয়ে নেওয়া হবে। আর বলা হবে, যে প্রস্তাবগুলি মানবে না তাঁকেও ভোটে শাস্তি দেওয়া হবে।

অজয়বাবু বললেন: যদি ফ্রণ্টে প্রস্তাবগুলি মেনে বাইরে কাজেকর্মে সি. পি. এম তার বিরোধিতা করে, তাহলে কী হবে?

ওঁরা জবাব দিলেন: তাহলে তখন ফ্রণ্টে এবং সরকারে বাই মেজরিটি স্টেপ নেওয়া হবে। সবাই হিসেব করে অজয়বাবুকে দেখালেন ফ্রণ্টে ৮:৬, মন্ত্রিসভায়ও ওই অনুপাত।

অজয়বাবু বললেন: আচ্ছা দেখা যাক।

ওদিকে তখন দিল্লি থেকেও বারংবার বার্তা আসছে: তাড়াহুড়ার কোনও দরকার নেই।

ঠিক এই সময়েই শান্তির দূত বিভূতি দাশগুপ্ত গিয়ে অজয়বাবুকে ধরলেন: একবার ফ্রণ্টে বসুন, সবাই মিলে আলোচনা করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অজয়বাবুও তাতে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন: ঠিক আছে, ৯ই বা ১০ই

° অজয় মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০।

জানুয়ারী ফ্রণ্টের বৈঠক ডাকা হোক। আমি মিটমাটই চাই। এও চাই যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভাল ভাবে চলুক।

তাই দেখে বাইরের সবাই ভাবলেন, তাহলে ব্যাপারটা কী? ঝপ করে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন?

অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিলেন। যে যাঁর মত বিশ্লেষণ করলেন। সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দিলেন বাংলা কংগ্রেসের বিতাড়িত নেতা সুকুমার রায়। তিনি তাঁর এক্সপ্রেস ওপিনিয়নে বললেন: আসলে এটা অজয়বাবুর পশ্চাদপসরণ। তিনি পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন তিনটি কারণে। প্রথম কারণ, তিনি বুঝেছেন যে দলের সব এম. এল. এ তাঁর সঙ্গে নেই। অনেকেই আমার সঙ্গে। উনি মন্ত্রিসভা ভাঙলে বা সি. পি. এমকে বাদ দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে গেলে অনেকেই আমার সঙ্গে চলে আসবে। দ্বিতীয় কারণ, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি কিছুতেই সি. পি. এম-বর্জিত নব কংগ্রেস-সমর্থিত সরকারে যোগ দিতে রাজী নন। তাঁদের ছাড়া সি. পি. আই এবং নব কংগ্রেসকে নিয়েও সি. পি. এম-বর্জিত বিকল্প সরকার হয় না। তৃতীয় কারণ, বিকল্প সরকারের ব্যবস্থা না হলে অজয়বাবু কিছুতেই মন্ত্রিসভা ভাঙবেন না—মুখ্যমন্ত্রিত্ব তিনি ছাড়বেনই না। গদী তাঁর চাই-ই।

সি. পি. এম নেতাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষভাবে প্রমোদবাবু এবং হরেকৃষ্ণবাবু ধরে নিলেন, সুকুমার রায়ের বিশ্লেষণ মোটামুটি ঠিক। তাঁরাও মনে করলেন, অজয়বাবু বাধ্য হয়েই পিছিয়ে গিয়েছেন। এখন তাঁর পক্ষে সি. পি. এম-বর্জিত বিকল্প সরকার গঠন সম্ভব নয়। তাই তিনি এখন কিছুতেই এই মন্ত্রিসভা ভাঙবেন না। সবকিছু সত্ত্বেও তিনি এই মন্ত্রিসভা চালিয়ে যেতে বাধ্য—কারণ তিনি গদী ছাড়তে রাজী নন।[৪]

এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই প্রমোদবাবুরা ঠিক করলেন যে তাঁরা অজয়বাবু এবং তাঁর দলের উপর চাপ বাড়িয়ে যাবেন। তাই মাখনবাবু ও বিভূতিবাবু যখন মিটমাটের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন এবং জানালেন যে অজয়বাবুও মিটমাটের জন্য আগ্রহী তখন প্রমোদবাবু শর্ত দিলেন: অজয়বাবু আমাদের এবং যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে যেসব কটূক্তি করেছেন তা প্রত্যাহার না করলে আমরা ভাই-ভাইর আলোচনা চালাতে রাজী নই।...আমরা ওদের সঙ্গে আলোচনায়ই বসব না এমন কোনও কথা নেই। তবে, বসেই বলব, ওইসব অভিযোগ আগে প্রত্যাহার করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গেই সুশীল ধাড়া জবাব দিলেন: আমরা কোনও ভুল করিনি। যা বলেছি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলেছি। সুতরাং ত্রুটি স্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না।[৫]

---

[৪] হরেকৃষ্ণ কোঙার। সাক্ষাৎকার ২৫-৭-৭০। "অজয়বাবু যে Simply ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন এটা আমরা বুঝতে পারিনি। কেরলা দেখে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, এখানেও বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা হবে এবং সেই চেষ্টা যতক্ষণ সফল না হচ্ছে ততক্ষণ অজয়বাবু গভর্নমেন্ট ভাঙবেন না।"

[৫] ২-১-৭০।

তিনদিন পরে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবার ঘোষণা করলেন: মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলা কংগ্রেস সম্প্রতি রাজ্য সরকার ও সি. পি. এম সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তার কোনটিও প্রত্যাহার করা হবে না।

তখন সি. পি. এম পলিটব্যুরোর বৈঠক চলছিল। প্রধান আলোচ্য বিষয়ই ছিল পশ্চিমবঙ্গ। ৫ই পলিটব্যুরোর বৈঠক শেষ হল। সি. পি. এম স্থির করলেন, তাঁরা অজয়বাবুর কাছ থেকেই সবটা বোঝার চেষ্টা করবেন। তাই তার পর দিনই জ্যোতিবাবু অজয়বাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। এবং তারপর ঘোষণা করা হল: ১৪ই জানুয়ারী ফ্রন্টের আপস বৈঠক হবে।

দুই প্রধানের গোপন বৈঠকের পরই রিপোর্টাররা গিয়ে ধরলেন অজয়বাবুকে।

একজন রিপোর্টার: তবে কি আমরা ধরে নিতে পারি এযাত্রা ফ্রন্ট সরকার টিকে গেল?

মুখ্যমন্ত্রী: যা কিছু ধরে নিতে পারেন। আমি তো আগেই বলেছি ফ্রন্ট ভাঙবে না।

আর একজন রিপোর্টার: এই আপস আলোচনায় কোনও শর্ত আছে কি?

মুখ্যমন্ত্রী: না, ফ্রন্টের কোনও দল কোনও শর্ত আরোপ করেননি।

তারপর রিপোর্টাররা গেলেন জ্যোতিবাবুর কাছে।

প্রশ্ন: আপনারা কি বিনা শর্তে এই বৈঠকে যাচ্ছেন?

জ্যোতিবাবু: শর্ত আবার কি? আমাদের পারটির একটা স্ট্যান্ড আছে। ১৪ই জানুয়ারীর বৈঠকে আমরা যাব।

প্রশ্ন: আপনারা শর্ত ছাড়া অজয়বাবুদের সঙ্গে বৈঠকে যাবেন না বলেছিলেন। এখন বিনা শর্তে যাচ্ছেন?

জ্যোতিবাবু: আমরা কখনও শর্তের কথা বলিনি।

প্রশ্ন: ১৪ই জানুয়ারীর বৈঠকে আপনারা কী প্রশ্ন তুলবেন?

জ্যোতিবাবু: কিছু তুলব না। তবে, বৈঠকে উপস্থিত থাকব। আর আমাদের যা বলার তা জনগণকে বলে দিচ্ছি।

আমরা সবাই ভাবলাম, তাহলে কী পলিটব্যুরো প্রমোদবাবুর বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছে! তাহলে কি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব স্থির করেছেন যে তাঁরা বিনাশর্তেই মিটমাটের আলোচনায় বসবেন? আরও ভাবলাম, তাহলে কি অতীতের বিভিন্ন তিক্ততার প্রসঙ্গ না তুলে সি. পি. এম এমনিই বাংলা কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

বিরোধ মিটিয়ে নিতে চায়?

রাত্রেই ব্যাপারটা আরও ঘোলাটে হয়ে উঠল। প্রমোদবাবু সেদিন কলকাতা ছিলেন না। বেশী রাত্রে ফিরলেন। আমি অজয়-জ্যোতি আলোচনার খবর দিয়ে জানতে চাইলাম: তাহলে আপনারা ওসব প্রত্যাহারের দাবিটাবি আর তুলতে যাচ্ছেন না, তাই না?

শুনে তো প্রমোদবাবু খাপ্পা। ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন: লিখে নিন, যতক্ষণ অজয়বাবু যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে তাঁর অপমানসূচক উক্তি প্রত্যাহার না করছেন ততক্ষণ যুক্তফ্রণ্টে কোনও শান্তি আলোচনা হতে পারে না, ততক্ষণ আমাদের পার্টি ওই রকম কোনও আলোচনায় যোগ দেবে না।

পরদিন অন্যান্য সব কাগজের রিপোর্টাররাও গিয়ে ধরলেন প্রমোদবাবুকে: ব্যাপারটা কী?

সি. পি. এম নেতা আবার মোটামুটি একই জবাব দিলেন: ফ্রণ্টের আলোচনায় শান্তি প্রস্তাব উঠলেই আমাদের পার্টি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানাবে। যদি মুখ্যমন্ত্রী তা না করেন, তাহলে সি. পি. এম ওই আলোচনা থেকে উঠে আসবে।

আমরা বুঝলাম, জ্যোতিবাবু এবং প্রমোদবাবুতে এ নিয়ে মতভেদ চলছে।

১১ই কিন্তু জ্যোতিবাবু নিজেও বেশ চড়া সুরে কথা বললেন। সোদপুরে এক জনসভায় তিনি সোজাসুজি অজয়বাবুকে আক্রমণ করলেন: মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রশাসনিক দফতরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছেন। একদিকে তিনি নিজের সরকারকে অসভ্য বর্বর বলছেন, আর ভিতরে ভিতরে এক শ্রেণীর কর্মচারীকে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করার জন্য উত্তেজিত করে চলেছেন। মন্ত্রিত্বের লোভে তিনি এত নীচুতে নেমেছেন যা কল্পনাও করা যায় না।

এই বক্তৃতা শুনে আবার মনে হল, জ্যোতিবাবুও শেষ পর্যন্ত প্রমোদবাবুদের লাইনে আসতেই বাধ্য হয়েছেন।

১২ই আসরটা আরও গরম হয়ে উঠল। সুকুমার রায়ের সেই 'জ্যোতিবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করার' গোপন আলোচনার খবর বাংলা কংগ্রেস নেতারা রিপোর্টারদের জানালেন। একেবারে টেপ রেকর্ড করা কথোপকথন। ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও উপায় নেই। সুকুমার রায় বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়া-বিরোধী অংশের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করছিলেন। তখনও তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত হননি। সুশীল ধাড়া লুকনো টেপ রেকরডার সহ সেখানে নিজের একজনকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই টেপ করা গোপন আলোচনা বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভায় বাজিয়ে শোনানো হল।

সুকুমারবাবু সেই গোপন বৈঠকে বলছিলেন: জ্যোতিবাবু, সরোজবাবু, মাখনবাবু, যতীনবাবুদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা বাংলা কংগ্রেস থেকে জনা নয়েক এম. এল. এ নিয়ে যেতে পারলে আমাদের দুজনকে মন্ত্রী করা হবে। অজয়বাবুদের বাদ দেওয়া হবে। জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সি. পি. আই বেশী চিৎকার করতে সাহস পাবে না। সি. পি. এম নেতারা বলেছেন, ওদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে।

এই "গোপন ষড়যন্ত্রের" খবর সংবাদপত্রে বেরিয়ে যেতে একেবারে হইচই

পড়ে গেল। সি. পি. আই নেতারা দু তিন দিন আগে থেকেই জানতেন এই টেপের অস্তিত্ব। সংবাদপত্রে খবরটা বের হওয়ার পর তাঁরা চিৎকার করে বলে বেড়াবার সুযোগ পেলেন: দেখ, দেখ, কে গোপনে চক্রান্ত করছে দেখ!

জ্যোতিবাবুও জবাব দিলেন, ওসব মিথ্যে কথা, আমার সঙ্গে সুকুমার রায়ের ওরকম কোনও আলোচনাই হয়নি।

আড়ালে কিন্তু একজন সি. পি. এম নেতা ও আর একজন আর. এস. পি নেতা আমার কাছে স্বীকার করলেন: হ্যাঁ, ওরকম একটা কথাবার্তা সত্যিই হয়েছিল।

১৩ই অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের সেই আপোস বৈঠকের আগের দিন একদিকে যখন ত্রিদিববাবু, মাখনবাবু, যতীনবাবু, বিভূতিবাবু রাইটারসে অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবুর সঙ্গে বার বার কথা বলে মিটমাটের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন, প্রমোদবাবু তখনই আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে রিপোর্টারদের ডেকে একখানা চিঠি বিলি করে দিলেন। চিঠির লেখক সি. পি. এমের পক্ষে স্বয়ং সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত। যুক্তফ্রন্টের সব শরিক দলের উদ্দেশ্যে লেখা।

সেই চিঠিতে প্রমোদবাবু সবাইকে লিখলেন: এখন বাংলা কংগ্রেস প্রশাসন যন্ত্রে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপ এই ঘৃণ্য খেলার পরিষ্কার প্রমাণ। স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশ[৬] বাতিল করে দিয়েছেন। এবং, তিনি একজন অফিসারের বিরুদ্ধে আর একজন অফিসারকে লাগিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টিতে উস্কানি দিচ্ছেন।...তিনি ফ্রন্ট সরকার ও আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছেন। ...সরকারকে অসভ্য ও বর্বর বলেছেন। তাঁকে এইসব মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।

প্রমোদবাবু সেইদিন সাংবাদিকদের আরও বললেন: অজয়বাবু এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছেন যাতে আমাদের দল ও জ্যোতিবাবু সরকার থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু আমরা অজয়বাবুর ওইসব কথায় বা কাজে উত্তেজিত হয়ে

---

[৬] ডিসেম্বরের শেষে দুটো বড় ঘটনা ঘটে। একটা, কিছু বিচারাধীন ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে; আর একটা, গাজোলের দারোগাকে বদলি করা নিয়ে। মালদহে ওই বিচারাধীন ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তাঁদের বিরুদ্ধে নানা রকমের ফৌজদারী মামলা চালাচ্ছিলেন পুলিশ। জ্যোতিবাবু মামলাগুলি তুলে নেওয়ারও হুকুম দেন। অজয়বাবুর কাছে খবর আসে, ওরা সি. পি. এম সমর্থক বলেই জঘন্য অপরাধের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি তখন মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতাবলে সেই আদেশ বাতিল করে মামলা চালাবার হুকুম দিলেন। জ্যোতিবাবু পরে স্বীকার করেন যে ভুলে তিনি ওই মামলাগুলি তোলার হুকুম দিয়ে ফেলেছিলেন। গাজোলের দারোগাকে বদলি করারও হুকুম দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র দফতর। সেই দারোগা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, সি. পি. এমের কিছু লোকের বিরুদ্ধে মামলা চালাচ্ছি বলেই আমাকে বদলি করা হচ্ছে। অজয়বাবু এক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতাবলে বদলির আদেশ বাতিল করে দিলেন।

মন্ত্রিসভা ত্যাগ করছি না।

এই চিঠির খবর শুনে সবাই হতাশ হয়ে পড়লেন। অন্যতম শান্তির দূত মাখন পাল গিয়ে অশোক ঘোষকে বললেন: প্রমোদবাবুর চিঠি আমাদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিন্তু প্রমোদবাবুর এই বক্তব্যের কোনও জবাব দেওয়া হল না। সুশীলবাবু সাংবাদিকদের শুধু বললেন: ১৪ তারিখের আগে কিছু বলব না। কারণ, আমরা প্রতিশ্রুতিবন্ধ। বাংলা কংগ্রেস এর আগেই প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ১৪ইর আপস আলোচনার আগে এমন কিছু বলবেন না যাতে কেউ অভিযোগ আনতে পারেন যে তাঁরা আবহাওয়াটা খারাপ করে দিচ্ছেন।

প্রকাশ্যে কিছু না বললেও নেপথ্যে বাংলা কংগ্রেস সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক. এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী পি. এস. পি-র উপর চাপ দিলেন। অজয়বাবু ওঁদের ডেকে বললেন: আর নয়, এবার একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে।

ওঁরা কিন্তু তাতে রাজী নন। বললেন: সি. পি. এমকে কিছুটা আইসোলেট করা গিয়েছে। মানুষ ওদের এবার চিনতে সুরু করেছে। তবে, এখনও আরও সময় প্রয়োজন।

অজয়বাবু একেবারেই ভিন্নমত। তিনি বললেন: লোকে খুব হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। তাছাড়া আমরাও লোককে অনেক কথা বলেছি। সংবাদপত্রেও বহু খবর বের হচ্ছে। লোকে সব জানতে পেরেছে। আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। মানুষের উপর এত অত্যাচারের দায়িত্ব আমি আর নিতে পারছি না। আজ আমি চলে গেলে আর এর দায়িত্ব নিতে হবে না।

ওঁরা তবু বললেন: না, আরও অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

অজয়বাবু জানতে চাইলেন: বলুন আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

আর বললেন: অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করতে আমি রাজী নই। আমাকে একটা সময় বলুন।[৭]

তাতে চার পার্টি মহামুস্কিলে পড়লেন। ওঁরা নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন। সি. পি. আই বললেন: বলে দিন না একটা তারিখ। বলা হচ্ছে বলেই যে তা করা হচ্ছে তেমন তো কোনও কথা নেই! এস. ইউ. সি তাতে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। বললেন: এভাবে দিনক্ষণ ঠিক করে এগোনোর ব্যাপারটাই অরাজনৈতিক। ওর মধ্যে আমরা নেই। আসলে ডেভেলপমেণ্ট কীভাবে হয় তার উপরই সব নির্ভর করবে।

ইতিমধ্যে ১৪ই জানুয়ারীর যুক্তফ্রণ্ট বৈঠকটা একটা "ভুলবোঝাবুঝি" দাঁড় করিয়ে এড়িয়ে যাওয়া গেল। বৈঠকই হল না। একদল গিয়ে বসলেন সি. পি. আই অফিসে। অজয়বাবুও। তাঁরা বললেন, এইখানেই মিটিং হোক। কারণ, এইখানেই মিটিং হওয়ার কথা। সি. পি. আই সবাইকে বললেন: হয় মিটিং এখানে হবে,

---

৭ অজয় মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০।

আর না হয় আজ হবেই না। আর একদল তখন গিয়ে বসেছেন লোকসেবক সংঘের অফিসে। সি. পি. এম সহ কয়েকটি দল। তাঁরা আবার জিদ ধরলেন: হয় মিটিং এখানে হবে, না হলে আজ হবেই না। এখানে মিটিং হবে বলেই আমরা জানি। আমরা কিছুতেই বউবাজারে যেতে রাজী নই। বউবাজারে ও রাজাবাজারে টেলিফোনে কিছু আলাপ আলোচনাও হল। এবং শেষ পর্যন্ত স্থির হল, পরে আবার মিটিং হবে। দিন ধার্য হল ২১শে।

আসলে সেদিন এইভাবে সংঘর্ষটা এড়িয়ে যাওয়া হল। সবাই জানতেন, সেদিন যুক্তফ্রণ্টের আপস বৈঠক বসলে আপস তো হবেই না, হবে আরও ঝগড়া এবং হয়ত তারপর অজয়বাবু একটা কিছু করেই বসবেন। তাই, এইভাবে মিটিংটা ভেস্তে যাওয়ায় অনেকেই খুশী হলেন।

কিন্তু অজয়বাবু ছাড়ার লোক নন। তিনি চার পারটির কাছে জানতে চাইলেন: কি হল, আপনাদের জবাব কই? আমি আর এভাবে চালাতে পারছি না। আপনারা যা হয় করুন, আমি সব ছেড়েছুড়ে দিচ্ছি।

চার পারটি আবার আলোচনায় বসলেন। বহু আলোচনার পর তাঁদের পক্ষ থেকে অজয়বাবুকে জানানো হল: দুমাস অপেক্ষা করতেই হবে। অন্তত দুমাস সময় চাই-ই।[৮]

অজয়বাবু কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করতে রাজী নন। তিনি বললেন: আমি তা পারব না। আমি এই অত্যাচার, জুলুম ও হত্যাকাণ্ডের পাপ আর সহ্য করতে পারছি না।

ওঁরাও ছাড়লেন না। বললেন: আপনি দুটো মাস অপেক্ষা করুন। যুক্তফ্রণ্টের মিটিংগুলিতে আমরা প্রস্তাবগুলি পাশ করিয়ে নেই। তারপরও যদি সি. পি. এম না থামে তাহলে না হয় যেমন ভাল বোঝেন তেমন ব্যবস্থা নেবেন। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি।

অজয়বাবু মুখে অবশ্য তারপরও বললেন, না, আমি তা পারব না। কিন্তু এমনভাবে কথাগুলি বললেন যাতে চার পারটির প্রতিনিধিরাই বুঝলেন, তিনি চট করে একা কিছুই করবেন না। চার পারটির প্রতিনিধিরাও বার বার তাঁকে অনুরোধ জানালেন: ইউনিল্যাটারালি কিছু করবেন না।

ইতিমধ্যেই এল রাজ্যপালের ভাষণের প্রসঙ্গটা। মন্ত্রিসভাকেই রাজ্যপালের ভাষণ তৈরী করে দিতে হবে। রাজ্যপাল তা পড়বেন।

প্রশ্ন উঠল, এই বক্তৃতায় আইন ও শৃংখলা সম্পর্কে কী বলা হবে?

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সুশীল ধাড়া বললেন: আইন ও শৃংখলার অবনতির কথা লিখতে হবে।

জ্যোতিবাবু জবাব দিলেন: না, তা হবে না।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেউই অনমনীয় মনোভাব দেখালেন না। রফা হল, কথাটা এইভাবে লেখা হবে: পুলিশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অভিযোগ সমূহ নিরসনের

---

[৮] অজয় মুখার্জী। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০।

জন্য যে অধিকতর চেষ্টা করা দরকার সরকার সে সম্বন্ধে সচেতন।

কিন্তু এ ব্যাপারে রফা হলেও বাইরে উত্তাপ কমল না। ১৮ই ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটি এক প্রস্তাবে বললেন: রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সি. পি. এম প্রভুর মত ভাব দেখিয়ে অন্যদলকে বেপরোয়া আক্রমণ করছে। যতদিন পর্যন্ত সি. পি. এম তার পথ ত্যাগ না করছে ততদিন ফ্রন্টের সংকটও কাটবে না। ফ্রন্টের অন্য সব শরিক যদি চাপ সৃষ্টি করে সি. পি. এমের আগ্রাসী নীতি পরিবর্তন করাতে পারে তবেই সংকট কাটতে পারে—না হলে নয়।

তার পরদিন জ্যোতিবাবু আর একটা চিঠি দিয়ে আসরটা আরও গরম করে তুললেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লেখা এই চিঠিতে তিনি সুশীল ধাড়ার বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনলেন। বললেন: বাংলা কংগ্রেসের সদর দফতর যে বাড়িতে সেই বাড়ির মালিকের ভাইকে সুশীলবাবু তাঁর দফতরে বিরাট পদে নিয়ে আসছেন—যদিও পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেই ভদ্রলোককে নাকচ করে দিয়েছেন।

এই ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। যেমন শোনা যাচ্ছিল আরও কতকগুলি দফতরের আরও বহু দুর্নীতির কাহিনী। সি. পি. এমেরও বড় বড় দুর্নীতির ইতিবৃত্ত। সুশীলবাবুর এই ব্যাপারটা এক আধটা সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও বেরিয়েছিল। কিন্তু জ্যোতিবাবু ব্যাপারটা যেভাবে তুলে ধরলেন তাতে কারুই বুঝতে অসুবিধা হল না যে ওঁরা অজয়বাবুর দলকে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চান।

আরও একটা জিনিষ তখন চলছিল অন্যদিকে।

অজয়বাবু অনশন করার আগে পর্যন্ত অত্যাচারিত মানুষ জানতেন না তাঁরা কার কাছে যাবেন। অফিসারদের কাছে গেলে শুনতেন, কিছুই করার নেই আমাদের। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে গেলে জবাব মিলত, আমাদের কথা শুনছেন না কলকাতার কর্তারা। সি. পি. এমের ভয়ে তখন সবাই ভীত।

অনশন হয়ে যাওয়ার পর এবং বিভিন্ন বক্তৃতা শুনে অত্যাচারিতরা ভাবলেন, অজয়বাবুর কাছে গেলে একটা সুরাহা হবে। তিনি তো প্রকাশ্যেই এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

তাই প্রতিদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অসংখ্য মানুষ আসা সুরু হল। প্রত্যেকেরই মুখে সব করুণ কাহিনী। প্রতিদিন জোর জুলুম আর অত্যাচারের নানা কাহিনী শুনতে শুনতে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁদের সকলের মুখে এক অভিযোগ, পুলিশের কাছে, অফিসারদের দুয়ারে গিয়ে কোনও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না; সি. পি. এম অত্যাচার করছে।

এইসব শুনতে শুনতে এক একদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই চিৎকার করে উঠতে আরম্ভ করলেন। ২০শে চূড়ান্ত কতকগুলি ঘটনা ঘটল। তিনি রাইটারসে তাঁর ঘরের ভেতরে এবং করিডোরে সকলের সামনে চিৎকার করে করে বললেন: আপনারাও মারুন ওদের, আপনারাও মারুন! আমি কিছুই করতে পারছি না!

তার পরদিনই বিধানসভার অধিবেশন সুরু হবে। পরিষদীয় মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে একটু বুঝিয়ে বলতে গেলেন। ঘুরিয়ে তিনি কথাটা রাখলেন অজয়বাবুর কাছে: দাদা, ওই 'অসভ্য', 'বর্বর' প্রসঙ্গ উঠলে আমি কী করব?

মুখ্যমন্ত্রী সোজা জবাব দিলেন: আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন। আমায় কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি যা যা বলেছি সব আবার বলব।

বিধানসভা বসতে না বসতেই আবার একটা ঘটনা নিয়ে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল। একদল সি. পি. এম সমর্থক চরম উত্তেজিতভাবে এসে বিধানসভা ভবনের করিডোরে মুখ্যমন্ত্রীর পথরোধ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা জবাব চাইলেন: বলুন, কেন আপনি স্কুলে পুলিশ পাঠিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের অপমান করছেন?

এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল তারই আগের দিন। পূর্ব কলকাতার একটি স্কুলে পরিচালক সমিতিকে সি. পি. এমের লোকেরা ঘেরাও করে রেখেছিলেন। তাঁরা সোজাসুজি টেলিফোন করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে হুকুম দিলেন: ওদের ঘেরাও মুক্ত করে নিয়ে আসুন। এখবর সেদিন সকালে কাগজেও বেরিয়েছিল।

সি. পি. এম সমর্থক উত্তেজিত যুবক যুবতীরা এসে মুখ্যমন্ত্রীর পথরোধ করে জানতে চাইলেন: বলুন, কেন আপনি স্কুলে পুলিশ পাঠিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের অপমান করেছেন?

মুখ্যমন্ত্রী তো রেগে আগুন: কী, আপনাদের কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে! কে আপনারা?

ওরাও জবাব দিলেন চিৎকার করে: হ্যাঁ, আমাদের কাছেই জবাব দিতে হবে!

ওদের ধাক্কা দিয়েই এগিয়ে যেতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওরাও তাঁকে ধাক্কা দিলেন। পেছনে আসছিলেন সুশীল ধাড়া। তিনি দৌড়ে এসে জোরে ধাক্কা দিলেন ওদের। ইতিমধ্যে আরও অনেকে এসে পড়েছেন। এসেছে পুলিশও। চরম উত্তেজনা। সি. পি. এম সমর্থকরা তখনও হাত তুলে চিৎকার করে বলে চলেছেন: সুশীল ধাড়া, তোমার হাত আমরা ভেঙ্গে দেব! তোমাকে দেখে নেব!

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পুলিশ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। সি. পি. এম বিরোধী এম. এল. এ ও মন্ত্রীরা চরম উত্তেজিত। তারপর যতীন চক্রবর্তী এগিয়ে গিয়ে পুলিশকে বললেন: ওদের বের করে দিন এখান থেকে। কেন ওদের ঢুকতে দিয়েছেন এই করিডোরে।

ঠিক এই সময় আবার মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। বিধানসভা কক্ষে যাচ্ছিলেন। বিক্ষোভকারীদের তখনও করিডোরে দেখে তিনি রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন: এরা এখনও এখানে কেন? কেন এদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি? পুলিশকে হুকুম দিলেন: আমি চিফ মিনিস্টার হিসাবে অর্ডার দিচ্ছি, ওদের তাড়িয়ে দিন। না যদি দেন, আপনাদের আমি দেখে নেব।

পুলিশ তখন বহু অনুরোধ উপরোধ করে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বিধানসভা ভবনেই বাংলা কংগ্রেস এম. এল. এদের বৈঠক ছিল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাছে খোলাখুলি বললেন: আমি আর পারছি না, আর পারব না এই মুখ্যমন্ত্রীত্ব করতে। যেখানে আমাকেই বিধানসভা ভবনের ভেতরে ঢুকে সি. পি. এমের লোকেরা ধাক্কা দিতে সাহস পায়, সেখানে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা একবার কল্পনা করে দেখুন। মানুষের উপর এই জুলুম, এই অত্যাচার আমি আর সহ্য করতে পারছি না, পারব না।

সব এম. এল. এ রায় দিলেন: আপনি যেমন ভাল বুঝবেন ব্যবস্থা নিন। আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি। তাঁরাও সেদিন ভীষণ উত্তেজিত।

রাত্রে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ফ্রণ্টের বৈঠকেও। ১৪ইর পর সেদিনই, অর্থাৎ ২১শে ফ্রণ্টের বিশেষ আপস বৈঠক হওয়ার কথা। কিন্তু আপস হওয়া দূরের কথা, বিধানসভা ভবনের ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা আরও বাড়ল।

বৈঠক ভাঙ্গতেই আবার আর এক ধাক্কা। সি. পি. আই অফিসের নীচেই অপেক্ষা করছিলেন সি. পি. এম সমর্থকরা। অন্যান্য দলের নেতারা নামতেই তাঁরা ধিক্কারধ্বনি দিলেন, বিক্ষোভ দেখালেন।

সি. পি. এম তখন "পাবলিক প্রেসার ক্রিয়েট করার" নীতি অনুসারে "জনগণকে" লেলিয়ে দিয়েছেন।

এই পাবলিক প্রেসারের নমুনা দেখে সি. পি. এম-বিরোধী ফ্রন্ট শরিকরা আরও চটলেন।

পরদিন বিধানসভা বসতে সেখানেও উত্তেজনা আগের দিনের ঘটনা নিয়ে। দুই কংগ্রেস তো ঘটনার নিন্দা করলেনই, নিন্দা করলেন ফ্রণ্টের বহু এম. এল. এও। স্পীকার ঘোষণা করলেন: আমি ব্যবস্থা করছি যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটতে পারে। তিনিও তীব্র নিন্দা করলেন। সি. পি. এম মোটামুটি চুপচাপ থেকে গেলেন।

বাংলা কংগ্রেস এম. এল. এরা সেদিন আবার বসলেন বিধানসভা ভবনে। সেখানে তাঁদের দলের তিনজন মন্ত্রী ঘোষণা করলেন: আমাদের পক্ষে পদত্যাগ করাই ভাল। এ সরকারে থেকে আমরা যখন কিছু করতেই পারছি না, তখন প্রতিবাদস্বরূপ তিনজন অন্তত পদত্যাগ করি।

সেইদিনই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকেও একখানা চিঠি দিলেন। জ্যোতিবাবু এর আগে যে চিঠি দিয়েছিলেন তারই জবাবে। চিঠিতে অজয়বাবু জ্যোতিবাবুকে সতর্ক করে দিলেন: সংবিধান অমান্য করার চক্রান্ত আমি সহ্য করব না।

২৪শে জ্যোতিবাবু আবার তাঁর জবাব দিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে লিখলেন আপনার আচরণ সরকারী কর্মীদের মধ্যে উচ্ছৃংখলা সৃষ্টি করছে।

একদিকে যখন এই রকম অবস্থা অন্যদিকে তখন "মিটমাটেরও" চেষ্টা চলছে। অবশ্য মিটমাটের চেষ্টা বলা ভুল। আসলে যা চলছিল তখন সেটা হল পরস্পরকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা।

২৪শে দেখা গেল সি. পি. এম বিরোধীরা "মিটমাটের উপায়" হিসাবে পাঁচটা প্রস্তাব আনছেন ফ্রণ্টের সামনে। তারপর দিন ফ্রণ্টের বৈঠক বসার কথা।

এই পাঁচটা প্রস্তাব ছিল এই রকম :

(১) ফ্রণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিন্ধান্ত সব শরিককে মানতে হবে। যে মানবে না তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে ভোটাভুটি হবে।

(২) কেউ কোনও রকমের মারদাঙ্গা করতে পারবে না।

(৩) প্রত্যেক পুলিশ থানাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সর্বদলীয় কমিটি করতে হবে।

(৪) গরীব মানুষের ধান লুঠের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবং,

(৫) বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর নিগ্রহের ঘটনার নিন্দা করতে হবে।

রাত্রেই এই পাঁচটা প্রস্তাব সম্পর্কে সি. পি. এমের মতামত জানা গেল। প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন: আমরা ১ ও ৩ নম্বর প্রস্তাব কিছুতেই মানতে পারি না।

পরদিন দুপুরেই যুক্তফ্রণ্টের আপস বৈঠক বসল। অনেকক্ষণ আলোচনা চলল। এই দিনের আলোচনাটা তেমন খারাপ দিকে এগোলো না। জ্যোতিবাবু সেই 'বর্বর', 'অসভ্য' প্রসঙ্গ তুললেন। অজয়বাবু জবাব দিলেন: ও সম্পর্কে আমার বক্তব্য আমি বলব।

তিনটে প্রস্তাবও মোটামুটি অনুমোদিত হল: (১) বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর নিগ্রহের নিন্দা। (২) বিধানসভায় ফ্রণ্টের ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এবং, (৩) শরিকী সংঘর্ষ মেটাবার জন্য উল্লেখিত সাত দফা কর্মসূচী মেনে চলার একান্ত আবশ্যকতা।

ফ্রণ্টের বৈঠকটা মোটামুটি ভালভাবেই শেষ হল। একটু আগেই উঠে যেতে হল মুখ্যমন্ত্রীকে। একটা জনসভায় যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। উঠে যাওয়ার আগে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: জ্যোতিবাবু যে চিঠি দিয়েছেন তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। আমি কি তাহলে জবাব দেব?

সবাই তাঁকে অনুরোধ জানালেন: না, এখন দেবেন না।

অজয়বাবু সেই জনসভায় গিয়েও ঘোষণা করলেন: যুক্তফ্রণ্ট আপসের দিকেই দেখালেন।

আসলে কিন্তু নেতারা সবাই বুঝছিলেন, ফ্রণ্ট মোটেই আপসের দিকে এগোচ্ছে না—যা চলছে তা হল ভাঙনের প্রস্তুতি। ২৪শের বৈঠক শেষ হতে না হতেই সি. পি. এম কর্মীরা সি. পি. আই অফিসের সামনে জোর বিক্ষোভ দেখলেন।

ইতিমধ্যে সুশীল ধাড়াও দিল্লি ঘুরে এসেছেন। ২৪শে দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও এসেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের মত সংখ্যালঘু সরকার সম্ভব। এমনকি নব কংগ্রেসের পারলামেনটারি বোর্ডও সিন্ধান্ত নিয়েছেন যে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে অ-মারকসবাদী যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে সমর্থন করতে রাজী।[৯]

---

[৯] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬-১-৭০।

এরও উপর ২৫শে কোচবিহারে সি. পি. এমের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের একটা জোর সংঘর্ষ হল। ২জন মারা গেলেন। তার পরদিনই আবার কলকাতায় এই দুই দলে সংঘর্ষ হল। তাতেও দুজন নিহত হলেন। সি. পি. এমের লোকরা নারকেলডাঙ্গায় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রদর্শনী পুড়িয়ে দিলেন। এমনি মারদাঙ্গা তো চলছিলই।

সি. পি. এম নেতারা তখন সব ঘটনা বিশ্লেষণ করে মনে করলেন: এ সরকারকে বাঁচাতে হলে প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাই। তাঁর দল যদি পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম-বর্জিত মন্ত্রিসভা গঠনে খুব বেশী আগ্রহ না দেখায় তাহলে অজয়বাবু কিছুতেই সরকার ভাঙ্গতে এগোবেন না। সি. পি. এমের তখনও বদ্ধমূল ধারণা, পশ্চিমবঙ্গেও কেরলের মত নব কংগ্রেস সমর্থিত "মিনি ফ্রন্ট" সরকার হচ্ছে এবং এই সরকার গঠন সম্ভব না মনে করলে অজয়বাবু কিছুতেই পদত্যাগ করবেন না। তাই তাঁরা উৎসে গিয়ে বিপর্যয় আটকাবার সিদ্ধান্ত করলেন।

সেইমত দলের সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরায়া এবং জ্যোতিবাবু ২৭শে দিল্লি যাত্রা করলেন এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী, জগজীবন রাম এবং চবনের সঙ্গে দেখা করে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙ্গা এখন অনুচিত এবং সকলের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ওঁরা সবাই জবাব দিলেন: তোমাদের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের কী করার আছে! তোমরা নিজেরাই বিরোধটা মিটিয়ে ফেল না। আমরা তাতে খুশীই হব।

দুই সি. পি. এম নেতার বুঝতে অসুবিধা হল না, আসলে নব কংগ্রেসী নেতারা তাঁদের সাহায্য করতে মোটেই রাজী নন।

জ্যোতিবাবু কলকাতা ফিরে রিপোর্টারদের কাছে মন্তব্য করলেন: ফ্রন্ট টিঁকতেও পারে, নাও টিঁকতে পারে।

বাংলা কংগ্রেস কিন্তু তখন আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। তাঁরা তখনই জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাইরে অবশ্য তাঁরা সেকথাটা বললেনই না। ২৮শে সম্পাদকমণ্ডলীর এক দীর্ঘ বৈঠকের পর শুধু তাঁরা ঘোষণা করলেন: ২৫শে জানুয়ারির স্বল্পকালিন শান্তি চুক্তির পর অবস্থা তো মোটেই ভাল হয়নি। বরং আরও খারাপ হয়েছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা আরও বেড়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার যেভাবে চলছে সেভাবে চললে বাংলা কংগ্রেস ৩০শে জানুয়ারির পর আর এই সরকারে থাকতে রাজী নন।

তার পরদিনই তাঁরা চার পারটিকে ডেকে বললেন: হয় আমাদের সঙ্গে আসুন, না হয় সি. পি. এমের সঙ্গে যান।

বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরও বলা হল, জ্যোতিবাবুর হাত থেকে অবিলম্বে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে নিতে হবে। তারপর যদি সি. পি. এম থাকে ভাল, না থাকে নেই। আমরা সবাই সরকার চালাবো। প্রয়োজনে নব কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন দেবে।

সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি জবাব দিলেন: না, আমরা তা সমর্থন করতে পারব না। ওটা ঠিক কাজ হবে না। বরং, যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে

যে পাঁচটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাই ভোটে পাশ করিয়ে ফ্রন্ট থেকেই সি. পি. এমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ওইভাবে এগোনোই ভাল।

অজয়বাবু বললেন: হুম।

সুশীলবাবু তখন বসে বসে ঝিমোচ্ছিলেন। বিশ্বানাথবাবু তাঁকে ডেকে তুললেন: কি সুশীলদা, ঠিক আছে তো?

সুশীলবাবু ঝিমোতে ঝিমোতেই বললেন: হুম।

বিশ্বনাথবাবু তাতেও আশ্বস্ত হতে পারলেন না। মন্তব্য করলেন: এখন তো বেশ ঝিমোতে ঝিমোতে বলে যাচ্ছ হুম, তারপর যে পাগলাই সাঁকো নেড়ে দেবে!

সুশীলবাবু তখন চোখ মুছে বললেন: আচ্ছা দেখা যাক না ফ্রণ্টের কালকের মিটিংটা।

পরদিন অর্থাৎ ৩০শে ফ্রণ্টের বৈঠক বসার আগে থেকেই প্রবল উত্তেজনা। সি. পি. এমের খবর ছিল, সেইদিনের বৈঠকেই ফ্রন্ট ভেঙেগ যাবে। তাই তাঁরা সেই ভাবেই প্রস্তুত হয়েছিলেন।

বিকালে ফ্রণ্টের বৈঠক বসার আগেই প্রমোদ দাশগুপ্ত ডেকে একটা কপি বিলি করে দিলেন। ছয় দফা প্রস্তাব। বললেন, ফ্রণ্টের সংকট নিরসনের জন্য এই প্রস্তাব তাঁরা সেইদিন সন্ধ্যার বৈঠকেই তুলবেন।

এই প্রস্তাবে অবশ্য তেমন কোনও নতুন বক্তব্য ছিল না। কিন্তু প্রমোদবাবু সেদিন মুখে যা বললেন, তাতে কিছুটা নূতনত্ব ছিল। তিনি রিপোর্টারদের প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করলেন: যখন দেখছি যে বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্ট ভাঙগবেই তখন আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমরা জানি অজয়বাবু ফ্রন্ট ভাঙগবেনই—তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

ফ্রণ্টের মিটিং বসার কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টায়। কিন্তু আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। বৌবাজার স্ট্রীটে সি. পি. আইর অফিসের সামনেও বিরাট ভিড়। এত ভিড় যে ও রাস্তা দিয়ে ট্রাম বাস চলাচলই বন্ধ হয়ে গেল। প্রচুর পুলিশও তখন ওখানে হাজির। সি. পি. আইর কয়েকশ স্বেচ্ছাসেবকও অফিসের ভেতরে জমায়েত ছিলেন।

বৈঠক সুরুও হল উত্তেজনার মধ্যে। জ্যোতিবাবুরা তাঁদের দলের ছয় দফা প্রস্তাব সকলের সামনে রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর সেই 'বর্বর' ও 'অসভ্য' মন্তব্যের প্রশ্ন তুললেন।

অজয়বাবু তার জবাব দিয়ে বললেন: আমরা মনে করি, কোনও সভ্য সরকার সমাজের সমস্ত মানুষের দাবি দাওয়া মানতে পারে না। কিন্তু মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। এখন অবশ্য একটি দল অন্য দল এবং জনগণের বিরুদ্ধে বিশৃংখলামূলক কাজ করছে বা কাজের উসকানি দিচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি সমগ্র সরকারই অসভ্য। আমি 'অসভ্য' একথার চেয়েও শক্ত কথা 'বর্বর' ব্যবহার করেছি। এটা আমি বলি যখন আরামবাগে এস. ডি. ওকে মারা হয় সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

মুখ্যমন্ত্রীর জবাব শোনার পরই জ্যোতিবাবু বললেন: যদি কোনও লোক বর্বরের মত কাজ করে তার বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী তা না করে যদি গোটা সরকারকে অসভ্য, বর্বর বলেন তবে সেটা অন্যায় ও অসঙ্গত। আমরা এজিনিষ কিছুতেই মানতে পারি না। তবু, আমরা আলোচনা করে দেখব কী করে বিধানসভায় সবাই এক হয়ে চলতে পারি।

এই প্রসঙ্গ শেষ হতে না হতেই অন্য কয়েকটি দল থেকে আবার চেপে ধরা হল জ্যোতিবাবুকে: আপনাদের নেতা সুন্দরায়া বলেছেন ফ্রন্টের ভেতরের কয়েকটি দল জোতদারদের দালাল। তিনি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দলের নামও করেছেন। বলুন, আপনারা ঠিক কী বলতে চান?

জ্যোতিবাবু জবাব দিলেন: আমরা যুক্তফ্রন্টের কোনও দলকেই জোতদারদের দালাল বলে মনে করি না। যদি তা মনে করতাম তাহলে তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে চলতে রাজী হতাম না।

এরপর বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে, আগের দিনের মিটিংয়ে যে সব প্রস্তাব নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেগুলির কী হবে?

সবাই বললেন: ঠিক আছে, যে লাইনে আলোচনা হয়েছিল সেই লাইনে প্রস্তাব রচিত হোক। সেই প্রস্তাব রচনার দায়িত্ব নিলেন অশোক দাশগুপ্ত। অশোকবাবু ওই প্রস্তাবের খসড়া তৈরীতে হাত দিলেন। অন্যদিকে অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনাও চলতে থাকল।

প্রথমেই এল মন্ত্রী পিছু একটি করে পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের প্রস্তাব। সি. পি. এম সুরুতেই বললেন: না, আমরা ও রকম কোনও প্রস্তাবে রাজী নই। অন্য অনেকেই কিন্তু বললেন, ওই রকম কমিটি অত্যাবশ্যক। শেষ পর্যন্ত সি. পি. এম যখন দেখলেন যে অধিকাংশ দলই ওই প্রস্তাবের সমর্থক তখন তাঁরা জানালেন: আচ্ছা, তাহলে আমরা পারটিতে আলোচনা করে দেখি।

তারপরই এল প্রতি পুলিশ থানার পরিচালনায় পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি করে ফ্রন্ট কমিটি গঠনের প্রস্তাব। সি. পি. এম এ প্রস্তাব আরও প্রচণ্ডভাবে বাধা দিলেন। শেষ পর্যন্ত এনিয়ে ভোটাভুটিও হল। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই, এস. এস. পি, বিদ্রোহী পি. এস. পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বলশেভিক পারটি এবং গোরখা লীগ। বিপক্ষে সি. পি. এম, আর. সি পি. আই, ফঃ বঃ (মাঃ), আর. এস. পি, ওয়ারকারস পারটি এবং লোকসেবক সংঘ। এস. ইউ. সি নিরপেক্ষ থাকলেন। বললেন, আমাদের পারটি এই সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি।

তারপর এল মিছিলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলার প্রসঙ্গ। তা নিয়েও প্রচণ্ড মতভেদ। সি. পি. এম বললেন, এটা আটকানো যাবে না; কারণ গ্রামের মানুষ চিরকালই লাঠি বল্লম নিয়ে চলে। সি. পি. আই প্রভৃতি বললেন, কিন্তু এটা না বন্ধ করলে হাঙ্গামা কমবে না। তখন ঠিক হল সরকারী ভাবে এজিনিষ নিষেধ করা হবে না, তবে সবাই চেষ্টা করবেন যাতে মিটিং-এ মিছিলে লাঠি বল্লম না আনা হয়।

এইভাবে যখন প্রতিটি প্রশ্নেই মতভেদ, যখন ভেতরে ও বাইরে তীব্র উত্তেজনা তখন এল অশোক দাশগুপ্ত রচিত প্রস্তাব। প্রস্তাবের ভাষা নিয়ে তীব্র মতভেদ

দেখা দিল। বাংলা কংগ্রেস এবং বিদ্রোহী পি. এস. পি দাবি করলেন, আগের দিন ফ্রন্টের মিটিং-এর পর বাম ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যরা যে 'অভদ্র আচরণ' করেছে এবং বিধানসভার পরে আর একদিন একই ছাত্র সংস্থা যে বাংলা কংগ্রেস ও সি. পি. আই বিরোধী ধ্বনি দিয়েছে স্পষ্ট ভাষায় নাম করে তার নিন্দা করতে হবে।

সি. পি. এম বললেন: না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ, বিধানসভার সামনে ছাত্রফেডারেশনের ছেলেরা ওই রকম কোনও শ্লোগানই দেয়নি।

অজয়বাবু বললেন: হ্যাঁ, দিয়েছে, আমার পারটির এম. এল. এরা শুনেছে।

জ্যোতিবাবু রেগে জবাব দিলেন: যে যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে হবে নাকি! ওসব বাজে কথা।

আর যায় কোথায়! অজয়বাবু রেগে আগুণ! প্রায় চিৎকার করেই বললেন: আপনারা লোককে মারবেন, আপনাদের পারটির ছেলেরা আমাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেবে আর তা বলা যাবে না! এই জিনিষ আমি মানতে রাজী নই। আমি আপনাদের চোখ রাঙ্গানিকে ভয় পাই না। আমি কারু জুলুম মানি না।

উত্তেজনায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন সুশীল ধাড়াও। চিৎকার করে বলে চললেন সুশীলবাবু: আমরা কাউকে ভয় করি না। আমরা সি. পি. এমের চোখ রাঙ্গানিকে ভয় করে চলব না। আমরাও যা খুশী তাই করব।

জ্যোতিবাবুও এই উত্তেজনার মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি বলতে বলতেই বেরিয়ে গেলেন: এই বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত হলে আমরা তা মানব না।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন সহকর্মী সরোজ মুখার্জী এবং ওয়ারকারস পারটির জ্যোতি ভট্টাচার্য।

সি. পি. আই অফিস ছেড়ে যাওয়ার আগে কিন্তু জ্যোতিবাবু লালবাজারে টেলিফোন করতে ভুললেন না। পুলিশকে নির্দেশ দিলেন: হরেকৃষ্ণ কোঙার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের জনসভায় বক্তৃতা করছেন। তাঁকে জানিয়ে দিন তিনি যেন ওই সভার শেষে শ্রোতাদের সুশৃংখলভাবে ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন।

সি. পি. এম সেদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দলের যুবকর্মীদের একটা জনসভা ডেকে রেখেছিলেন। ঠিক ছিল, ফ্রন্ট ভেঙ্গে গিয়েছে এই খবর এলেই দলের কর্মীরা অ্যাকসনে নেমে যাবেন।

জ্যোতিবাবু কিন্তু ওই উত্তেজনার মধ্যেও বুঝলেন, ফ্রন্ট ভাঙ্গল না। তাই তিনি কমরেডদের সুশৃংখল ভাবে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

পরদিনই জ্যোতিবাবুর আগের চিঠির জের টেনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে এক কড়া চিঠি দিলেন। লিখলেন: আপনি সরকারী তথ্য ফাঁস করে শপথ ভেঙ্গেছেন। আপনার আচরণের আইনগত তাৎপর্য খতিয়ে দেখছি। ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা হাতে রাখছি।

রিপোর্টাররা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন: আইনগত ব্যবস্থা বলতে আপনি কী বুঝিয়েছেন?

মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন, এখনই কিছু বলব না।

জ্যোতিবাবু এই চিঠির জবাব দিলেন ৩রা ফেব্রুয়ারি। সোজা কথা: আপনি যা খুশী করতে পারেন।

ওদিকে তখন বিধানসভায়ও উত্তেজনা চলছে। ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সদস্যরাও রাজ্যপালের ভাষণের বিতর্কে সি. পি. এমের তীব্র সমালোচনা সুরু করে দিয়েছেন। পুলিশের তিনজন ডি. আই· জির বদলীর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর সুপারিশ আটকে দেওয়ায়ও এই সময় আর এক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

এই অবস্থায় এল ৪ঠা। সেদিন ফ্রন্টের বৈঠক হওয়ার কথা। বাংলা কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগ দিতে রাজীই ছিলেন। কারণ, সি. পি. আই প্রভৃতি বুঝিয়ে-ছিলেন যে এবার এস. ইউ· সি তাঁদের সংগেই ভোট দেবেন। ফলে জয় সুনিশ্চিত। এবং, সব প্রস্তাবই ভোটের জোরে পাশ করে নেওয়া যাবে।

কিন্তু মিটিং-এর দিন বিকালে দেখা গেল, এস. ইউ. সি তখনও প্রস্তুত নন। তাঁরা বললেন, আর একদিন সময় চাই। ফলে বাধ্য হয়েই সেইদিন সি. পি. আই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের পরামর্শে বাংলা কংগ্রেস শেষ মুহূর্তে জানালেন: সি. পি. এম তাঁর মনোভাব পাল্টেছে এটা না দেখতে পেলে আমরা বৈঠকেই যাব না। একেবারে শেষ মুহূর্তে বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্টের আহ্বায়কদের এই কথা জানালেন। তখন অনেকেই বৌবাজার ষ্ট্রীটে হাজির হয়েছেন। মায় জ্যোতিবাবু।

শেষ মুহূর্তে বাংলা কংগ্রেসের এই মতি পরিবর্তন দেখে সি. পি. এম আশ্চর্য হয়ে গেলেন! তাঁরা বললেন: এ কেমন ভদ্রতা, আগে বলা যেত না যে আমরা মিটিং-এ যাব না!

ফ্রন্টের বৈঠক আর সেদিন হল না। বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সি. পি. এমের এই দিনের রাগ দেখে সি. পি. আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা মুচকি মুচকি হাসলেন।

কিন্তু পরদিনই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও সুশীল ধাড়ার কান্ড দেখে সকলেরই হাসি মিলিয়ে গেল। রাজ্যপালের ভাষণের জবাব দিতে উঠে সুশীলবাবু রাজ্যের এক ভয়াবহ ছবি তুলে ধরলেন। লুণ্ঠন, অত্যাচার, জুলুম, খুনোখুনির অসংখ্য নজির দিলেন।

তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলেন জ্যোতিবাবু ও হরেকৃষ্ণ কোঙার। জ্যোতিবাবু বললেন: ফ্রন্ট থাকা উচিত। দেশের মানুষই এই রায় দিয়েছেন। ফ্রন্ট ভাংগা ভুল পথ। সঠিক পথ হচ্ছে আবার জনগণের কাছে ফিরে যাওয়া, আবার নির্বাচন করা।

সর্বশেষে বললেন মুখ্যমন্ত্রী: এ সরকার অসভ্য ও বর্বর।...আমি মুখ্যমন্ত্রী নিরুপায়। এ এক অসহনীয় অবস্থা।...এর নাম যুক্তফ্রণ্ট! এর নাম জনকল্যাণ! এই 'কল্যাণ' যত তাড়াতাড়ি খতম হয় ততই ভাল। এই জিনিষ পাঁচ বছর চলতে পারে না, কিছুতেই চলতে পারে না।

বুঝতে কারুই বাকি রইল না যে এইটাই যুক্তফ্রন্টের শেষ অধ্যায়।

সরকারের পতন

অজয়বাবু ততদিনে মনঃস্থির করে ফেলেছেন।

তখনও অবশ্য তিনি সি. পি. এম-বর্জিত সরকার গঠনের আশা ছেড়ে দেননি। তখনও তিনি সেজন্য সচেষ্ট। কিন্তু সেই সঙ্গেই এটাও ঠিক করে ফেলেছেন যে সি. পি. এম-বর্জিত সরকার গঠন সম্ভব না হলে পদত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের ব্যবস্থা করে দেবেনই। অজয়বাবু তখন আর কিছুতেই সি. পি. এমের হাতে কোনও সরকারী ক্ষমতা থাকতে দিতে রাজী নন।

৭ই ফেব্রুয়ারি নব কংগ্রেস সভাপতি জগজীবন রাম কলকাতা এলেন। তিনি অবশ্য প্রকাশ্যে বললেন: আমরা মোটেই যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার চেষ্টা করছি না। তবে, গোপনে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের জানিয়ে গেলেন: সি. পি. এম-বর্জিত সরকার হলে নব কংগ্রেস তাকে বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে।[১] এ আশ্বাস অবশ্য বাংলা কংগ্রেস আগেই পেয়েছিলেন।

সেইদিন রাত্রেই ছিল বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর সভা। এই সভার পর সুশীল ধাড়া সাংবাদিকদের বললেন: আমরা আর অপেক্ষা করতে রাজী নই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, 'গোপন সিদ্ধান্ত' কার্যকর করুন। তবে, তা করার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে সে ব্যাপারে ফ্রণ্টের বিভিন্ন শরিক দলের সঙ্গে আলোচনা করতেও বলা হয়েছে।

সেইমত পরদিন সকালেই অজয়বাবু সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি, বিদ্রোহী পি. এস. পি, এস. এস. পি, গোর্খা লীগ এবং বলশেভিক পারটির প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন। এবার তিনি তাঁদের কাছে সোজাসুজি প্রস্তাবটা রাখলেন: আমরা আর অপেক্ষা করতে রাজী নই। আমি আবার সেই পুরনো প্রস্তাবই আপনাদের কাছে রাখছি—জ্যোতিবাবুর হাত থেকে হোম এবং সত্যপ্রিয় রায়ের হাত থেকে শিক্ষা কেড়ে নেওয়া হোক। তারপর ওঁরা সরকারে থাকেন ভাল, না হলেও আমরা সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনসহ সরকার চালিয়ে যেতে পারব।[২]

ওঁরা কিন্তু তখনও সে প্রস্তাবে রাজী নন। মুখ্যমন্ত্রীকে তাই আবার ওঁরা অনুরোধ জানালেন: আপনি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। যুক্তফ্রণ্টে যে সব প্রস্তাব আনা হয়েছে সেগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া হোক। তারপর যুক্তফ্রন্ট এবং মন্ত্রিসভা থেকেই ভোটাধিক্যে সি. পি. এমের বিরুদ্ধে অ্যাকসান নেওয়া যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী তবু বললেন: না, আর আমার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি সি. পি. এম কিছুতেই মারদাঙ্গা বন্ধ করবে না। সুতরাং,

---

১ আনন্দবাজার পত্রিকা ৭-২-৭০।

২ অশোক ঘোষ সাক্ষাৎকার। ২২-৭-৭০।

ওঁদের সঙ্গে একত্রে চলে আমি আর পাপের ভাগী হতে চাই না। আমরা বেরিয়েই যাব, আপনারা চান সি. পি. এমের সঙ্গে সরকার চালান। আমাদের ছেড়ে দিন।

ওঁরা সবাই জবাব দিলেন: তা হয় না। আপনাকে থাকতেই হবে। আর একটু ধৈর্য ধরতেই হবে। সি. পি. এমকে আরও একসপোজ করা দরকার। যুক্তফ্রন্টের মিটিংগুলো হোক। আপনি অপেক্ষা করুন। ধৈর্য ধরুন। ওঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবেই।

ওরা সকলে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথা জানাতেও ভুললেন না যে অজয়বাবু চলে গেলে সি. পি. এমের সঙ্গে সরকার চালাবার কোনও প্রশ্নই নেই। বললেন: আপনি ছেড়ে দিলে স্বাভাবিকভাবেই এ সরকার ভেঙ্গে যাবে।

অজয়বাবু জবাব দিলেন: আচ্ছা, আমি ফ্রন্টের আর একটা মাত্র মিটিং দেখতে রাজী। তারপর আর কিছুতেই না।

এই বলে সেইদিনই তিনি দিল্লী যাত্রা করলেন। প্রধান উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা।

এতদিন অজয়বাবু দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন প্রধানত রাজ্যপাল ধাওয়ানের মাধ্যমে। তাছাড়া, সিদ্ধার্থ রায় এবং তরুণকান্তি ঘোষও অজয়বাবুর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন।

মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে গোটা পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন। সেই বিবরণের সার কথা: সি. পি. এমকে আর সরকারে থাকতে দেওয়া রাজ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর হচ্ছে। ওরা প্রশাসনিক যন্ত্রের সর্বনাশ করে দিয়ে যাচ্ছে। অজয়বাবু আরও জানালেন: আমি এখনও সি. পি. এম-বর্জিত সরকারের চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে, নন-সি. পি. এম পারটিগুলি এখনও তাতে রাজী হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত হবে কিনা তাও জানি না। ইতিমধ্যে অবশ্য এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে আমি পদত্যাগ করলে সি. পি. এম সরকার করতে পারবে না। কারণ, ফ্রন্টের অধিকাংশ দলই তাতে রাজী হবে না। তাই, আমি পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতির শাসনই হবে।

প্রধানমন্ত্রী তখনও চাইছেন পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম-বর্জিত সরকার। তিনি সেই উদ্দেশ্যে অজয়বাবুকে আরও চেষ্টা করতে বললেন। তবে, এও জানালেন যে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রপতির শাসনের ব্যবস্থাই করত হবে। সর্বশেষেও তিনি অজয়বাবুকে বললেন: ওঁদের রাজী করাবার চেষ্টা করুন, যাতে সি. পি. এম চলে গেলেও সরকার চলতে পারে।

অজয়বাবু কলকাতা ফিরে এলেন ১১ই। এসেই তিনি বরদা মুকুটমণিকে ডেকে বললেন: ফ্রন্টের মিটিং ডাকুন।

বরদাবাবু ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকের সঙ্গে কথা বলে ঘোষণা করলেন: ২৩শে ফেব্রুয়ারি বৈঠক হবে।

অন্যদিকে তখন সি. পি. এমও প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের তখনও বদ্ধমূল ধারণা,

পশ্চিমবঙ্গে কেরলের মত মিনি ফ্রণ্ট সরকার হচ্ছে।

সেইজন্যই ৯ই ফেব্রুয়ারি দলের সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরায়া এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বললেন: সব আলোচনার আগে ফ্রণ্টের সব সদস্যকে প্রকাশ্যে বলতে হবে যে "এই ফ্রণ্টই থাকবে, মিনি ফ্রণ্ট হবে না।" সকলে যদি তা করতে রাজী না হন তাহলে সি. পি. এম আর কোনও আলোচনায় সম্মত নয়।

সি. পি. এম এই সময় এটাও বুঝে গিয়েছিলেন যে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতিরা ফ্রণ্টে ভোটের জোরে কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে চান। এবং সেই প্রস্তাবগুলি আনা হবে প্রধানত সি. পি. এমকে বেকায়দায় ফেলার জন্যই। তাই, ওই সাংবাদিক বৈঠকে সুন্দরায়া একথাও বললেন যে "গরিষ্ঠের ভোটের জোরে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা হলে ফ্রণ্ট ভেঙ্গে যাবে।"

সি. পি. এম তখন "আবার নির্বাচনের" দাবিও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে গোটা পরিস্থিতি আলোচনার পর সুন্দরায়া বললেন: বর্তমান যুক্তফ্রণ্টের একমাত্র বিকল্প হল অন্তর্বর্তী নির্বাচন। এই ফ্রণ্ট যদি ভাঙ্গে তাহলে আমরা আবার জনগণের রায় চাইব। আমরা কোনও ভাবেই কোনও বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করব না। বিকল্প সরকার কেউ করলে আমরা তাকে অচল করে দেব।[৩]

কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর শুরু হল দলের রাজ্য প্লেনাম। সেই প্লেনামেও গোপন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল: পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম-বর্জিত সরকার হলেই প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে। হাফ-পারটিজান ওয়ার ফেয়ার সুরু হয়ে যাবে।

অজয়বাবু যে আর কোনও রফায় বিশ্বাসী নন, তিনি যে মিটমাটের উদ্দেশ্যে ২৩শে ফ্রণ্টের মিটিং ডাকতে বলেননি সেটাও সকলের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল ১২ই ফেব্রুয়ারি। সেইদিন বাংলা কংগ্রেসের কর্ম পরিষদ এবং এম. এল. এরা বসে যৌথভাবে স্থির করলেন, ২০শে তাঁদের দলের তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

এই সিদ্ধান্ত দেখে সি. পি. আই প্রভৃতি বেশ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা গিয়ে অজয়বাবু এবং সুশীলবাবুকে বললেন : আপনারা যে পরবর্তী ফ্রণ্ট বৈঠক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হলেন? এখন তাহলে সেই বৈঠকের আগেই এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কেন?

ওঁরা জবাব দিলেন: আমরা তো তার আগে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিচ্ছি না। মুখ্যমন্ত্রী তো থাকছেনই। দলের অন্যান্য মন্ত্রীরা শুধু পদত্যাগ করছেন।

বিভিন্ন দল তখন পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করতে বসলেন। সকলেরই মূল প্রশ্ন: বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্তটা কেন? পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী?

এই ব্যাপারে কিন্তু আশ্চর্য মিল দেখা গেল দুই ক্যাম্পেই। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রভৃতিরা যে সিদ্ধান্ত নিলেন সেই সিদ্ধান্তে

---

[৩] আনন্দবাজার পত্রিকা ১০-২-৭০।

পৌঁছলেন সি. পি. এমও। তাঁরা সবাই ধরে নিলেন, তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যই অজয়বাবুর দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি মনে করলেন: এই ভাবে ভয় দেখিয়ে তাঁদের সি. পি. এম-বর্জিত সরকার গঠনে রাজী করানোই অজয়বাবুদের আসল উদ্দেশ্য। সি. পি. এম মনে করলেন: তাঁদের মাথা নত করাবার জন্যই বাংলা কংগ্রেস এই চাল দিয়েছেন।[৪]

কার্যত এই সময় যুক্তফ্রন্ট তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে: (১) বাংলা কংগ্রেস, (২) সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রভৃতি, এবং (৩) সি. পি. এম ও তাঁর সহযোগীরা।

তিন দলের অ্যাসেসমেণ্ট তখন তিন রকম।

বাংলা কংগ্রেসের তখন মোটামুটি ধারণা: চরম মুহূর্ত এলে শেষ পর্যন্ত সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রভৃতি সি. পি. এম-বর্জিত সরকার গঠনে রাজী হয়ে যাবেই। তাতেও অবশ্য যুক্তফ্রণ্টের ১৪০জন এম. এল. একে সঙ্গে পাওয়া যাবে না। জনা দশ পনেরো বাকি থেকে যাবে। সে অভাবটা পূরণ করে দেবে নব কংগ্রেস। তাঁরা বাইরে থেকেই অজয়বাবুর সি. পি. এম-বর্জিত সরকারকে সমর্থন করবে। তাই, প্রয়োজন যেটা সেটা হল আস্তে আস্তে চরম মুহূর্তটা নিয়ে এসে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতিকে সি. পি. এম-বর্জিত সরকার গঠনে রাজী করানো।

সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি গোষ্ঠীর মনোভাব: অজয়বাবুর সি. পি. এমের সঙ্গে চলতে অসুবিধা হচ্ছে সত্য। কিন্তু বিকল্প কোনও মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা না করে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়বেন না। তিনি নব কংগ্রেসের সমর্থনে সি. পি. এম-বর্জিত সরকার গঠনের জন্য তাঁদের উপর নানাভাবে চাপ দিয়ে যাবেন। কিন্তু যদি দেখেন যে কিছুতেই তা হচ্ছে না তাহলে শেষ পর্যন্ত রফায়ই রাজী হবেন। আর চাপ যত বাড়বে সি. পি. এমও তত নামবে। তাঁরা শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র দফতর ছাড়তে রাজী না হলেও হোম ডিপার্টমেণ্টে অন্যদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ মেনে নেবেই।

আবার সি. পি. এমের অ্যাসেসমেণ্ট: অজয়বাবু এবং সি. পি. আই ইন্দিরার পরামর্শে পশ্চিমবঙ্গেও মিনি ফ্রণ্ট সরকার করতে চাইছে। তবে, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি রাজী না হলে তা সম্ভব হবে না। আর যতক্ষণ না বিকল্প সরকারের ব্যবস্থা করতে পারছেন ততক্ষণ অজয়বাবু কিছুতেই এই সরকার ভাঙবেন না।

বাংলা কংগ্রেস তাই ২৩শে ফ্রণ্টের বৈঠকে রাজী হলেও সি. পি. এম-বিরোধিতা বাড়িয়েই যেতে লাগলেন। অনমনীয় মনোভাব দেখাবার জন্য সবকিছু করলেন।

---

[৪] পদত্যাগের খবর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, "অজয়বাবু ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন।" আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪-২-৭০।

১৪ই একটা শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব দিলেন কয়েকজন ফ্রন্ট নেতা—দুপক্ষের কাছেই। বললেন: অজয়বাবু এবং জ্যোতিবাবু নিজেদের মধ্যে একবার কথা বলুন। তাঁরা দুজনেই মিটমাটের আলোচনায় বসুন। তাহলে ভুলবোঝাবুঝি কমবে।

সুশীল ধাড়া সরাসরি জবাব দিলেন: নো।

বসিরহাটে তখন লোকসভায় উপনির্বাচন হচ্ছিল। ফ্রন্টের পক্ষে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী। প্রতিদ্বন্দ্বী নব ও আদি কংগ্রেসের দুই প্রার্থী এবং প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ। বাংলা কংগ্রেস ঘোষণা করলেন, নির্বাচনী অভিযানে তাঁরা সি. পি. এমকে কিছুতেই সঙ্গে নেবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী আবার এই সময় ভোট অন অ্যাকাউন্টস পাশ করিয়ে নেওয়ারও একটা চেষ্টা করলেন। তাই দেখে সি. পি. এম আবার ধরে নিলেন, অজয়বাবু এইভাবে বাজেট পাশ করিয়ে নিয়ে তারপর মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে চান। তাঁরা তাতে বেজায় শংকিত হয়ে উঠলেন। পুলিশের বেতারে খবর পাঠিয়ে দলের সব মন্ত্রীকে কলকাতা এনে হাজির করালেন—যাতে মুখ্যমন্ত্রী না ভোটের জোরে ক্যাবিনেটে কিছু পাশ করিয়ে নিতে পারেন। ভিন্ন দলের একজন পূর্ণ মন্ত্রীর জন্য মদের বোতলও পাঠিয়ে দেওয়া হল—যাতে তাঁকে দলে পাওয়া যায়! আর. এস. পি, লোকসেবক সংঘ প্রভৃতিকেও চাঙ্গা করে রাখা হল।

কিন্তু ভোট অন অ্যাকাউন্টসের সে প্রস্তাবেও জল ঢেকে দিলেন সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি। তাঁরা বললেন: হঠাৎ এজিনিষ করা কেন, করে লাভই বা কী!

অজয়বাবু তখন সে পথও ত্যাগ করলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারির ক্যাবিনেট বৈঠকে ও প্রসঙ্গ তুললেনই না।

তখন বাইরে মারামারিও অব্যাহত। বাংলা কংগ্রেস তাতে আরও বিক্ষুব্ধ। ১৪ই চাতরায় মুখ্যমন্ত্রীর এক নির্বাচনী সভায় সি. পি. এম সমর্থকরা কিছুটা হামলা করলেন। সেখানে তাঁরা শ্লোগান দিলেন: অজয় মুখার্জী মুরদাবাদ, জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ। ২৬শে আসানসোলের কয়লা খনি অঞ্চলে সি. পি. এম-সি. পি. আই এবং সি. পি. এম-এস এস· পি প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। তার পরদিন সংঘর্ষ হল বীরনগরে—সি. পি. এম বনাম আর. এস. পি। ১জন মারাও গেলেন এই সংঘর্ষে। তখন কলকাতা শহরেরও মারাত্মক অবস্থা। চোর, গুণ্ডা, বদমাস, ছেনতাইবাজরা অবাধে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। শহরে সন্ধ্যের পর লোকচলাচল কমে গেল। নানা রকম আতংকজনক কাহিনী রটল। মহিলাদের শ্লীলতাহানির নানা কাহিনীও শোনা যেতে লাগল।

বিধানসভায়ও তখন সি. পি. এম এবং বাংলা কংগ্রেসের দুই মন্ত্রীতে এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। একদিন প্রশ্নোত্তরের সময় উত্তেজিত শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় বাংলা কংগ্রেসের মন্ত্রী চারুমিহির সরকারকে বলেই বসলেন: মুখ সামলে কথা বলবে! চারুমিহির জবাব দিলেন: চড়িয়ে দাঁত খুলে নেব!

দুই মন্ত্রীর ঝগড়াটা সুরু হয় নদীয়ার একটা কলেজের ব্যাপারে। সেই কলেজের সঙ্গে চারুবাবু জড়িত ছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে সত্যপ্রিয় রায় চারুবাবুর নামেই কিছু অভিযোগ করলেন। তাই শুনে চারুবাবু চিৎকার করে

কৃষক
কমিটি

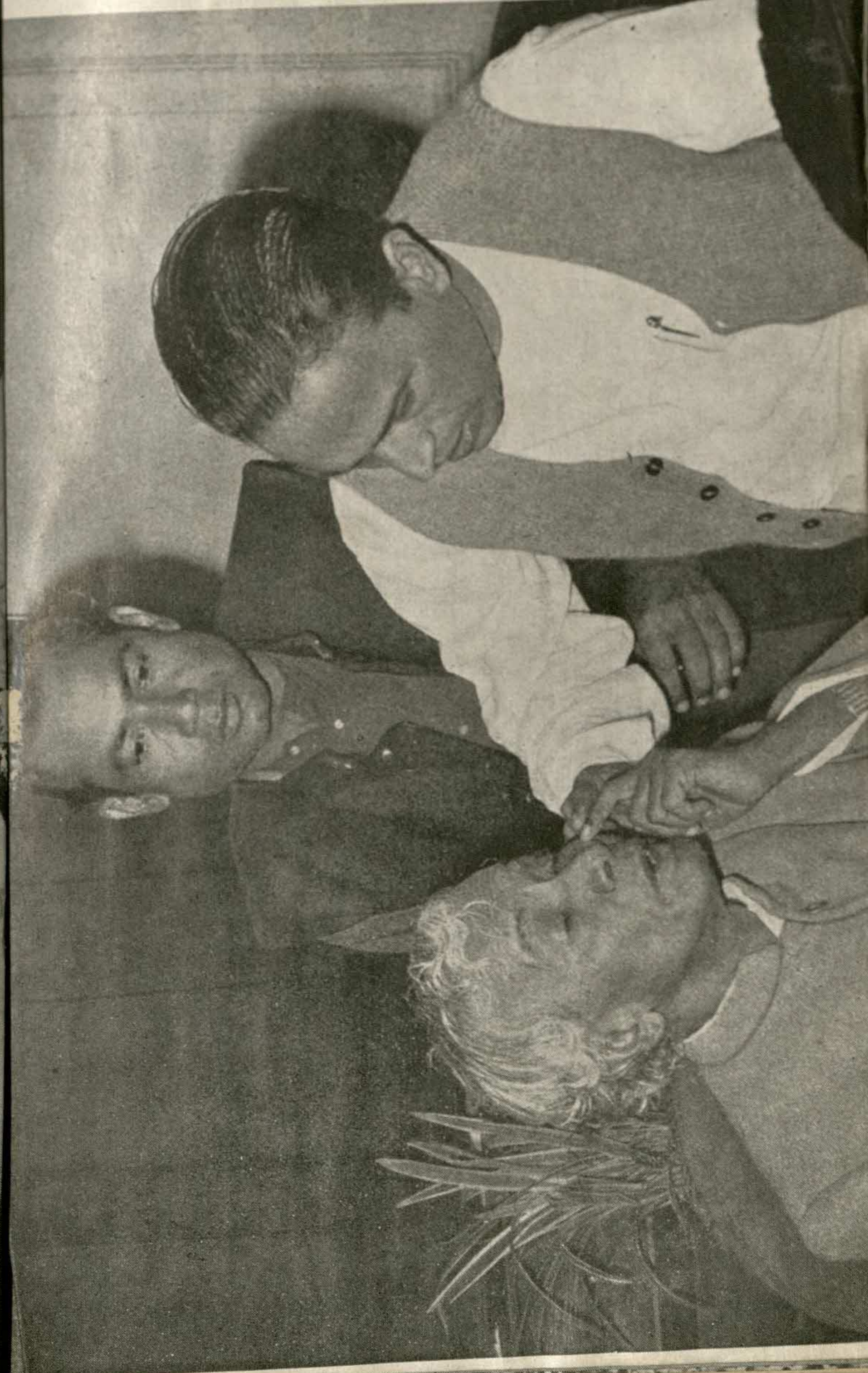

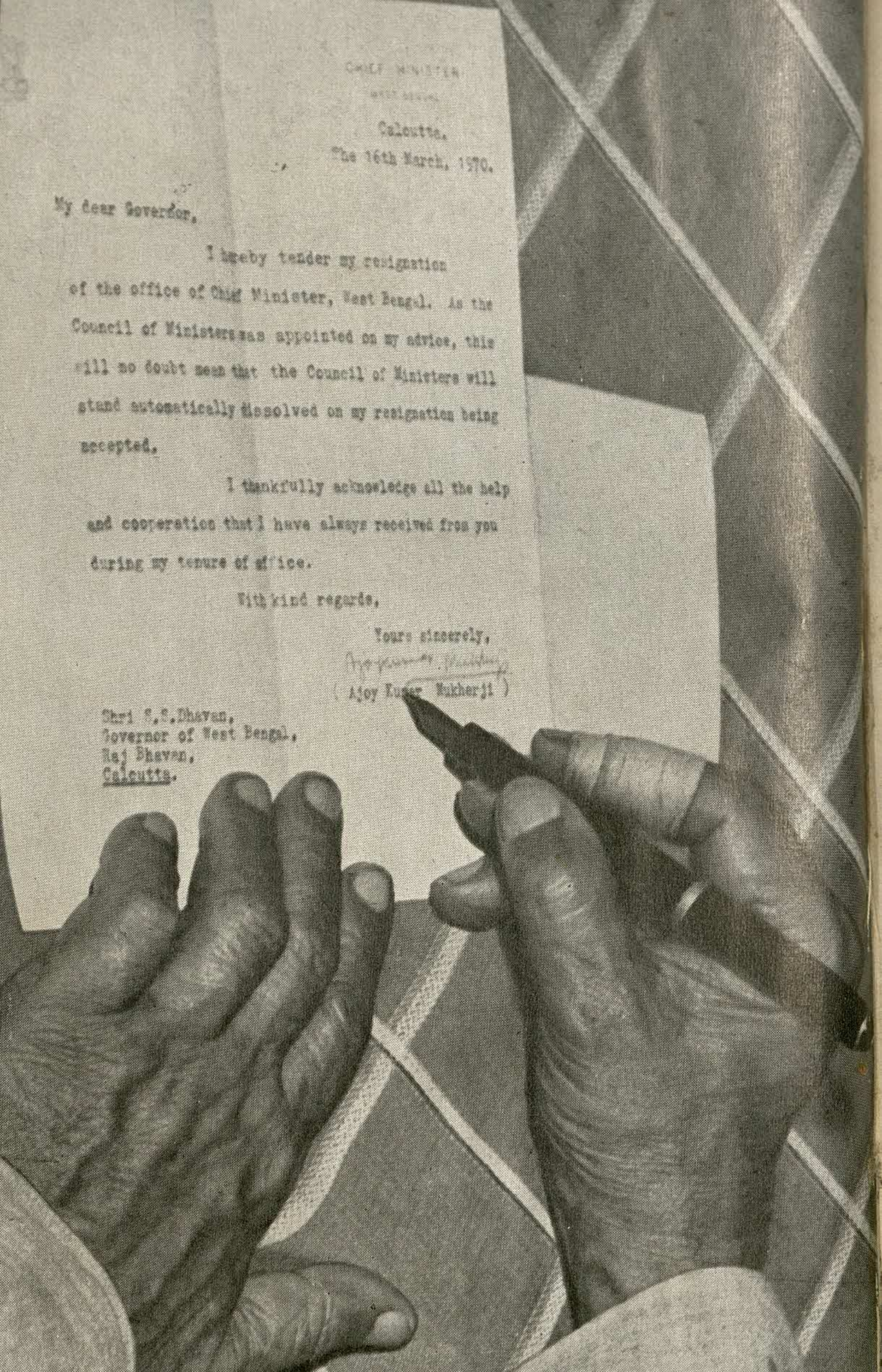

Calcutta,
The 16th March, 1970.

My dear Governor,

I hereby tender my resignation of the office of Chief Minister, West Bengal. As the Council of Ministers was appointed on my advice, this will no doubt mean that the Council of Ministers will stand automatically dissolved on my resignation being accepted.

I thankfully acknowledge all the help and cooperation that I have always received from you during my tenure of office.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Ajoy Kumar Mukherji)

Shri S.S.Dhavan,
Governor of West Bengal,
Raj Bhavan,
Calcutta.

উঠলেন, মিথ্যে কথা! অমনি সত্যপ্রিয় রায় জবাব দিলেন : মুখ সামলে কথা বলবে!

এই যখন অবস্থা সেই সময় একদিন[৩] চরম হতাশার সুরে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বললেন: সুরু হয়েছিল জমি লুঠ দিয়ে, তারপর ধান ও মাছ লুঠ, এখন হচ্ছে নারী লুঠ।...শরিক সংঘর্ষও রোজই হচ্ছে। প্রতিদিন মার খাওয়া, ঘরে আগুন দেওয়া, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অসংখ্য ঘটনার বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এ অবস্থা আর সহ্য করা যায় না।

ইতিমধ্যে দলের তিনজন মন্ত্রীও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন।

যেভাবে তাঁরা তিনজন পদত্যাগ করলেন, তাতে আবার ফ্রণ্টের সব শরিক দলের মধ্যেই জল্পনাকল্পনা সুরু হল। সাধারণ রীতি অনুসারে ওঁরা তিনজন আলাদা আলাদা পদত্যাগ দাখিল করলেন না। একই চিঠিতে তিন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন : আমরা পদত্যাগ করছি। মুখ্যমন্ত্রী, যিনি ওই দলেরই নেতা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন না।

সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করতে বললেন : হ্যাঁ, আমি ওঁদের পদত্যাগপত্র পেয়েছি।

সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি ওঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করছেন?

অজয়বাবু বললেন : দেখি।

এই 'দেখি" নিয়ে জোর জল্পনাকল্পনা সুরু হয়ে গেল—ওঁরা যদি সত্যিই পদত্যাগ করতে চাইবেন তাহলে ওভাবে পদত্যাগ করবেন কেন? বাংলা কংগ্রেস যদি তাঁদের তিনজন মন্ত্রীর পদত্যাগ চাইবেনই তাহলে তাঁদেরই দলের নেতা অজয়বাবু সে পদত্যাগপত্র গ্রহণে টালবাহানা করবেন কেন?

ফলে অনেকের মনেই এ ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হল যে, বাংলা কংগ্রেস চাপ দেওয়ার জন্যই এই "পদত্যাগের" ভয়টা দেখাচ্ছেন—আসলে ওঁরা সরকার ছেড়ে যাওয়ার জন্য এপথ নেননি।

সি. পি. এম গোষ্ঠীর বাংলা কংগ্রেস-এক্সপার্ট সুকুমার রায় তাই দেখে আরও জোর দিয়ে বললেন: আমি তো গোড়া থেকেই বলছি, অজয়বাবু কিছুতেই গদী ছেড়ে যাবেন না। বিকল্প ব্যবস্থা না করতে পারলে উনি এবং ওঁর ভাইরা কিছুতেই মন্ত্রিত্ব ছাড়বেন না।

মোটামুটি এই রকমই একটা ধারণা হল সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি-রও। তাঁরা যে ঠিক সুকুমার রায়ের মত ভাবছিলেন তা নয়। তবে, তাঁদের মনেও প্রশ্ন দেখা দিল, ওঁরা যদি পদত্যাগ করতে চাইবেনই তাহলে এমন করে এগোচ্ছেন কেন? ওঁরা আবার এই সিদ্ধান্তে পেঁছিলেন যে, অজয়বাবুরা সি. পি. এম-বর্জিত সরকার গঠনে অন্য সবাইকে বাধ্য করার জন্যই এইভাবে চাপ দিচ্ছেন। এটা চাপ বাড়াবারই একটা কৌশল।

ওঁরা, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি তাই নানা ভাবে বাংলা

---

[৩] ২৮-২-৭০।

কংগ্রেসকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে, তাঁরা কিছুতেই সি. পি. এম-বর্জিত নব কংগ্রেস-সমর্থিত সরকার গঠনে রাজী হবেন না। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস. ইউ. সি তখন নানাভাবে তাঁদের সি. পি. এম-বিরোধিতাও প্রকাশ করছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক কড়া কড়া বিবৃতি দিচ্ছেন। সি. পি. আই যুক্তফ্রন্ট বিরোধী পক্ষ পালন করে সি. পি. এমের 'মুখোস খুলে ধরছেন'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওই গোষ্ঠীর সকলে এটাও বলে যাচ্ছেন যে, কিছুতেই মিনি ফ্রন্টে তাঁরা রাজী নন।

সি. পি. এম তখন বুঝে গিয়েছেন যে, বাঁচার একমাত্র পথ ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস. ইউ. সি-কে গুড হিউমারে রাখা। কারণ, ওঁদের অ্যাসেসমেণ্ট মত, ওই দুই দলের আপত্তির জন্যই তখন মিনি ফ্রন্ট আটকে ছিল। স্বয়ং জ্যোতিবাবু তাই তখন ফরওয়ার্ড ব্লক আয়োজিত নেতাজী প্রদর্শনীতে গিয়ে স্বীকার করে এলেন যে, তাঁরা একদা সুভাষচন্দ্রকে বিশ্বাসঘাতক বলে মারাত্মক ভুল করেছিলেন—আসলে তিনি ছিলেন একজন বীর স্বাধীনতা-যোদ্ধা।

বিভিন্ন দফতরের জন্য যুক্তফ্রন্টের উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাবেও সি. পি. এম রাজী হয়ে গেলেন। অন্যতম শান্তির দূত মাখন পাল বিভিন্ন ফ্রন্ট নেতাকে এই খবর জানিয়ে বললেন : এখন তাহলে একটা রফা হতে পারে।[৬]

নানা দল তখন নানাভাবে রফার চেষ্টা সুরু করে দিলেন! নানা নেতা অজয়বাবুকে গিয়ে ধরলেন : আপনি তাহলে ফ্রন্টের বৈঠকের আগে আপনার পারটির তিন মন্ত্রীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে বলুন। তাহলে মিটমাটের পথ প্রশস্ত হবে।

অজয়বাবু কিন্তু সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলেন না।

এই অবস্থায় ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফ্রন্টের মিটিং বসল। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ নিয়ে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিল। সি. পি. এম বললেন: এটা ফ্রন্টের মূল নীতি-বিরোধী। ফ্রন্টের রীতি হল সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো। ভোটের ব্যাপার এখানে আসতে পারে না। কিন্তু সি. পি. আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লকও ছাড়ার পাত্র নন।

শেষ পর্যন্ত প্রতি থানায় কমিটি গঠন নিয়ে ভোটাভুটি হল এবং সেই ভোটাভুটিতে পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সমান ভোট পড়ল। পক্ষে : বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি, বলশেভিক পারটি, বিদ্রোহী পি. এস. পি এবং এস. এস. পি। বিপক্ষে : সি. পি. এম, আর. এস. পি, লোকসেবক সংঘ, ওয়ারকার্স পারটি, আর. সি. পি. আই, মারকসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং গোর্খা লীগ। গোর্খা লীগ ওপক্ষে চলে যাওয়ায় অনেকেই আশ্চর্য হলেন। আসলে এটা তখন ফ্রন্টের সব দল জানতেন না যে, সি. পি. এম রাম চ্যাটার্জী ও যতীন চক্রবর্তী মারফৎ বেশ কিছুদিন যাবতই গোর্খা লীগের দেওপ্রকাশ রাইকে ম্যানেজ করে ফেলেছেন।

সেদিনই ওই বৈঠকেই কিন্তু স্থির হল যে, ৪ঠা মারচ আবার ফ্রন্টের বৈঠক হবে এবং তখন অন্যান্য প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হবে।

---

[৬] আনন্দবাজার পত্রিকা ২২-২-৭০।

সি. পি. আই প্রভৃতি দল তখন বাংলা কংগ্রেস নেতাদের একথা বোঝাবারও চেষ্টা করলেন যে, ফ্রন্টের এর পরের বৈঠকে তাঁদের জয় নিশ্চিত। কারণ, গোর্খা লীগের নেতারা সকল প্রশ্নে তাঁদের সমর্থন করবেন বলেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফ্রন্টের বৈঠকেও তাঁদের অন্য প্রতিনিধি আসবেন—দেওপ্রকাশ রাই থাকবেন না। সুতরাং ভোট হবে ৮ : ৬। এইভাবেই সি. পি. এম-কে কোণঠাসা করা হবে। ক্যাবিনেটেও এইভাবেই ভোটাভুটি করা হবে।

কিন্তু তবু বাংলা কংগ্রেস পরের বৈঠকে উপস্থিত হতে রাজী হলেন না।

৩রা বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল বের হল। বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী জিতলেন। বাংলা কংগ্রেস এর আগেও কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু সেদিন একেবারে রিপোর্টারদের ডেকে অভিযোগ করলেন : সি. পি. এম প্রকাশ্যে প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছে। যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর বিরোধিতা করেছে।

পরদিন তাঁরা যুক্তফ্রন্টের বৈঠকেই গেলেন না। পারটির পক্ষ থেকে ফ্রন্টের আহ্বায়ককে লেখা হল : বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনে সি. পি. এম প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগকে জয়ী করার জন্য ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে সি. পি. এমের সঙ্গে আলোচনা করা চলবে কিনা এই প্রশ্নে দলের কর্মপরিষদের নির্দেশ নেওয়া দরকার। সেই নির্দেশ পাওয়ার আগে আমরা ফ্রন্টে যোগ দিতে পারব না।

সেদিন তাই ফ্রন্টের বৈঠকই হল না। এরপর অবশ্য যুক্তফ্রন্টের আর কোনও বৈঠকই হয়নি।

সেদিনের একটা দৃশ্য আমার আজও মনে আছে। বিধানসভা তখন চলছিল। বাংলা-কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট বৈঠকে যাচ্ছে না এই খবর ঘোষিত হওয়ার পরই আমরা দু-তিনজন রিপোর্টার গেলাম সোমনাথ লাহিড়ির ঘরে। সোমনাথবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমরা মাঝেমধ্যে তাঁর 'অফ দি রেকর্ড' অ্যাসেসমেণ্ট শুনতে যেতাম।

সেদিনও গিয়ে সোমনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম : কী মনে হয় আপনার?

উনি ততক্ষণে ভীষণ উত্তেজিত। অতটা উত্তেজিত আমি তাঁকে আর কোনও দিন দেখিনি। সোমনাথবাবু বললেন : ওরা মূর্খ, ওরা মূর্খ! এতবড় সুযোগটা হারালো! আজ সি. পি. এম-কে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেত। ওঁরা যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীকে হারাবার জন্য পি. এম. এল-এর সঙ্গেও হাত মেলাতে পারে তা জনসাধারণকে দেখানো যেত। বাংলা কংগ্রেস সে সুযোগটা নষ্ট করে দিল। ওরা মূর্খ!

আসলে কিন্তু বাংলা কংগ্রেস তখন সকলের সব সুযোগ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ!

৬ই মার্চ রাত্রে মুখ্যমন্ত্রী আবার চার পারটির নেতাদের ডাকলেন। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী পি. এস. পি-র প্রতিনিধিদের মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বললেন : আমি আর অপেক্ষা করতে রাজী নই। হয় আপনারা আমার প্রস্তাব সমর্থন করুন, আমি জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর কেড়ে

নেই; আর না হয় আমাকে পদত্যাগ করতে দিন। আমি চলে যেতে চাই।

ওঁরা আবার তাঁকে অনুরোধ জানালেন: না, আপনি আরও কিছুটা অপেক্ষা করুন। সি. পি. এমের বিরুদ্ধে জনমতকে আরও তীব্র করে তুলতে হবে। আরও সময় প্রয়োজন।

অজয়বাবু এবং সুশীলবাবু দুজনেই স্পষ্ট জবাব দিলেন: না, তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না। আপনারা যখন আমাদের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেনই না, তখন আমাদের এ সরকার ছেড়ে চলে যেতেই হবে। সাধারণ মানুষের উপর এত জুলুম, এত অত্যাচার সহ্য করা আর সম্ভব নয়।

ওঁরা বললেন: মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তো এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন হবে। সেটা কি কাম্য?

অজয়বাবু জবাব দিলেন: হোক রাষ্ট্রপতির শাসন, তবু আমি পদত্যাগ করব। এ জিনিস আর সহ্য করতে পারছি না। আমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাবো। প্রত্যেকটি মানুষকে গিয়ে বলব, খুনেদের সঙ্গে আর আমি নেই।...আমি পদত্যাগ করবই।

শেষ পর্যন্ত ওঁরা বললেন: আপনি আমাদের ৪৫ দিন সময় দিন। তারপর না হয় যা যা করতে চাইছেন সব সমর্থন করবো।[৭]

কিন্তু অজয়বাবু এবং সুশীলবাবু দুজনেই জবাব দিলেন: না, তা হয় না। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না।

ওঁরা ব্যর্থ হলেন। অজয়বাবু পদত্যাগ করবেনই। বাংলা কংগ্রেসও ফ্রন্ট ছাড়বেই।

শেষ চেষ্টা করলেন ভূপেশ গুপ্ত। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভূপেশবাবু ৭ই মার্চ কলকাতা এসে পেঁছিলেন। তিনি প্রথমেই তাঁর দলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর অজয়বাবুকে বোঝাতে গেলেন। সি. পি. আই নেতা নানাভাবে অজয়বাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, আরও কিছুটা অপেক্ষা করা প্রয়োজন। কেরলের নজির তুলে ধরলেন। যুক্তি দিলেন যে, ওই ভাবে এগোলে কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গেও সি. পি. এম-বর্জিত সরকার হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীরও নাম নিলেন। অজয়বাবুকে জানালেন যে, প্রধানমন্ত্রীও এভাবে এগোবার পক্ষপাতী নন। তিনিও রাষ্ট্রপতির শাসনের পক্ষপাতী নন। তিনিও কিছুটা অপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম-বর্জিত সরকার গঠন চান।

কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হল না। অজয়বাবু এবং তাঁর দল কারও অনুরোধ

---

[৭] অজয় মুখাজী। সাক্ষাৎকার ২১-৭-৭০। নির্মল বসু বলেন: আমরা অজয়বাবুকে বলেছিলাম ৪৫ দিনে সি. পি. এম-কে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে; না হলে তখন পদত্যাগ করবেন।

শুনলেন না। ৭ ও ৮ মার্চ ১৩ ঘণ্টা আলোচনার পর বাংলা কংগ্রেসের কর্ম পরিষদ এবং পরিষদীয় দল যুক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন : ১৬ই মার্চের মধ্যে অজয়বাবু পদত্যাগ করবেন। তিনি তার আগে দলের অন্য তিনজন মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন। এবং বাংলা কংগ্রেস আর যুক্তফ্রণ্টে থাকবেন না।

দীর্ঘ একটা প্রস্তাব নিলেন বাংলা কংগ্রেসের কর্ম পরিষদ ও পরিষদীয় দল। কেন তাঁরা যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে দিচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করলেন সেই প্রস্তাবে। বললেন : এই সভা মনে করে যে, সি. পি. আই (এম)কে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট আশানুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে সেবা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলীকে বত্রিশ দফা কর্মসূচীর যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সি. পি. আই (এম)-এর বর্বর, আক্রমণাত্মক মনোভাব, জুলুমবাজী এবং ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণে তা আশানুরূপভাবে রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। বাংলা কংগ্রেস পুরোপুরি বুঝেছে যে, এই যুক্তফ্রন্টকে দিয়ে কিছু করা যাবে না। কারণ, সি. পি. আই (এম) ভেতরে ও বাইরে থেকে ফ্রন্টকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

সবাই বুঝলেন, এবার যুক্তফ্রণ্টের শ্বাস উঠেছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই এবারও প্রশ্ন উঠল, অজয়বাবু যদি পদত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেনই, যদি এই সরকার চালাতে আর কিছুতে রাজী না-ই হবেন তাহলে বাংলা কংগ্রেস ৮ই মার্চ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কেন বলছেন—আপনি ১৬ই পদত্যাগ করুন? কেন তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ নয়? এই অপেক্ষা কেন? ওঁরা কি এর পরও ম্যানুভারিং-এর চেষ্টা করতে চান? ওঁরা কি সেইজন্যই হাতে সময় রাখলেন?

রিপোর্টাররা এই প্রশ্নটা সেদিনই রাখলেন সুশীল ধাড়ার কাছে : সরকার যখন ছেড়েই যাচ্ছেন তবে কেন আবার সাতদিন সময় দিচ্ছেন?

সুশীলবাবু জবাব দিলেন : সাতদিন সময় দিলাম এইজন্যই যে, যাতে কেউ না বলতে পারেন বাংলা কংগ্রেস খাঁড়া উঁচিয়ে বসে ছিল।

রিপোর্টাররা আবার জিজ্ঞেস করলেন : কোনও অবস্থাতেই কি আপনাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই?

সুশীলবাবু সাফ সাফ বললেন: যতদিন সি. পি. এম এই ফ্রণ্টে আছে ততদিন বাংলা কংগ্রেস ফ্রণ্টে যাবে না।

তারপর দিনই ফরওয়ার্ড ব্লকের একটা সিদ্ধান্ত খুব দ্রুততালে ঘটনা প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

সেদিন বিধানসভায় কৃষি খাতের ব্যয়বরাদ্দ আলোচনার কথা ছিল। কিন্তু সকালেই ফরওয়ার্ড ব্লক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই অবস্থায় ব্যয়বরাদ্দের আলোচনা নিরর্থক। কারণ, সরকারই তো থাকছে না। তাই, তাঁরা ঠিক করলেন যে, তাঁদের দলের মন্ত্রী কানাইলাল ভট্টাচার্য এইদিন বিধানসভায় কৃষি দফতরের ব্যয়বরাদ্দ পেশ করবেন না।

তার পর দিন অবস্থা আরও খারাপ হল। আগের দিন তবু প্রশ্নোত্তরটা হয়েছিল। এদিন মন্ত্রীরা প্রশ্নোত্তরের জবাব দিতেও রাজী হলেন না। সেদিন স্বাস্থ্য দফতরের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। আর. এস. পি-ও স্থির করলেন, এই অবস্থায় ননী ভট্টাচার্য ব্যয়বরাদ্দ মুভই করবেন না।

বাধ্য হয়ে স্পীকার বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখলেন।

এদিকে তখন তিনপক্ষ তিনদিকে এগোতে চাইছেন।

সি. পি. এম তাঁর সব পূর্বঘোষণা বাতিল করে বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টায় ব্যস্ত। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক তখনও রফার জন্য সচেষ্ট। তাঁদের আপস-সূত্র সি. পি. এম স্বরাষ্ট্র দফতর ছেড়ে দিক। আর, বাংলা কংগ্রেস ও রাজ্যপাল তখনও চেষ্টা করছেন, যদি কোনও ভাবে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি প্রভৃতিকে সি. পি. এম-বর্জিত নব-কংগ্রেস সমর্থিত সরকার গঠনে রাজী করানো যায়।

সি. পি. এমের আকস্মিক মতি পরিবর্তনটা সবাইকেই বিস্মিত করল। ফ্রণ্টের সংকটের সুরু থেকেই সি. পি. এম বলেছিলেন: এই ফ্রণ্টের একমাত্র বিকল্প— নির্বাচন। আমরা কোনও বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা করব না—আর কাউকে বিকল্প সরকার গড়তেও দেব না।[৮]

এটা ছিল দলের কেন্দ্রীয় কমিটিরই সিদ্ধান্ত। যেদিন অজয়বাবু পদত্যাগের এবং বাংলা কংগ্রেস ফ্রণ্ট ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, সেইদিন অর্থাৎ ৮ই মার্চ রাত্রে আমি জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম: এখন কি আপনারা নতুন সরকার গঠনের চেষ্টা করবেন? কারু সঙ্গে কি এব্যাপারে কোনও কথা বলেছেন?

জ্যোতিবাবু সোজাসুজি জবাব দিলেন : অজয়বাবুর পদত্যাগের পর সি. পি. এমের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এসব ব্যাপারে কারু সঙ্গে আমার কোনও কথাও হয়নি। আমরা চাই ছ'সপ্তাহ বা দু'মাসের মধ্যেই নির্বাচন।[৯]

সেদিন প্রমোদবাবু এবং হরেকৃষ্ণবাবু কিন্তু কলকাতা ছিলেন না। ছিলেন উত্তরবঙ্গে। পরদিন তাঁরা ফিরে এলেন। এবং তারপরই দলের মতটা পাল্টে গেল। সি. পি. এম ঘোষণা করলেন : যুক্তফ্রণ্ট তো আছেই। শুধু বাংলা কংগ্রেস চলে গিয়েছে। আর অজয়বাবু পদত্যাগ করছেন। তাতেও ফ্রণ্টের ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকছে। সুতরাং, নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করা হবেই।

---

[৮] ৯ই ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনে সুন্দরায়ার ঘোষণা : বর্তমান যুক্তফ্রণ্টের একমাত্র বিকল্প হল অন্তর্বর্তী নির্বাচন। এই ফ্রণ্ট যদি ভাঙে তাহলে আমরা আবার জনগণের রায় চাইব। আমরা কোনও ভাবেই কোনও বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করব না। বিকল্প সরকার কেউ করলেও আমরা তাকে অচল করে দেব।

[৯] আনন্দবাজার পত্রিকা ৯-৩-৭০।

অবশ্য পূর্বসিদ্ধান্তটা শুধু যে প্রমোদবাবু এবং হরেকৃষ্ণবাবু পাল্টে দিলেন তা নয়। পাল্টালেন পারটির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পলিটব্যুরো এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক যৌথ বৈঠক। ৯ই বিকালে আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে এই বৈঠক হল। বৈঠকের পর প্রমোদবাবু অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বললেন : ফ্রণ্টের বৃহত্তম দল হিসাবে সি. পি. এম-ই বিকল্প যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রস্তাব নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

তার ঘণ্টা খানেক পরেই ফ্রণ্টের ১২টি দলের কাছে প্রমোদবাবুর একখানা চিঠি পেঁাছে দেওয়া হল। সেই চিঠির মূল বক্তব্য : বাংলা কংগ্রেস ফ্রণ্ট ছেড়ে চলে গিয়েছে। আসুন আমরা ফ্রণ্ট সরকার অব্যাহত রাখার জন্য আলোচনায় বসি।

জ্যোতিবাবুও সেইদিনই সি. পি. এম নেতা হিসাবে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনিও গিয়ে রাজ্যপালকে একই কথা বললেন : অজয়বাবু চলে গেলেও যুক্তফ্রণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ। নতুন মন্ত্রিসভা হতে পারে।

রাজ্যপাল এই জন্যই ওত পেতে বসেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটা লুফে নিলেন। বললেন : বহুৎ আচ্ছা, আপনি মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করুন। আমি আপনাকে সব সুযোগ দেব।

রাজ্যপালের এই কথা শুনে সি. পি. এম আরও উৎসাহিত হলেন। বিভিন্ন দলের সঙ্গে সেইদিন রাত্র থেকেই আলোচনা সুরু হয়ে গেল। সি. পি. এমের বন্ধু পারটিগুলি অর্থাৎ আর. এস. পি, লোকসেবক সংঘ প্রভৃতি এতে বেশ উৎসাহই দেখালেন। বিভিন্ন দল থেকে এম. এল. এ সংগ্রহেরও নতুন চেষ্টা সুরু হল। প্রমোদবাবু সুকুমার রায়কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : বাংলা কংগ্রেসের ক'জন এম. এল. এ আনতে পারবেন ? সুকুমারবাবু একটা রঙিন গ্যাস ব্যালুন উড়িয়ে দিলেন তাঁর চোখের সামনে : মন্ত্রিসভা হলে জনা পঁচিশেক। জ্যোতিবাবু কথা বললেন প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগের এক এম. এল. এ-র সঙ্গে। যতীন চক্রবর্তী, স্নেহাংশু আচার্যও নেমে পড়লেন আসরে।

প্রমোদবাবু আরও একটা অভাবনীয় ষ্টেপ নিলেন সেই দিনই। তিনি নিজে টেলিফোন করে সি. পি. আই-র সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেন। এমনকি, সেজন্য সি. পি. আই অফিসে যেতেও রাজী হলেন।

এই সময় ডাঙ্গের নামে আসা একটা টেলিগ্রামও সি. পি. এম নেতাদের বেশ আশান্বিত করে তুলল। ডাঙ্গের নির্দেশ হিসাবে টেলিগ্রামটা আসে রাজ্যের সি. পি. আই নেতাদের কাছে। পারটির চেয়ারম্যানের নির্দেশ : সি. পি. এমের সঙ্গে মিটমাট করে যুক্তফ্রণ্ট চালাও। এই নির্দেশ সি. পি. আই অফিসে পেঁাছবার আগেই টেলিগ্রাম অফিসের সি. পি. এম-সমর্থকদের মারফৎ প্রমোদবাবু খবরটা পেয়ে গেলেন।

কিন্তু পরদিনই অর্থাৎ ১০ই মার্চই প্রত্যক্ষভাবে সি. পি. আই ও এস. ইউ. সি এবং পরোক্ষে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে কথা বলে সি. পি. এম নেতাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ওপথে সুফল পাওয়া অসম্ভব। তাঁরা তিন পারটিই বললেন : হয় বাংলা কংগ্রেস সহ ফ্রণ্ট, না হয় নির্বাচন। অজয়বাবুকে বাদ দিয়ে আমরা সরকার চালাতে রাজী নই।

সি. পি. আই একটু ঘুরিয়ে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সরাসরি সি. পি. এমের কাছে

পাল্টা প্রস্তাব দিলেন : আপনারা হোম ছেড়ে দিন; আমরা অজয়বাবুকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ জানাবো। একই প্রস্তাব সি. পি. আই-র চেয়ে বেশী ঘুরিয়ে জ্যোতিবাবুর কাছে জানালেন কৃষ্ণ মেনন। ফ্রণ্টের সংকট মোচনের চেষ্টায় তিনিও তখন কলকাতায়।

কিন্তু সি. পি. এম এ প্রস্তাব একেবারে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

তা সত্ত্বেও সেইদিনই ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর. এস. পি যৌথভাবে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানালেন : আপনি আমাদের ১৩ই মার্চ পর্যন্ত সময় দিন, তার আগে পদত্যাগ করবেন না। রাজ্যপালও প্রায় খোলাখুলিই মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানালেন : দয়া করে ১৬ই মার্চের আগে পদত্যাগ করবেন না, সবাইকে সব দিক ভাবতে সময় দিন।

অজয়বাবুর তাতে কোনওই আপত্তি ছিল না। বরং, তিনি তাই চাইছিলেন। সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

এরপর আসরে নামলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ১১ই তিনি অজয়বাবু এবং সুশীল ধাড়াকে দিল্লি থেকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে গেলেন সিদ্ধার্থ রায়ও। সেইদিনই ইন্দিরা গান্ধী টেলিফোনে জ্যোতিবাবুর সঙ্গেও কথা বললেন।

পরদিন অজয়বাবু এবং সুশীলবাবু দিল্লি গিয়ে পেঁছলেন।

সব শুনে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বললেন : মার্চ মাসটা কাটিয়ে বাজেটটা পাশ করে নিলে ভাল হত না?

বাংলা কংগ্রেসের দুই নেতাই জবাব দিলেন : আমরা তাতে অরাজী নই। কিন্তু তারপর আর সি. পি. এমের সঙ্গে চলা অসম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী এবং সিদ্ধার্থবাবু তারপর সি. পি. এম সহ বিভিন্ন দলের মন্ত্রীদের সঙ্গে কলকাতায় টেলিফোনে কথা বললেন। সবাইকে দিল্লি যেতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কেউই সে প্রস্তাবে রাজী হলেন না। জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রীকে পাল্টা আহ্বান জানালেন, কলকাতা এসে মিটমাটের চেষ্টা করতে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বললেন, লোকসভায় বাজেট চলছে, সুতরাং তাঁর পক্ষে তা সম্ভব নয়।

অজয়বাবুরা ১২ই মার্চই কলকাতা ফিরে এলেন। প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় কোনও সুফল পাওয়া গেল না।

এদিকে তখন বিভিন্ন সূত্রে[১০] রাজ্যপালের 'মনোভাব' জেনে সি. পি. এম নেতাদের মনে আশা জেগেছে যে, সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষায় রাজী হলে হয়ত আগে ১৪১ জন এম. এল. এ-র সমর্থন দেখতে না চেয়েই ধাওয়ান সাহেব

[১০] বিশেষত স্নেহাংশু আচার্য মারফৎ। স্নেহাংশুবাবু গোড়া থেকেই ধাওয়ান সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় তিনি প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলতেন।

জ্যোতিবাবুকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেবেন। ধাওয়ান নিজে ইচ্ছে করেই এবং দিল্লি ও অজয়বাবুর সম্মতিক্রমেই সেই রকম একটা ধারণা দিলেন।

১১ই মার্চই প্রমোদবাবু ঘোষণা করলেন: রাজ্যপাল ডাকলেই জ্যোতিবাবু সরকার গঠনে রাজী হবেন। আমরা রাজ্যপালের কাছে কোনও তালিকা দাখিলে অরাজী। আমরা বলব, দু-চার দিনের মধ্যেই বিধানসভায় বাজেট ভোটাভুটি হবে। তাতেই বোঝা যাবে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিনা।

রটে গেল, জ্যোতিবাবু যুক্তফ্রন্ট দেখিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন দাবি করবেন। রাজ্যপালকে বলবেন যে, বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে যেতেও ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং ফ্রন্টের উপনেতা হিসাবে তিনিই মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান। এমনও রটল যে রাজ্যপাল তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বানও জানাতে পারেন।

বলতে গেলে একেবারে হাতে হাতেই এর ফল পাওয়া গেল। ১৩ই মার্চই এস. ইউ. সি অফিসে বসে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি, বিদ্রোহী পি. এস. পি, এস. এস. পি, বলশেভিক পারটি, গোর্খা লীগ এবং অনাদি দাসপন্থী আর সি. পি. আই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁরা জ্যোতিবাবুর সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় বাধা দেবেন—সি. পি. এমকে কিছুতেই মন্ত্রিসভা করতে দেবেন না। তাঁদের এই সিদ্ধান্তটা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হল।

অজয়বাবু পদত্যাগ দাখিলের আগে রাজ্যপাল এবং দিল্লি ফ্রন্টের অন্যান্য সি. পি. এম-বিরোধী দলের কাছ থেকে এই রকম একটা প্রকাশ্য ঘোষণাই চাই-ছিলেন। কারণ, এ ব্যাপারে তাঁদের নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল যে, অজয়বাবু ইস্তাফা দিলে ওঁরা আর কিছুতেই সি. পি. এমের সঙ্গে সরকার গঠনে রাজী হবেন না।

আট পারটির এই ঘোষণা প্রকাশের পর দিল্লি এবং রাজ্যপাল বেশ কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন।

কিন্তু তারপরও ওদের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য ১৩ই দিল্লিতে সুকৌশলে রটিয়ে দেওয়া হল যে অজয়বাবু পদত্যাগ করলে রাজ্যপাল সরকার গঠনের জন্য জ্যোতিবাবুকে ডাকবেন। বলা হল যে, রাজ্যপাল কেন্দ্রের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতেও তিনি সেই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করেছেন। জানান হল যে সেই রিপোর্টে তিনি বলেছেন, "সংবিধানের দিক দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে আমি বাধ্য। তাই বর্তমান সরকারের অবসান ঘটা-মাত্র রাষ্ট্রপতির শাসনের সুপারিশ করতে পারি না। বিধানসভায় সি. পি. এম একক বৃহত্তম দল। সুতরাং প্রথমেই আমি জ্যোতিবাবুকে আহ্বান জানাবো।"

এই খবরটা সংবাদপত্রেও বের হল।

তাই দেখে আবার আট পারটি বেশ কিছু বিচলিত হয়ে উঠলেন।

এদিকে তখন অজয়বাবুও তাঁদের শোনাচ্ছেন যে, রাজ্যপালের মতিগতি ভাল নয়, তিনি যেন জ্যোতিবাবুকে সরকার গড়তে দিতে ইচ্ছুক!

সেইদিন সন্ধ্যায়ই জ্যোতিবাবু আবার রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বললেন। রাজ্যপালের কথাবার্তায় সেদিন তিনি আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

১৫ই মার্চই কিন্তু অজয়বাবু এবং বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে সকলের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল। সেইদিন মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে রাজ্যপাল বাংলা কংগ্রেসের তিনমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন। এবার আর কারু মনেই কোনও সন্দেহ রইল না। সবাই বুঝলেন, পরদিন অজয়বাবু পদত্যাগ করবেনই। আর তিনি পিছোবেন না।

সেইদিন রাত্রে সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি এবং বিদ্রোহী পি. এস. পি আবার গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধরলেন। যাকে বলে শেষ অনুরোধ। ওঁরা বললেন: আপনি কিছুতেই এখনই পদত্যাগ করবেন না। সি. পি. এম-ও নামছে। ওরা স্বরাষ্ট্র দফতরের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করার জন্য বিধিবদ্ধ ক্ষমতা সমন্বিত একটি উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাবে রাজী। এই কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রীও থাকবেন।

সেইদিন দুপুরেই ফরওয়ার্ড ব্লকের দুই মন্ত্রী কানাই ভট্টাচার্য এবং শম্ভু ঘোষ জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করেছিলেন।

কিন্তু শেষ চেষ্টায়ও কোনও কাজই হল না। অজয়বাবু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।

পরদিন ১৬ই—অজয়বাবুর পদত্যাগ করার নির্দিষ্ট দিন।

সেদিনও সকাল থেকে নানা ভাবে নানা চেষ্টা হল। দুপুরে ভক্তি মণ্ডল জ্যোতিবাবুর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। জ্যোতিবাবু বললেন: আমি অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন না। জ্যোতি-বাবুরাও তখন এম. এল. এ যোগাড়ে তেমন সুবিধা করতে পারছেন না।

সেই প্রস্তাব নিয়ে ভক্তিবাবু ছুটলেন বেলভেডিয়ারে অজয়বাবুর ফ্লাটে। কিন্তু গিয়ে দেখেন অজয়বাবু তাঁর পদত্যাগপত্র সই করছেন। ভক্তিবাবুকে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতেই জানালেন: না, ওসবের আর কোনও প্রশ্নই নেই। এই দেখুন আমি পদত্যাগপত্র সই করে লাটের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে ঢুকলেন। হাতে তাঁর পদত্যাগ পত্র। সেই চিঠি রাজ্যপালের কাছে জমা দিয়ে এসে অজয়বাবু অপেক্ষমান রিপোর্টারদের বললেন: আমি রিজাইন করে এলাম। বিকল্প ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন।

তখন সি. পি. আই অফিসে আট পারটির বৈঠক চলছিল। সেখান থেকেই তাঁরা চিঠি দিলেন রাজ্যপালের কাছে: জ্যোতিবাবু যে সরকার গঠনের চেষ্টা করছেন আমরা তার সঙ্গে নেই—আমরা এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি না।

প্রায় একই চিঠি গেল নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও।

সবই জ্যোতিবাবুর সরকার গঠন প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার জন্য পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

১৭ই মার্চ সি. পি. এমের ডাকে হরতাল হল। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

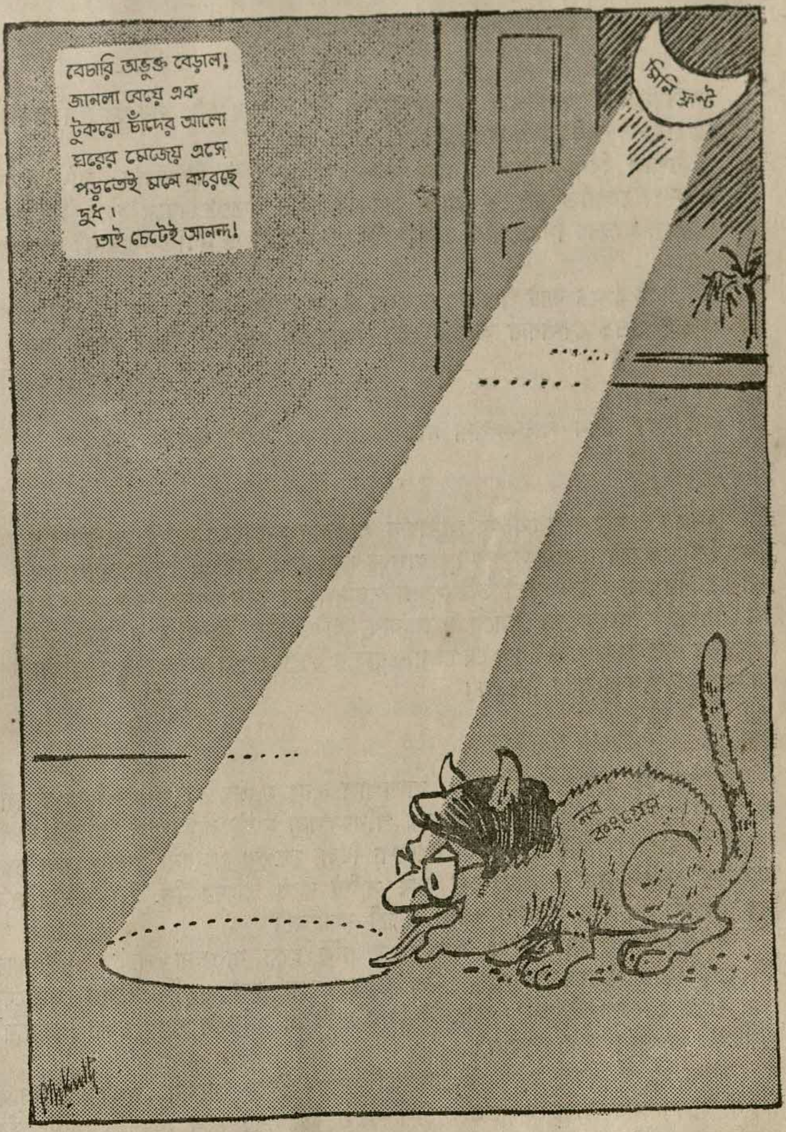
বেচারি অভুক্ত বেড়াল!
জানলা বেয়ে এক
টুকরো চাঁদের আলো
ঘরের মেজেয় এসে
পড়তেই মনে করেছে
দুধ।
তাই চেটেই আনন্দ!
মিনি ফ্রন্ট
নব কংগ্রেস

হরতাল। সেই হরতালে খুনই হলেন অন্তত ২৪ জন। ভয়াবহ সব খুন। বর্ধমানে সাঁইবাড়ির নৃশংসতম হত্যাকান্ডও সেদিনই হল। সি. পি. এম সবাইকে বোঝাতে চাইলেন, তাঁরা কতটা করতে পারেন।

সেইদিন রাজ্যপাল এবং অজয়বাবু সি. পি. এম-বর্জিত নব-কংগ্রেস সমর্থিত সরকার গঠনের শেষ চেষ্টা করলেন।

রাজ্যপাল বিধানসভার বিভিন্ন দলের কাছে চিঠি লিখলেন: যদি বৃহত্তম দলের নেতা জ্যোতি বসুকে আগে সরকার গঠন করতে দিয়ে পরে বিধাসভায় আস্থা জ্ঞাপক ভোট নিতে বলি তাহলে কি বে-আইনী ও নীতি-বিরোধী কাজ করা হবে?

এই চিঠি পেয়ে আট পারটির নেতারা চমকে গেলেন—ব্যাপারটা কী? রাজ্যপাল কি সত্যিই ১৪১ দেখাবার আগেই জ্যোতিবাবুকে সরকার করতে দিতে চান?

অন্যদিকে তখন পরিকল্পনা মত অজয়বাবুও এগোচ্ছেন।

এখানে একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন, ধাওয়ান সাহেবের সংগে অজয়বাবুর বেশ কিছুদিন থেকেই একটা সুন্দর বোঝাপড়া চলছিল। কার্যতঃ তিনি রাজ্যপাল হয়ে আসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সংগে পরামর্শ না করে কোনও বড় কাজ করতেন না। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে অজয়বাবু ধাওয়ানের সংগে কথা বলে নিতেন। দুজনের এত বোঝাপড়া ছিল যে জ্যোতিবাবুর কাছে লেখা অজয়বাবুর চিঠিগুলিও রাজ্যপালই খসড়া করে দিতেন।

যুক্তফ্রন্টের চূড়ান্ত মুহূর্তেও রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই এগোচ্ছিলেন। দুজনের পরিকল্পনা মতই রাজ্যপাল বিভিন্ন দলের কাছে সর্বশেষ চিঠিটি লিখলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ফ্রন্টের অন্যান্য দলের মধ্যে চরম মুহূর্তে একটা দারুণ আতংকের ভাব সৃষ্টি করে তাঁদের সি. পি. এম-বর্জিত নব কংগ্রেস-সমর্থিত সরকার গঠনে রাজী করানো।

ধাওয়ান সাহেবের চিঠির কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরই ১৮ই মার্চ বিকালে হঠাৎ অজয়বাবু সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের নেতাদের তাঁর ফ্লাটে ডেকে পাঠালেন। পারটিগুলির অফিসে অফিসে খবর গেল: জরুরী প্রয়োজন, এখুনি চলে আসুন।

সংগে সংগে সবাই ছুটলেন বেলভেডিয়ারে। গিয়ে দেখেন সেখানে সিদ্ধার্থ রায়ও বসে। অজয়বাবু অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে বললেন: মনে হচ্ছে আগাম শক্তি যাচাই না করেই রাজ্যপাল জ্যোতিবাবুকে সরকার করতে দেবেন। এটা যে অন্যায়, ওরা যে একবার সরকার করতে পারলে মারের ভয় দেখিয়েই বিধানসভায় সংখ্যা-

গরিষ্ঠতা প্রমাণ করবে রাজ্যপাল তা বুঝতেই চাইছেন না।...

সিদ্ধার্থবাবু তখন মাঝপথে সুরু করলেন: এই সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার একটা মাত্র পথ আছে। যদি এখুনি ১৪০ জনার বেশী এম. এল. এ বা তাঁদের দলের নেতারা সই করে বলেন যে তাঁরা অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে সরকার করতে চান তাহলে আর রাজ্যপাল কিছুতেই জ্যোতিবাবুকে মন্ত্রিসভা গঠনে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না।

তিনি আরও বললেন: আমরা লিখে দিতে রাজী যে বিনাশর্তে আমাদের দল অজয় মুখার্জীর সরকারকে সমর্থন জানাবে। এখন আপনারা রাজী হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

অজয়বাবুও বললেন : হ্যাঁ, তা হতে পারে বৈকি।

কিন্তু তবু কাজ হল না। সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না।

শেষ পরিকল্পনাটাও এইভাবেই ভেস্তে গেল।

তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুব দ্রুততালে ঘটনাপ্রবাহ রাষ্ট্রপতির শাসনের দিকে এগিয়ে গেল।

আট দল এবং বিভিন্ন কংগ্রেস আলাদা আলাদাভাবে রাজ্যপালকে জানালেন যে যেখানে সভার অধিকাংশ সদস্য জ্যোতিবাবুকে সরকার করতে দেওয়ার বিরোধী সেখানে তাঁকে সরকার করতে দিলে রাজ্যপাল সংবিধান বিরোধী কাজ করবেন।

সেইদিন অর্থাৎ বুধবার বিকালেই রাজ্যপাল জ্যোতিবাবুকে বললেন: রাজ্য বিধানসভার ২৮০জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ১৬৫জনই আপনাকে সরকার করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে। তাঁরা লিখিতভাবে বক্তব্য জানিয়েছেন। এই অবস্থায় আমি আপনাকে সরকার করতে দেই কি করে?

জ্যোতিবাবু জবাব দিলেন: ১৬৫জন সদস্যই তো আপনাকে একথা লিখে জানাননি। একথা বলেছেন দলের নেতারা। তাঁদের সঙ্গে সব দলীয় এম. এল. এ একমত নন। আমি বিধানসভায় এর প্রমাণ দেব। সুতরাং সরকার হোক। তারপর সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে।

রাজ্যপাল তবু বললেন : না, তা হয় না। আপনি ১৪১ জন এম. এল. এ-র সমর্থন লিখিত ভাবে এনে দেখান, না হলে আপনাকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

জ্যোতিবাবুকে কিন্তু এতদিন রাজ্যপাল একথা বলেননি। গোড়ায়ই যদি তিনি বলতেন যে লিখিতভাবে আগাম ১৪১জন এম. এল. এ-র সমর্থন না দেখাতে পারলে কাউকে কিছুতেই মন্ত্রিসভা করতে দেবেন না, তাহলে হয়ত ঘটনাপ্রবাহ বেশ কিছুটা ভিন্নভাবে এগোতো। কিন্তু রাজ্যপাল উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঠিক উল্টোটা করে গেলেন।

জ্যোতিবাবু বুঝলেন, এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু তিনি শুক্রবার পর্যন্ত সময় চাইলেন। বললেন, সেদিন দেখা করে তাঁর বক্তব্য জানাবেন।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর তিনি শুক্রবার পর্যন্ত চেষ্টা করতে এগোলেন না।

পারটির অন্যান্য নেতার সঙ্গে আলোচনা সেরে বৃহস্পতিবার সকালেই টেলিফোনে রাজ্যপালকে জানিয়ে দিলেন: দেখা করতে যাচ্ছি না; কারণ, দেখা করে লাভ নেই। আমরা আগাম সমর্থকদের নামের তালিকা দিতে রাজী নই।

জ্যোতিবাবুর এই জবাব পাওয়ার পর রাজ্যপাল আইন রক্ষার জন্য অজয়বাবু, সিদ্ধার্থবাবু, সোমনাথবাবু এবং হেমন্তবাবুকে একে একে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কেউ মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান কিনা।

সবাই উত্তর দিলেন, না।

পশ্চিমবঙ্গে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন নেমে এল। সেদিন ১৯শে মার্চ, ১৯৭০।

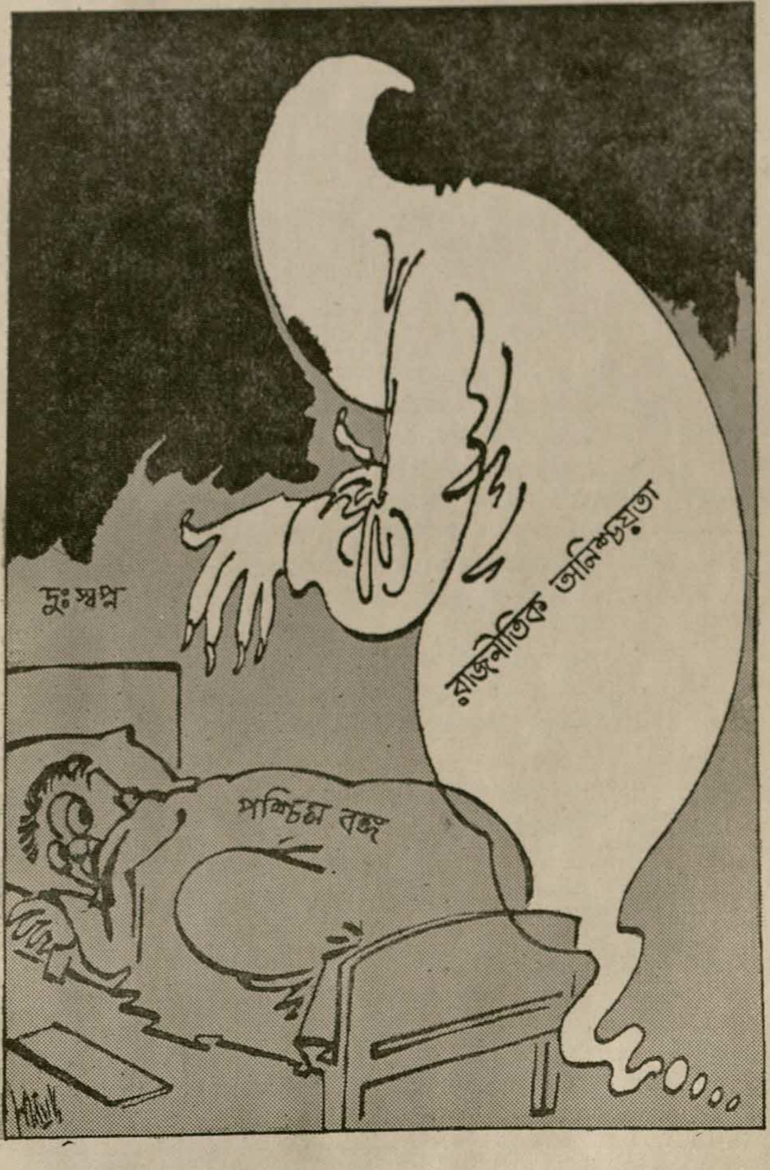
দুঃস্বপ্ন
রাজনীতিক অনিশ্চয়তা
পশ্চিম বঙ্গ

১৮ দফা কর্মসূচী — ১৯৬৭

(যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রায় সংগে সংগেই তাড়াহুড়া করে নেতারা একটা কর্মসূচী তৈরী করেন। ১লা মার্চ কলকাতা ময়দানের জনসভায় এই কর্মসূচী ঘোষিত হয়। কর্মসূচীতে ১৮টি প্রতিশ্রুতি ছিল।)

পশ্চিমবংগের জনসাধারণ কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে জনসাধারণের আস্থাভাজন কর্মদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ মন্ত্রীদের অধীনে একটি সৎ, দুর্নীতিমুক্ত ও সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছেন। এই আদেশ পালনের জন্যই যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে এবং দীর্ঘকালব্যাপী কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যাবলী, রাজ্যের সম্পদের অপব্যবহারজনিত সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সম্পূর্ণ সচেতন। সংবিধান ইত্যাদির দ্বারা সীমিত ও রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের অনুদার ব্যবহারের দ্বারা আবদ্ধ অবস্থার মধ্যে যে রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হবে সে-বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সজাগ। তথাপি যুক্তফ্রন্টের প্রতি জনগণের আস্থা থেকেই তাঁরা এই দায়িত্ব বহনে সাহসী হয়েছেন এবং কংগ্রেসী রাজত্বে জনগণ যে দুর্দশার মধ্যে পড়েছিলেন তা দূর করার জন্য তাঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুক্তফ্রন্টের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়ে অগ্রগতির পথে সমস্ত বাধা তাঁরা অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন।

(১) যুক্তফ্রন্ট সরকার খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত জনগণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করবে এবং শাসনব্যবস্থায় কর্মদক্ষতা, ব্যয়-সংকোচ ও পক্ষপাতিত্বহীনতার নিশ্চয়তা দেবে।

(২) যুক্তফ্রন্ট সরকার, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, কালোবাজারী, কালোটাকা সঞ্চয়, খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল এবং কংগ্রেসী রাজত্বের সমস্ত প্রকার সমাজবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে যাবে এবং স্বাধীনতা ও প্রগতির শক্তিকে মুক্ত করবে।

(৩) যথেষ্ট সরবরাহের অভাবে ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যের উচ্চ-মূল্যের দরুন গভীর দুর্দশা দূর করার জন্য এই সরকার সীমিত বা শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করবে না। উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই কথা মনে রেখে সরকার প্রগতিশীল ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, উপযুক্ত সেচ ও জল নিষ্কাশন, সার, উন্নত বীজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত গবাদি পশু ও কৃষি ঋণ সরবরাহ করার মাধ্যমে কৃষকদের প্রাপ্য উৎসাহদানের ব্যবস্থা করবে এবং ফসলের যুক্তিসঙ্গত দামের ব্যবস্থা করবে। দরিদ্র কৃষক, ভাগচাষী, ক্ষেত-মজুর এবং দুর্দশাগ্রস্ত সকল শ্রেণীর কৃষকেরা যে-সব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন সেই সব দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

(৪) কংগ্রেসী সরকারের কর্মনীতির ফলে বর্তমানে যে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে, জরুরী ভিত্তিতে তার সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ন্যায্য ও সমান সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী বণ্টন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত, কার্যকর এবং দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে। ধান ও চালের পাইকারী বাণিজ্যের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে এবং সংগ্রহ ও বণ্টনের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত লভ্যাংশ রাখা হবে এবং অপব্যয় ও দুর্নীতিকে নির্মূল করা হবে।

(৫) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে মানব-শক্তি, বিশেষ করে যুবশক্তি-সম্পদকে ব্যবহার করার বিষয়ে এবং বেকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ জোর দেওয়া হবে, যার ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই পরি-প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প, বিশেষ করে জনগণের সেবায় নিয়োজিত কুটির, ক্ষুদ্র ও মধ্যম শিল্প তথা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা হবে ও উন্নত করা হবে।

(৬) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ও মান উন্নত করার জন্য, শিক্ষা-পরিচালন-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য, শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে জটিল পরি-স্থিতিকে দূর করার জন্য, শিক্ষায় একটি সুসংহত পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য এবং উন্নত ভবিষ্যৎ বংশধর গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাহিত্য, খেলাধূলা, শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য সরকার সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিক্ষক ও শিক্ষাবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতিও যথাযথ নজর দেওয়া হবে। ছাত্রসমস্যার বিষয়েও যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে।

(৭) পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুগণের বিষয়েও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে এবং তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ণ ভারতীয় নাগরিক রূপে ন্যায়সঙ্গত স্থান গ্রহণে তাঁদের সক্ষম করে তোলার জন্য যুক্তফ্রণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। জবরদখল কলোনিগুলিকে আইনসঙ্গত করা হবে ও কৃষিজীবীদের বিশেষ সাহায্য দেওয়া হবে।

(৮) যাঁদের ওপর প্রধানত উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সেই শ্রমিকশ্রেণীর দাবিকে যথোপযুক্ত সমর্থন জানান হবে এবং কারখানা ও কর্মস্থলে কাজের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করা হবে। শিল্প ও কৃষিতে নিযুক্ত সমস্ত শ্রেণীর শ্রমিকদের ন্যূনতম বা জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরি দানের বিষয়েও যথেষ্ট নজর দেওয়া হবে।

(৯) যুক্তফ্রণ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসরণ করে চলবার, তাঁদের সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার অধিকারকে স্বীকার করে এবং

অবিশ্বাস, অক্ষমতা ও সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধার বিরুদ্ধে সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের রক্ষা করবে। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও উত্তেজনা, বা জাতীয় সংহতি বিপন্ন হতে পারে এমন কোন প্রাদেশিকতা, জাতিবিদ্বেষ ও ভাষা-ভিত্তিক মতান্ধতা সৃষ্ট হতে পারে এমন কোনো প্রচার বা কাজ সরকার সহ্য করবে না।

(১০) তফশীল জাতি, উপজাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার বিশেষ নজর দেবে।

(১১) নারীজাতির বিশেষ বিশেষ সমস্যাবলী সরকার কর্তৃক উপযুক্তভাবে বিবেচিত হবে।

(১২) পূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সমস্যার সংগে সংগে অনগ্রসর অংশ, যেমন পুরুলিয়া, সুন্দরবন ও উত্তরবংগের অংশবিশেষের সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে। ফরাক্কা ও হলদিয়া পরিকল্পনার কাজ যাতে দ্রুত এবং সঠিকভাবে কার্যকর হয় সে-বিষয়ে সরকার জোর দেবে।

(১৩) পশ্চিমবংগে বাঙলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে এবং নেপালী ভাষাকে দার্জিলিং অঞ্চলের ভাষা হিসাবে চালু করার ব্যবস্থা দ্রুততর করা হবে।

(১৪) যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক এবং সর্বশ্রেণীর কর্মচারীদের নিজেদের ন্যায্য দাবি ও অভাব-অভিযোগ পেশ করার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য আন্দোলন দমন করবে না। জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে সংগতি রেখে যুক্তফ্রন্ট শাসনকার্য-পরিচালন ব্যবস্থা ও পুলিসবাহিনীর পুনর্বিন্যাস করবে। যুক্তফ্রন্ট মৌল ব্যক্তিস্বাধীনতা মেনে চলবে, রক্ষা করবে এবং যে 'জরুরী অবস্থা' বলবৎ রাখার দরুন ভারতরক্ষা আইন এবং বিধানগুলি প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই 'জরুরী অবস্থা' উঠিয়ে নেবার জন্য ভারত সরকারকে বিশেষ-ভাবে বলবে। নিবর্তনমূলক আটক আইনসহ সমস্ত অগণতান্ত্রিক এবং দমনমূলক আইন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হবে।

(১৫) রাজ্য সরকারের উপর যে গুরুতর সীমাবদ্ধতা চাপানো আছে এবং কেন্দ্রের উপর এর যে কী অনিশ্চিত নির্ভরতা, সে-সম্পর্কে সরকার অবহিত আছে। যুক্তফ্রন্ট রাজ্য সরকারের জন্য আরো বেশি ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবংগের ন্যায্য অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় আয়ের আরো বেশি বরাদ্দের জন্য চাপ দেবে।

(১৬) ভারত সরকারের কাছে বেরুবাড়ির প্রশ্ন বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হবে।

(১৭) সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং তাকে শক্তিশালী করার জন্য সব কিছুই করবে।

(১৮) সরকার উপরোক্ত নীতিগুলি কার্যকর করার জন্য শুধু শাসনতন্ত্রের উপর নির্ভর করবে না, পরন্তু সর্বক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন স্তরে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সাহচর্য প্রার্থনা করবে। স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাসমূহ এবং পঞ্চায়েতগুলির গণতন্ত্রীকরণ করা হবে এবং তাকে জীবন্ত করে তোলা হবে।

পরিশিষ্ট—২

৩২ দফা কর্মসূচী — ১৯৬৯

(১৯৬৯ সনের নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্ট যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করেন তাতে ছিল ৩২টি দফা। সেইজন্য চলতি কথায় এই নির্বাচনী ইস্তাহারকে বলা হয় ৩২ দফা কর্মসূচী।

এই ইস্তাহার রচনার জন্য যুক্তফ্রন্ট একটি ছোট্ট কমিটি তৈরী করেছিলেন। সেই কমিটিতে ছিলেন প্রণব মুখার্জী, নির্মল বসু এবং জ্যোতি ভট্টাচার্য। তাঁরা যে খসড়া কর্মসূচী রচনা করেন সামান্য রদবদলের পর ফ্রণ্টে তা অনুমোদিত হয়।)

প্রশাসন

১। যুক্তফ্রণ্ট সরকার পরিচ্ছন্ন এবং সৎ প্রশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে চায়। প্রশাসন ক্ষেত্রে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং বৈষম্যহীনতার সুনিশ্চিতকরণ হবে যুক্ত-ফ্রণ্টের লক্ষ্য। সরকারী সিদ্ধান্তগুলির দ্রুত রূপায়ণ এবং জনসাধারণের অভিযোগ-গুলির প্রতিবিধানের দিকে লক্ষ রেখে প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পাবার জন্য একটি রাজ্য প্রশাসন সংস্কার কমিটি বসানো হবে।

আই-সি-এস, আই-এ-এস প্রভৃতি সার্ভিসের ব্যক্তিদের উপর রাজ্য সরকারের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ-বিষয়ের চলতি নিয়মাবলী পরি-বর্তনের জন্য চেষ্টা করা হবে। চলতি পুলিস কোড বদলের জন্যও প্রয়াস করা হবে, যাতে জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থের বিরুদ্ধে পুলিস প্রয়োগ না করা যায়। জেল কোডেরও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল

২। সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্ট সরকার দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণের বিরুদ্ধে লড়বে।

বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসন এবং পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশনের কালে মন্ত্রী, বড় আমলা এবং রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, দালালি প্রভৃতি যাবতীয় অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে।

যুক্তফ্রণ্টের শাসনকালে কোন মন্ত্রী কিংবা বড় আমলা কিংবা নেতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থাপিত হলে তার তদন্ত করা হবে।

এ বিষয়ে যে-কোন ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ অবশ্যই বিবেচিত হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

খাদ্য উৎপাদন, কৃষি এবং সেচ

৩। (ক) যুক্তফ্রণ্ট সরকার খাদ্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য সবরকমের উপায় গ্রহণ করবে এবং রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করার জন্য সচেষ্ট হবে—এবং এজন্য সার, বীজ, কীটনাশক এবং উন্নত গো-মহিষাদি সরবরাহের মারফত কৃষকদের সর্ববিধ সাহায্য দেবে। কৃষিঋণ বাড়াবার জন্য যুক্তফ্রণ্ট সচেষ্ট হবে এবং ব্যাঙ্ক ও সাধারণ বীমা জাতীয়করণের জন্য কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। যুক্তফ্রণ্টের প্রয়াস হবে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দর দেওয়া এবং বাজারে মাল বিক্রীতে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া। পাটচাষীদের লাভজনক দামের ভিত্তিতে রাষ্ট্রাধীন পাটের মজুদ সৃষ্টি করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। যাবতীয় কৃষিযোগ্য অহল্যা জমি উদ্ধার করা হবে এবং কৃষিযোগ্য জমি অ-কৃষির উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দখলের কোন অনুমতি দেওয়া হবে না। ভূমির অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য এবং জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের জন্য চেষ্টা চালানো হবে।

(খ) অধিক জমিতে সেচের জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার যাবতীয় সম্ভাব্য উপায় গ্রহণ করবে এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং জলউত্তোলনকারী নানা পদ্ধতিতে সেচের বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। বুজে যাওয়া পুকুর ও জলাশয়গুলিকে কেটে কাজে লাগানো হবে। বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং জলনিকাশীরও কার্যকর ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হবে।

(গ) বন সংরক্ষণের জন্য যুক্তফ্রণ্ট উপযুক্ত নজর দেবে। বনাঞ্চলের সংলগ্ন অধিবাসী যাঁরা জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল, তাঁদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের প্রতিও নজর রাখা হবে।

(ঘ) যুক্তফ্রণ্ট সরকার হাঁস মুরগী ও পশু বৃদ্ধির চাষও বাড়াবে।

বৃহত্তর কলকাতার দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনার পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করা হবে এবং রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খাদ্যনীতি

৪। (ক) যুক্তফ্রণ্ট সরকার ধান ও চালের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রাধীন করবে এবং যাবতীয় খাদ্য-ব্যবসার উপরই প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবে।

এমন নীতি গ্রহণ করা হবে যাতে বৃহৎ জমির মালিক ও মজুদদাররা মজুদ করতে না পারে, যাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য ক্রয় সম্ভব হয় এবং তার ন্যায্য বিলিবন্টন করা হয়। খাদ্যনীতির স্তম্ভ হবে, (ক) বৃহৎ জমির মালিকদের উদ্বৃত্ত খাদ্য কেনা; সেচ-অঞ্চলের ৭ একর এবং অ-সেচ অঞ্চলের ১০ একরের বাড়তি জমির উৎপাদনের উপর লেভি বসানো, (দার্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলের জমির উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম হবার এবং চাষের খরচ অতিরিক্ত হবার দরুন এই অঞ্চলগুলিকে লেভির আওতা থেকে বাদ দেওয়া হবে); (খ) খোলা বাজার

থেকে চালকল-মালিকদের ধান কেনা নিষিদ্ধকরণ, মিলগুলি শুধু সরকার সংগৃহীত ধান নিয়েই কাজ করতে পারবে; (গ) হাস্কিং ও চিড়ার মিলগুলির নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) খাদ্য সংগ্রহের অঞ্চলের মধ্যেই সেই খাদ্যের অংশ মজুদ রাখা। (বাড়তি খাদ্যাঞ্চলে কমপক্ষে ৩০ ভাগ রাখা এবং ঘাটতি অঞ্চলের সংগৃহীত খাদ্য পুরাপুরি ঘাটতি অঞ্চলে গোড়া থেকেই রাখা); (ঙ) সংশোধিত রেশনিং চালু করা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে মডিফায়েড রেশনের সম্প্রসারণ; (চ) অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও ন্যায়সঙ্গত দরে সরবরাহ করা।

জন-নিরাপত্তা এবং জেল ও জরিমানার আইনের মাধ্যমে মুনাফাখোরি, মজুদদারি এবং কালোবাজারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। এসব ক্ষেত্রে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা যুক্তফ্রন্ট দাবি করবে।

রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি মেটাবার জন্য যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

(খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দর নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা নেবে এবং কৃষি ও শিল্পের যাবতীয় পণ্যের দর স্থির করার জন্য একটি বিধিবদ্ধ দর নির্ধারণ কমিশন গঠন করবে।

(গ) খয়রাতি ও টেস্টরিলিফসহ গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত রিলিফের ব্যবস্থা করবে। দুর্ভিক্ষ ত্রাণ এবং অন্যান্য ত্রাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থায় কেন্দ্র যাতে তার দায়িত্বের অংশ নিতে বাধ্য হয় সেজন্য চলতি আইনের উপযুক্ত সংশোধনও করার চেষ্টা যুক্তফ্রন্ট সরকার করবে।

ভূমি-সংস্কার

৫। যুক্তফ্রন্ট সরকার নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে আমূল ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ নেবে: (ক) চলতি জমিদারি দখল আইন কৃষকদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে উপযুক্তভাবে সংশোধন করা; (খ) তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া; (গ) জমির উচ্চসীমা সংক্রান্ত আইনের ঊর্ধ্বে দখলি 'বেনামী' জমির খোঁজ করা, উদ্ধার করা ও বিলি করার ব্যবস্থা; (ঘ) চা-বাগানের অব্যবহৃত জমি দখল; মাছ চাষের পুকুর, ফলের বাগান, ডেয়ারি ও পোলট্রি প্রভৃতি বর্তমানে যা জমিদারি দখল আইনের আওতার বাইরে আছে, সেসব ক্ষেত্রেও উচ্চসীমা আইনের প্রয়োগ; খাস ও উদ্বৃত্ত জমি জমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিলি; (ঙ) স্বল্পবিত্ত মধ্যস্বত্ব ভোগীদের তাড়াতাড়ি ক্ষতিপূরণ দান; (চ) বর্গা চাষের জমিতে ভাগচাষীদের পুরুষানুক্রমে চাষের অধিকার দান; (ছ) পূর্ণাঙ্গ আইনসাপেক্ষে তিন বছরের জন্য ভাগচাষীদের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বন্ধ; (জ) গ্রামাঞ্চলে গৃহহীনদের জন্য ৫ কাঠা পর্যন্ত জমি বাস্তুর জন্য বিনা মূল্যে দেওয়া, কোনরূপ অধিকার ছাড়া অন্যের জমিতে ঘর করে আছে এবং অন্যত্র তার ঘর নেই এমন পরিবারকে ঐ জমিরই অন্যূন ৫ কাঠার উপর স্বত্ব প্রদান; জমির উচ্চসীমা, বে-আইনি হস্তান্তর, ন্যস্ত জমি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতে নাকচ করা এবং ঐসব ক্ষেত্রের ব্যাপারে "স্পেশাল ল্যাণ্ড ট্রাইবুনাল" গঠন করা; (ঝ) অতীতের বহু দুর্নীতির অবসান করে নতুন সেটেলমেণ্টের জন্য নতুনভাবে জমির সার্ভে করা; (ঞ) অনূর্ধ্ব তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের নিকট সরকারের প্রাপ্য ৪ বছরের পুরনো দেনা আদায় স্থগিত করা এবং তাদের বেসরকারী দেনা

নিয়েও একটা বিহিত করা এবং (চ) অভাবের কারণে বিক্রীত জমি বিক্রেতাকে প্রত্যর্পণ করা।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার বেনামী জমির উদ্ধার, দখল ও বিলি ব্যবস্থার জন্য কৃষকদের সংগ্রামে এবং কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার অন্যান্য সংগ্রামে সাহায্য করবে।

জমিদখল ও ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত আইনকানুনের ক্ষেত্রে দার্জিলিং জেলার পৃথক অবস্থা বুঝে প্রয়োজনীয় সংশোধনী থাকবে।

শহর সম্পত্তির সীমানা

৬। শহর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্ট সরকার সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার এবং বর্তমানের সীমাহীন জমি ও গৃহ সম্পত্তির উপর মালিকানার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঠিকা প্রজা ও ভাড়াটেদের অধিকার

৭। কলকাতা ও হাওড়ায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার 'ঠিকা' প্রজাদের প্রজাস্বত্ব অধিকার দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনকে এমনভাবে সংশোধন করা হবে যাতে ভাড়াটেদের ন্যায্য নিরাপত্তা রক্ষিত হয় এবং এই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি দূর হয়।

শিল্প

৮। যাতে সমভাবে ও কার্যকরভাবে জনগণের সেবা করা যায় তার জন্য যুক্তফ্রণ্ট সর্বপ্রকার শিল্প, বিশেষ করে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে নজর দেবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষির সঙ্গে যুক্ত শিল্প গঠনে যুক্তফ্রণ্ট সরকার সচেষ্ট হবে।

রাজ্যের শিল্পের জন্য লাইসেন্স, পুঁজি এবং কাঁচামাল জোগানোর উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ দেবে।

শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য যুক্তফ্রণ্ট কার্যকর ব্যবস্থাদি অবলম্বন করবে।

সমবায়

৯। সমবায় প্রসারের জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রয়াস করবে। উৎপাদক ও ক্রেতা উভয় প্রকারের সমবায় বাড়াবার চেষ্টা করা হবে যাতে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্পের স্থাপনা, ঋণদান এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদির দর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিবিধ স্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে।

শিক্ষা

১০। যুক্তফ্রণ্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা দূর করার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং একটি সুষ্ঠু, পারম্পর্যসম্পন্ন এবং সংহত শিক্ষা পদ্ধতি চালু করবে। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই (ক) শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা

শিক্ষার বাহন করা হবে; (খ) চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে—প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়নি এমন সমগ্র অঞ্চলে বিদ্যালয় খোলা হবে; (গ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে; (ঘ) গ্রামাঞ্চল ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার মান এবং শিক্ষকদের চাকরীবিধির মানেও যে বৈষম্য চলতি রয়েছে সেগুলি দূর করা হবে; (ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে একটি নতুন সামগ্রিক আইন চালু করা হবে; (চ) বর্তমান জেলা স্কুল বোর্ডগুলি বাতিল করে তার স্থলে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নতুন বোর্ড স্থাপন করা হবে; (ছ) মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে সংস্কার করা হবে; (জ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনার গণতন্ত্রীকরণ করা হবে; (ঝ) সকল শ্রেণীর শিক্ষক ও অ-শিক্ষক বিদ্যালয় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে এবং চাকুরি বিধিরও বদল করা হবে—যাতে কাজের নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়; (ঞ) শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের সময়মত বেতনের ব্যবস্থা করা হবে; (ট) শিক্ষকপ্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে বাড়ানো হবে; (ঠ) নতুন প্রতিষ্ঠান খুলে এবং চলতি প্রতিষ্ঠানেও নতুন শিফট প্রথায় ছাত্র-ভর্তি সমস্যার মীমাংসা করা হবে; (ড) চলতি পরীক্ষা গ্রহণ প্রথার সংস্কার করা হবে; (ঢ) বিদ্যায়তনের প্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিসের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে; (ণ) ছাত্র ও যুবকদের কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে; (ত) শিক্ষক, ছাত্র ও পরিচালকদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো হবে; (থ) সাহিত্য, কলা, খেলাধুলা, শরীর চর্চা এবং যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে এবং (দ) কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম খোলা হবে।

স্বাস্থ্য

১১। যুক্তফ্রণ্ট সরকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সেবা ব্যবস্থাকে বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হবে, মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রসার ঘটাবে এবং হেলথ সার্ভিসকে জাতীয়করণের পথে অগ্রসর হবে।

হাসপাতালগুলির ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করার জন্য এবং জনসাধারণের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

গোটা রাজ্যে উপযুক্ত পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাসগৃহ

১২। যুক্তফ্রণ্ট সরকার শহর ও গ্রাম সর্বত্র স্বল্প আয় ও মাঝারি আয়ের পরিবারের জন্য সস্তায় বাড়ি জোগাতে সচেষ্ট হবে এবং গৃহ-নির্মাণ সমবায়ের প্রতি উৎসাহ জোগাবে।

পুনর্বাসন

১৩। পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার সচেষ্ট হবে যাতে প্রত্যেক উদ্বাস্তু ভারতের পূর্ণ নাগরিকরূপে গৃহ, শিক্ষা ও চাকুরিতে যথার্থ সুযোগ পেয়ে যথাস্থান পেতে পারেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কতগুলি ভারতীয় ছিটমহল থেকে যারা সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের রিলিফ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব স্বীকৃতির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ দেবে।

কেন্দ্রের নিজেরই পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তা মঞ্জুরীর জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের উপর অবিরাম চাপ দেবে।

শ্রমিক

১৪। যুক্তফ্রন্ট সরকার (ক) বাঁচার মত মজুরী, (খ) বেকার ভাতা, (গ) উপযুক্ত পরিমাণ বোনাস ও বোনাস আইনের সংশোধনের জন্য এবং (ঘ) ছাঁটাই, র‍্যাশনালাইজেশন ও অটোমেশনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামে সাহায্য করবে।

চলতি শ্রম-আইনগুলির যেখানেই শ্রমিকশ্রেণীর সুবিধার্থে প্রয়োজন হয় এমন রকমের সংশোধনী যুক্তফ্রন্ট সরকার আনবে। (ক) অসদুদ্দেশ্যে মালিকদের কারখানা বন্ধের ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান; (খ) কণ্ট্রাক্ট শ্রম ও ক্যাজুয়াল শ্রম নিষিদ্ধকরণ; (গ) ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি—একটি মাত্র ইউনিয়নের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক করা, যে সব ক্ষেত্রে একাধিক ইউনিয়ন থাকবে সেক্ষেত্রে দু'বছর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রধান ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদান—অবশ্য বাকী অস্বীকৃত ইউনিয়নগুলিরও প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকবে; (ঘ) লক-আউটকালীন সময়ের বেতন দান—লক-আউটকালীন অবস্থাতেই ৫০ শতাংশ বেতন দিয়ে যাওয়া; (ঙ) যে সব শ্রমিকের কাজ টারমিনেট করা হয়েছে অথবা অসদাচরণের অভিযোগে ছাঁটাই, অস্থায়ীভাবে কর্মচ্যুত কিংবা কর্মচ্যুত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দান; (চ) সালিশীর বৈঠকে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ উভয়ের উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক করা; (ছ) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড তহবিলে মালিকদের টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে ফাঁকির ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান প্রভৃতি নতুন নতুন আইনও যুক্তফ্রন্ট সরকার রচনা করবে। শ্রমিকদের অধিকার বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে স্ট্যাণ্ডিং আচরণবিধির সংশোধন এবং সালিশীর প্রশাসনিক ও চালনা সম্পর্কিত বিধিবিধানের উন্নতি বিধান করা হবে। রাষ্ট্রবীমা পরিকল্পনার উন্নয়নের জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। সর্বপ্রকার সরকারি চাকুরেদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বীকার করা হবে এবং কর্মচারীদের অধিকারের দিকে নজর রেখে তাদের কণ্ডাক্ট রুলস পরিবর্তনেরও ব্যবস্থা করা হবে।

১৫। সমগ্র রাজ্যে ক্ষেতমজুরদের নিম্নতম বেতনের নিশ্চিন্তকরণের জন্য, তাদের অধিক কাজের জন্য এবং সরকারী কৃষিফার্মে ক্ষেতমজুরদের নিয়মিত শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

বেকারভাতা ও বার্ধক্যের পেনসন

১৬। শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। বেকার-ভাতা প্রচলনের জন্য যুক্তফ্রন্ট সচেষ্ট হবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার বৃদ্ধদের জন্য ভাতাদানের নীতির প্রসার ঘটাবে এবং ভাতা বৃদ্ধি করবে।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন এবং দুঃখবরণ করেছিলেন তাঁদের বার্ধক্যে কিংবা পঙ্গু অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট সরকার উপযুক্ত নজর দেবে।

বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

১৭। শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের কাজ যুক্তফ্রন্ট সম্পন্ন করবে এবং আদালতের বিচার অযথা বিলম্বিত হওয়ার কারণ দূর করার উদ্দেশ্যে বিচার পদ্ধতির সরলীকরণ করা হবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

১৮। যুক্তফ্রন্ট সরকার বর্তমান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রগতিশীল পরিবর্তনের সূচনা করবে, এবং পৌর প্রতিষ্ঠান ও পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির গণতন্ত্রীকরণ করবে, এবং এদের যথাযথ কাজ চালানোর জন্য আরও ক্ষমতা প্রদান ও অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

সংখ্যালঘু

১৯। যুক্তফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করবে। তাঁরা যাতে তাঁদের বিশ্বাস অনুসরণ করতে পারেন, তাঁদের বিশেষ সংস্কৃতি ও ভাষাকে রক্ষা করতে পারেন এবং সংবিধান প্রদত্ত সামাজিক, আর্থিক কিংবা শিক্ষাগত ব্যাপারে যাবতীয় অবিশ্বাস, বাধা ও অসুবিধা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত করতে পারেন, তার রক্ষাকবচ সৃষ্টি করা হবে।

তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসী সমাজ

২০। যুক্তফ্রন্ট সরকার তফসিলী সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং সমাজের অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনসংখ্যার দিকে বিশেষ নজর দেবে এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করবে।

জনগণের ঐক্য

২১। যুক্তফ্রন্ট সরকার সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতের বৈষম্য, ভাষাগত গোঁড়ামি এবং এই ধরনের অপরাপর ক্ষতিকর ব্যাপার যা দেশের ঐক্যকে ব্যাহত করে এবং জাতির সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার বিরুদ্ধে লড়বে।

মহিলা

২২। মেয়েদের বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকার উপযুক্ত দৃষ্টি রাখবে। মেয়েদের শিক্ষা ও তাদের নানা ট্রেনিং-এর সুযোগ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হবে এবং মেয়েদের উপযুক্ত বিবিধ কর্মসংস্থানের উপায় সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হবে।

কতকগুলি এলাকা ও প্রকল্পের প্রতি বিশেষ নজর

২৩। কলকাতার সমস্যাগুলি এবং পশ্চাৎপদ বিবিধ অঞ্চল যথা পুরুলিয়া,

উত্তর-বঙ্গের কতকাংশে, বিশেষ করে দার্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চল প্রভৃতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সবিশেষ মনোযোগ পাবে; ফরাক্কা ও হলদিয়া প্রকল্পের দ্রুত ও যথাযথ রূপায়ণের জন্যও চাপ দেওয়া হবে।

বাঙলা ও নেপালী সরকারী ভাষা

২৪। বাঙলাকে রাজ্যের সরকারী ভাষা ও দার্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলে নেপালীকে আঞ্চলিক ভাষা করার যে প্রস্তাব পশ্চিমবাঙলার বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকার ঐ প্রস্তাবকে দ্রুত কার্যকর করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

হাইকোর্ট পর্যন্ত প্রত্যেক আদালতে বাঙলা ভাষায় (দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলের ক্ষেত্রে নেপালী ভাষায়) কার্য পরিচালনার দাবিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার আরও অগ্রসর করে নেবে।

শহিদের স্মৃতি রক্ষা ও সাম্রাজ্যবাদী চিহ্নের অবসান

২৫। (ক) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে যুক্তফ্রন্ট সরকার যথাযোগ্য স্মৃতিচিহ্ন তৈরী করবে—অগস্ট বিপ্লব, আই-এন-এ, খাদ্য-আন্দোলন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিও এই সঙ্গে রক্ষিত হবে।

স্বাধীনতার যোদ্ধাদের একটি স্মারকরূপে আন্দামান সেলুলার জেলকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের দাবিও যুক্তফ্রন্ট সরকার জানাবে।

(খ) কলকাতা ও অন্যান্য সব স্থান যেখানে প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিমূর্তি কিংবা ব্রিটিশ শাসনের অন্য কোন স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে সেগুলিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার সরিয়ে দেবে।

জনগণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা

২৬। যাবতীয় অসামাজিক ব্যক্তি ও অপরাধীদের দৌরাত্ম্য থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার জনসাধারণকে রক্ষা করবে এবং অসামাজিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

বেরুবাড়ী

২৭। ভারত সরকারের কাছে বেরুবাড়ী প্রশ্নটি পুনরুত্থাপন করা হবে।

দেশের সার্বভৌমত্ব

২৮। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও তাকে শক্তিশালী করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার সর্বপ্রকার কাজ করবে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

২৯। যুক্তফ্রন্ট সরকার মৌলিক ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে সম্মান ও রক্ষা করবে। শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কদাপি নিবর্তনমূলক আটক আইন ব্যবহার করা হবে না। কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের

বিরুদ্ধে পুলিস লাগানো হবে না। যুক্তফ্রণ্ট সরকার বাতিল হবার পর পুলিস যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছে সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে, যুক্তফ্রণ্ট সরকার বাতিল করার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনকল্পে যাবতীয় মামলাগুলি প্রত্যাহার করা হবে। দেশের যাবতীয় অগণতান্ত্রিক ও নির্যাতনমূলক আইন, যথা 'বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ আইন' 'অপরিহার্য সার্ভিস রক্ষা আইন' প্রভৃতি বাতিলের জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

জনপ্রিয় কমিটি

৩০। সরকারের যাবতীয় কাজের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য এবং সরকারী কার্যক্রমকে রূপায়ণের জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার বিভিন্ন স্তরে জনপ্রিয় কমিটি গঠন করবে এবং এই কমিটিগুলির মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, ট্রেড ইউনিয়নের, কৃষক সভার এবং অন্যান্য গণ-সংস্থার প্রতিনিধিদের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও নেওয়া হবে।

বিধান পরিষদ লোপ

৩১। রাজ্য বিধানমণ্ডলীর উচ্চতর কক্ষকে বাতিল করার জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সংবিধান সংশোধন

৩২। (ক) যুক্তফ্রণ্টের নিম্নতম কর্মসূচী রূপায়ণের পক্ষে প্রতিবন্ধক ভারতীয় সংবিধানের যে-ধারাগুলি রয়েছে, যুক্তফ্রণ্ট সরকার সেগুলিকে সংশোধনের জন্য আন্দোলন করবে। সংবিধানের যে সব ধারায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়-গুলি রয়েছে, রাজ্যসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ঐসব ধারার সংশোধনের জন্য বিশেষভাবে আন্দোলন করা হবে।।

(খ) জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ কর্তৃক ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলির অন্তর্ভুক্তি ও সেই ভাষার অবস্থান সম্পর্কিত ব্যাপার, যথা নেপালী ভাষার অন্তর্ভুক্তি ও অবস্থানের বিষয় নিয়ে সংবিধানের অষ্টম শিডিউল যাতে সংশোধিত হয়, সেজন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রয়োজনীয় খসড়া তৈরী করে কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝা-পড়া করবে।

(গ) ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ শিডিউলকে সম্প্রসারিত করে দার্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলে যাতে স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠিত হতে পারে এবং রাজ্য-পালের ক্ষমতা হ্রাস করে ঐসব পরিষদের ক্ষমতা যাতে বাড়ে যুক্তফ্রণ্ট তার পক্ষে দাঁড়াবে।

পরিশিষ্ট—৩

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের শরিকদের মধ্যে আন্তঃ-দলীয় সংঘর্ষ নিরোধার্থে যুক্তফ্রণ্টের প্রস্তাব

নানা জেলায় বিভিন্ন দলের সমর্থক ও কর্মীদের মধ্যে যে-সব বিবাদ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্টের সব শরিকই বিশেষভাবে চিন্তিত। এই সব আন্তঃ-দলীয় বিবাদ মাঝে মাঝে সংঘর্ষ এবং খুনোখুনিতে পর্যবসিত হচ্ছে। এতে শুধু যে ফ্রণ্টের গৌরব-দীপ্ত ইমেজই কলংকিত হচ্ছে তা নয়; দেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির কাছে এটা যে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—এ কথা ফ্রণ্টের সব দলই মানে। অন্যদিকে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা এ ধরনের বিবাদ ও সংঘর্ষকে কাজে লাগাচ্ছে।

নির্বাচনে আমাদের সকলের শত্রু কংগ্রেসের চরম পরাজয়ের ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে কংগ্রেস যে অস্তিত্বশীল রয়েছে এবং যুক্ত-ফ্রণ্টকে বানচাল ও ধ্বংস করার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে—আমাদের কেউ কেউ এ সত্য যেন দেখেও দেখতে চাচ্ছেন না। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নগণ্য মাইনরিটিতে পরিণত হবার পর সে দল বুঝতে পেরেছে যে যুক্তফ্রণ্টের পরিষদীয় ব্লক থেকে কিছু নির্ভর-করার-অযোগ্য সদস্যকে ভাঙিয়ে নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটানো আর সম্ভব নয়। ওরা ওদের কৌশল পালটে ফেলেছে। এখন ওরা যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ধুয়ো ধরছে; আভ্যন্তরীণ বিবাদকে কাজে লাগাচ্ছে। অতএব শত্রুর কৌশল সম্পর্কে নিয়ত সচেতন থাকা এবং তারা যাতে কোন সুযোগ পেয়ে না যায় তার ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও সংঘর্ষের ঘটনাগুলিকে যুক্তফ্রণ্টের প্রত্যেক শরিক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছে এবং এ ধরনের সংঘর্ষ নিরোধের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ধরনের বিবাদ ও সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে যুক্তফ্রণ্টের দলগুলির মধ্যে একটা সর্বসম্মত বোঝাপড়ার ভাব রয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যুক্তফ্রণ্ট অনৈক্যকামী শক্তিগুলিকে প্রতিহত করতে, ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধভাবে বানচাল করতে এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবর্তন রোধ করতে পারবে।

যুক্তফ্রণ্ট মনে করে যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি (বর্তমান) পরিস্থিতির অংগী উপাদান :

১। কংগ্রেস, কতগুলি সংবাদপত্র এবং যুক্তফ্রণ্টের প্রতি বিরূপ শক্তিসমূহ নিজেদের স্বার্থে ফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে এবং কাজে লাগাচ্ছে।

২। জোতদার, মহাজন এবং অন্যান্য কায়েমি স্বার্থের একটা অংশ যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি দলের সমর্থক সাজার ভাণ করছে। শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থে যারা সত্যিকার লড়াইয়ে নামছেন ওরা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিচ্ছে।

৩। আমলা ও পুলিসের উচ্চপদস্থ অনেক অফিসার আন্তঃ-দলীয় অনৈক্য ও বিবাদকে কাজে লাগাতে এবং ফ্রন্টের এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে বিবাদ তীব্রতর করার চেষ্টা করছে।

৪। গত দু' দশকের কংগ্রেস রাজত্বের সময় সমাজ-বিরোধীদের বেশ বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছিল। এখন তাদের একাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা নিরাপদ মনে করছে না। তারা ফ্রন্টের কয়েকটি দলের সমর্থন পাবার চেষ্টা করছে। তারা বিভিন্ন এলাকায় আন্তঃ-দলীয় সংঘর্ষ সৃষ্টিতে মদৎ জোগায়।

৫। সি আই এ এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট, বড় শিল্পপতিদের এজেন্ট এবং দেশের প্রতিক্রিয়াশীল নানা দল ও গ্রুপ ফ্রন্টের ঐক্যে ভাঙন ধরাবার খেলায় মেতেছে।

৬। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা যত সীমিতই হোক না কেন, সে-ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বার্থে, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ অভিযান ও সংগ্রামের পথে চালিত করার কাজে ব্যবহার করতে হবে। এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে সকলের সাধারণ লক্ষ্য পরিতুষ্ট করাই শুধু নয়, ভারতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ও ঐক্যবন্ধনের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু ফ্রন্টের কোন কোন শরিকের মধ্যে তাদের কর্ম-পরিধি ও উদ্যমকে কেবল রাজ্য সরকাররূপ যন্ত্রের সীমিত ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর মধ্যেই সীমায়িত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যারাই আসতে ইচ্ছুক তাদের সবাইকে দলে টেনে নিয়ে এবং মন্ত্রিত্বের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অনেকেই সহজ পদ্ধতিতে দলের আয়তন বৃদ্ধির প্রবণতার শিকার হচ্ছে।

৭। দলীয় সংকীর্ণতা এবং অন্ধ আনুগত্যের ফলে অনেকে অন্য দলের ক্ষতি করে, এমন কী সহিংস পন্থা অবলম্বন করেও নিজ দলের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়াসী হয়ে উঠছে।

৮। ৩২দফা কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য যুক্তফ্রন্ট ও ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উপযুক্ত ক্রিয়াকলাপের অভাব কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, শোষক শ্রেণীসমূহ এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বান্ধবদের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম চালাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৯। সর্বোপরি, কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে ফ্রন্টের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অভাব গণতান্ত্রিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করা এবং যুক্তফ্রন্টের শত্রুদের ক্রমশ বেশি করে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কাজে দারুণ প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে।

॥ দুই ॥

যুক্তফ্রন্ট এবং তার অঙ্গী দলগুলি তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ সত্য উপলব্ধি করেছে যে আন্তঃ-দলীয় বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে; সংঘর্ষ

এড়িয়ে চলতে হবে। ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের মধ্যে নানা আদর্শগত ও রাজনীতিক পার্থক্য থাকলেও তারা সকলেই এ বিষয়ে সচেতন যে কংগ্রেস সরকার এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার ইচ্ছার উপরেই ওদের ঐক্য নির্ভরশীল। তারা এ বিষয়েও সচেতন যে তারা একতাবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলেছে; কিন্তু সরকার গড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সেই লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। সংগ্রাম এখনো চলছে।

ফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখা এবং তা সুদৃঢ় করার ব্যাপারে এই মূল কথাটা মনে রেখে যুক্তফ্রন্ট তার বিভিন্ন দলের মধ্যে আন্তঃ-দলীয় সংঘর্ষ অবিলম্বে বন্ধ করা এবং বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে বলে স্থির করছে :

১। ৩২দফা কর্মসূচীর মধ্যে কোনটি আগে, কোনটি পরে রূপায়িত হবে তা অবিলম্বে স্থির করে ফেলতে হবে। অগ্রগণ্যতার ক্রম অনুযায়ী যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপদানের জন্য সর্বসম্মত ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গড়ে তুলতে হবে।

২। কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য মানুষের উপর যে আক্রমণ চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিকল্পনা করতে হবে এবং রাজ্যব্যাপী সংগ্রাম শুরু করতে হবে। কেন্দ্রের কাছ থেকে বেশি ক্ষমতা ও অর্থ আদায়, কেন্দ্রীয় ক্যাডার রাজ্যের হাতে সমর্পণ এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও রাজ্যব্যাপী সংগ্রাম শুরু করতে হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং ফ্রন্টের ঐক্য-ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোই হবে এই সংগ্রামের লক্ষ্য।

৩। যুক্তফ্রন্টের শত্রুরা যে নতুন কৌশল অবলম্বন করছে সে সম্পর্কে ফ্রন্টের সকল শরিক দলকেই সচেতন হতে হবে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। সে অনুযায়ীই তাদের (শরিকদের) কার্যধারা পরিচালিত করতে হবে।

৪। যে স্তরে বিবাদ দেখা দেবে সেই স্তরেই পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা আন্তঃ-দলীয় বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে। সংশ্লিষ্ট দলগুলির স্থানীয় কমরেডরা যদি বিবাদ মিটাতে সক্ষম না হয়, তাহলে জেলা পর্যায়ে আলোচনা চালাতে হবে। সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে জেলা পর্যায়ে আলোচনার দ্বারাও যদি বিবাদ মিটমাট করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিষয়টি রাজ্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। যখনই সংঘর্ষ দেখা দেবে তখনই সংশ্লিষ্ট দলগুলির জেলা ও রাজ্য নেতারা অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করবেন। কিন্তু সংঘর্ষ রোধ করার জন্য যখনই সংশ্লিষ্ট দলগুলির জেলা ও রাজ্য কমিটির কাছে কোন এলাকা থেকে বিবাদের খবর আসবে তখনই নেতারা দেরি না করে স্থানীয় কমরেডদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন।

৫। কোন বিশেষ এলাকায় যুক্তফ্রন্টের যে-সব দল এবং অন্যান্য যে-সব গণ-সংস্থা কাজ করছে তাদের স্থানীয় মানুষের বিশেষ বিশেষ সমস্যার ব্যাপারে যৌথ অধিবেশন, সভা, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং অন্যান্য ধরনের আন্দোলন নিয়মিত

গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য তাদের যুগ্ম কমিটি গড়ে তুলতে হবে। নিম্ন পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস ফ্রণ্টের ঐক্য সুদৃঢ় করার ব্যাপারে সহায়ক হবে।

৬। খাদ্য, ভূমি, শ্রম, শিক্ষা এবং প্রশাসনিক সংস্কার এবং অন্যান্য বিষয়ে নানা নির্দিষ্ট সেক্টরে সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। এর জন্য অধিবেশন ও সভার মাধ্যমে জেলা যুক্তফ্রন্ট কমিটি এবং অন্যান্য গণ সংগঠনকে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

৭। ফ্রন্ট-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের দুষ্ট চক্রান্তের মুখোস খুলে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও জেলা স্তরে যুক্তফ্রণ্টের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভা-সমাবেশের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এই সব সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে যুক্তফ্রণ্টের অঙ্গী দলগুলির রাজ্য নেতাদের উপস্থিত থাকতে হবে। এর ফলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই শুধু গড়ে উঠবে না, গণতান্ত্রিক জনগণের এবং যুক্তফ্রণ্টের সমর্থকদের রাজনীতিক মনো-বলও বৃদ্ধি পাবে।

৮। নিজের আদর্শবাদ ও কর্মসূচী প্রচার করা, জনগণকে নিজের দৃষ্টিকোণ দ্বারা চালিত করা এবং নিজেকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করার অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রত্যেক দলেরই আছে। কিন্তু এ ধরনের মত প্রচারের দ্বারা অসহিষ্ণুতা ও দলীয় সংকীর্ণতা আশ্রয় করা এবং সহিংস পন্থায় ভ্রাতৃসম দলগুলির ক্ষতি করে নিজের সম্প্রসারণের চেষ্টা করা উচিত হবে না।

৯। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা যাতে একটি ঐক্যবদ্ধ টীম হিসাবে কাজ করতে পারে তার জন্য যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভায় পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

যুক্তফ্রণ্টের শরিকদের আচরণবিধি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া গড়ে তুলতে হবে; আন্তরিকভাবে সকলকে সেই বিধি মানতে হবে। আদর্শগত এবং অন্যান্য পার্থক্য সত্ত্বেও একই লক্ষ্যে পেঁছাবার জন্য এবং একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাদের একত্রে কাজ করতে ও বেড়ে উঠতে হবে—এ ধরনের বোঝাপড়া গড়ে তোলা উচিত।

কলকাতা
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

স্বাক্ষর অজয়কুমার মুখার্জি
" জ্যোতি বসু
" বিশ্বনাথ মুখার্জি
" নির্মল বোস
" মাখন পাল
" নীহার মুখার্জি
" অরুণচন্দ্র ঘোষ
" বিদ্যুৎ বোস
" জ্যোতি ভট্টাচার্য
" রাম চ্যাটার্জি
" সুধীন কুমার
" বরদা মুকুটমণি

মন্ত্রীদের আচরণবিধি

(মন্ত্রীদের জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার একটি আচরণবিধি তৈরী করেছিলেন। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর ১৯৬৯ সনের সেপটেম্বর মাসে সেই আচরণবিধি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়।)

বিধান সভার সদস্য পদে অনুপযুক্ততার কারণ হিসাবে সংবিধানের ব্যবস্থাবলী এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইন কিম্বা দেশে বর্তমান যে আইন-কানুন প্রচলিত আছে, তা ছাড়াও যে কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার সময়ে কিম্বা তার অব্যবহিত পরবর্তী কোন সময়ে—

(ক) মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর সম্পত্তি এবং দায় সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ জানাতে হবে। তাঁর নিজের এবং পরিবারের অন্য কারও ব্যবসাপত্র থাকলে, তাও তাঁকে জানাতে হবে। এই বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে থাকবে স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং (১) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার, (২) নগদ টাকা, (৩) গহনা-গাটি এবং (৪) পাঁচশত টাকা মূল্যের অধিক অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যের মোট আনুমানিক হিসাব।

(খ) মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হবার আগে যদি কোন ব্যবসার পরিচালন বা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থেকে থাকে, তা ছিন্ন করতে হবে। তবে তিনি ঐ ব্যবসায়ের মালিকানা নিজের হাতে রাখতে পারেন।

(গ) কিন্তু ব্যবসাটি যদি এমন হয় যা সরকার কিংবা সরকারী সংস্থায় জিনিস-পত্র সরবরাহ করে কিংবা যে ব্যবসায় প্রধানত সরকারপ্রাপ্ত কিম্বা রাজ্য সরকারী সূত্রে প্রাপ্তব্য লাইসেন্স, পারমিট, কোটা, লীজ ইত্যাদির উপর মুখ্যত নির্ভর-শীল সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে কথিত ব্যবসার সমস্ত রকমের সংস্রব কিম্বা তার পরিচালন ব্যবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের সাধারণ ক্ষেত্রে এবং তা যদি নির্দিষ্ট এবং বাজারদর অনুযায়ী হয়ে থাকে এ নিয়ম প্রযুক্ত হবে না।

অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর পরিবারের বা আত্মীয়ের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তিকে যিনি উক্ত ব্যক্তি মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হবার পূর্ব থেকেই কথিত ব্যবসা বা তার পরিচালনা অথবা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁকে (খ)-এর ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজে তাঁর যতটুকু সম্পর্ক আছে কিম্বা (গ)-এর ক্ষেত্রে মালিকানা এবং পরিচালনা দুটিই তাঁর হাতে তুলে দিতে পারেন। তাঁর যদি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে শেয়ার থাকে সে ক্ষেত্রে ঐ কোম্পানির সঙ্গে

তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রশ্ন উঠবে না তবে মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন যে তাঁর এই অংশীদারত্বের প্রকৃতি বা পরিমাণ এমন, যার সাহায্যে তিনি ঐ কোম্পানির কাজকর্ম পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করতে বা প্রভাবিত করতে পারেন অথবা এর ফলে তাঁর নিজের সরকারী কাজে অসুবিধা হতে পারে সেক্ষেত্রে সম্পর্ক ত্যাগ করবার নীতি প্রযুক্ত হবে। ব্যাখ্যা : **এই আচরণবিধি কার্যকরী হওয়ার আগেই যে সব মন্ত্রীরা পদাভিষিক্ত হয়েছেন তাঁদের বেলায় পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের ব্যবস্থাবলী প্রযুক্ত হবে।**

২। মন্ত্রীমহাশয় কার্যভার গ্রহণ করবার পর এবং যতদিন তিনি মন্ত্রী থাকবেন ততদিন (ক) প্রতি বছর ৩১এ মার্চের পূর্বে (১-ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের সকলের দায় ও সম্পত্তির বিবরণ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাখিল করবেন।

(খ) তিনি সরকারের কাছ থেকে কোন অস্থাবর সম্পত্তি কিনতে পারবেন না আবার বিক্রিও করতে পারবেন না। তবে যেক্ষেত্রে সরকার স্বাভাবিক নিয়মে ঐ সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে দখল করেছেন সেক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

(গ) উপরোক্ত ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষেত্রে যে পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছে সেই পরিমাণ শেয়ার কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে তিনি রাখতে পারবেন। কিন্তু তিনি এছাড়া অন্য কোন ব্যবসা শুরু করতে বা তাতে যোগ দিতে বা সেখানে কোন অধিকার অর্জন করতে পারবেন না।

(ঘ) তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাঁর পরিবারের কেউ সরকার বা সরকারের অধীনস্থ কোন সংস্থায় মালপত্র সরবরাহ করে কিম্বা তাতে কোনরকম সাহায্য নেয় কিম্বা এমন কোন ব্যবসা যা রাজ্য সরকারের লাইসেন্স, পারমিট, কোটা বা লীজের ওপর নির্ভরশীল, সেই ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খুলতে পারবেন না বা তাতে কোন অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

(ঙ) তাঁর পরিবারের কেউ যদি কোন ব্যবসায় পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হন কিম্বা তা নতুন করে আরম্ভ করেন তবে তিনি সেটি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনবেন।

৩। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে ঐ ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনে দাতব্য প্রতিষ্ঠান কিম্বা জনহিতকর কাজের বা ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত কোন সংস্থার অবৈতনিক অধিকর্তা কিম্বা অন্য কোন পদকর্তার পদে কাজ করতে পারবেন না।

৪। কাজে রত কোন আইনজ্ঞ বা ডাক্তার মন্ত্রী হলে তাঁকে তাঁর জীবিকার জন্য এ কাজ করা ছাড়তে হবে। তবে তার অর্থ এই নয় যে তাঁর যদি কোন প্র্যাকটিসিং সারটিফিকেট থেকে থাকে, তা বাতিল হয়ে যেতে দেওয়া হবে কিম্বা কোনো সলিসিটরকে তাঁর অংশীদারত্ব ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য সলিসিটরকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের নিয়মমাফিক কাজ ছেড়ে দিতে হবে আর সাধারণ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু কোন পারিবারিক ট্রাস্ট বা অভিভাবকের অধিকার অথবা এ ধরনের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার তাঁর থাকবে না।

৫। সাংবাদিক হলে তাঁকে সে কাজ ছাড়তে হবে। তবে যে বই তিনি লিখেছেন তার গ্রন্থকার স্বত্ব বাবদ আয় বন্ধ হবে না, রয়েলটিও থাকবে। আর টাকা না

নিয়ে তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, আইন, দার্শনিক, ভাবানুরাগী রচনা এমন কি রাজনৈতিক বিষয় বা সরকারের ও প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখতে পারবেন; তবে মন্ত্রীর পদাধিকার বলে তিনি যেসব গোপনীয় তথ্যাদি জানবেন এবং যা প্রকাশ করলে সরকার অসুবিধায় পড়তে পারেন কিম্বা সরকারের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে তাঁর রচনায় এমন ধরনের কোন সংবাদ দেওয়া চলবে না। কোন সন্দেহ-জনক বিষয় এলেই মুখ্যমন্ত্রীর সংগে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে এবং তাঁর অনুমতি পূর্বেই নিতে হবে।

৬। একজন মন্ত্রী যখন কোন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন কিম্বা সরকারের নীতি অথবা রাজনৈতিক বিতর্কে সরকারের বক্তব্য সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেবেন তখন তাঁকে সরকারের সামগ্রিক বক্তব্যটি তুলে ধরতে হবে। মন্ত্রিসভায় গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের সমগ্র ব্যাপারেই সকল মন্ত্রী দায়ী হবেন। কেবল তিনি যে তার বিরোধিতা করতে পারবেন না তা নয়, তাঁর মন্ত্রিসভার ঐ সিদ্ধান্তে প্রকাশ্যে সমর্থনও জানাতে হবে। তিনি পরে একথা বলতে পারবেন না যে ঐ ব্যাপারে তাঁর সম্মতি ছিল না বা কোন আপোসে উপনীত হবার জন্য বা সহযোগীদের পরামর্শে তিনি ওতে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা থেকে যে সব বিষয়কে "মুক্ত বিষয়" (ওপেন কোশ্চেন) বলে ঘোষণা করা হবে সে ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হবে না। ঐ সব ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার যে কোন সদস্য সরকার কিংবা কোন মন্ত্রীকে সমালোচনা না করে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার জন্য প্রকাশ্যে বলবার বা ভোট দেবার অনুমতি পাবেন। তাঁর ব্যক্তিগত মতামত বা ধারণা যাই হোক না কেন, তাঁকে সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে মন্ত্রীরা সংবিধানের ১৬৪(২) ধারা অনুসারে সরকারের সকল নীতি, সিদ্ধান্ত এবং কাজের জন্য 'রাজ্যের বিধানসভার কাছে সামগ্রিক-ভাবে দায়ী'।

৭। কোন ব্যক্তি যদি কোন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা কোন গণসংগঠন কিম্বা শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে বা তার কাজের সংগে জড়িত থাকেন, মন্ত্রিপদ গ্রহণের পর সেই সম্পর্ক ছিন্ন করবার কোন প্রয়োজন হবে না।

৮। (ক) কোন মন্ত্রী (১) কোন রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা বা কোন দাতব্য সংস্থা অথবা কোন সরকারী সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, (২) কিম্বা কোন রাজ-নৈতিক দলের সাহায্যের জন্য ছাড়া আর কোন কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারবেন না বা তহবিল সংগ্রহে সাহায্যও করতে পারবেন না। তবে অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যে এইভাবে সংগৃহীত অর্থ ঐ সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কিম্বা দলের কোন নির্দিষ্ট কর্মাধ্যক্ষের কাছে যেন পাঠান হয়। (খ) কোন মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা তাঁর পরিবারের কারুর মারফতে, কোন উদ্দেশ্যেই রাজ-নৈতিক, দাতব্য কিম্বা অন্য কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোন চাঁদা গ্রহণ করতে পারবেন না। অবশ্য যদি কোন রেজিস্ট্রিকৃত সমিতি অথবা দাতব্য সংস্থা কিম্বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের জন্য কোন অর্থ কি চেক তাঁর হাতে দেওয়া হয়, তিনি যতশীঘ্র সম্ভব ঐ টাকা সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ব্যাখ্যা : এই ধরনের অর্থ বা চেক অবশ্যই কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য এবং নির্দিষ্ট কোন সংস্থা বা তহবিলে দিতে হবে। এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকা উচিত হবে না। যদি দাতা এই ইচ্ছা

জানান যে মন্ত্রী মহাশয় তাঁর খুশিমত যে কোন দাতব্য বা অন্য কাজে ঐ টাকা বা চেক ব্যবহার করতে পারেন তবে সে ধরনের দান গ্রহণ করা উচিত হবে না।

৯। (ক) কোন মন্ত্রী তাঁর কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছ থেকে সামান্য ধরনের ছাড়া কোন উপহার বা দান গ্রহণ করবেন না। মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সরকারী কাজকর্মে যুক্ত এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ উপহার বা দান গ্রহণ করবেন না। (খ) সরকারী কাজে তাঁকে অসুবিধায় ফেলতে পারে বা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন ধরনের কোন দেনা তিনি করবেন না কিম্বা তাঁর পরিবারের কাউকেও করতে দেবেন না।

১০। (ক) সরকারী কাজে এই রাজ্যের মধ্যে কোথাও গেলে কোন মন্ত্রী যথাসম্ভব তাঁর নিজের কিম্বা আত্মীয় বা পরিবারের কারুর বাড়ীতে অথবা ডাকবাংলো জাতীয় সরকারী আবাস বা সরকারের অধীনে কোন সংস্থা কি প্রতিষ্ঠানে অথবা অনুমোদিত হোটেল বা দলীয় অফিসগুলিতে থাকতে হবে।

(খ) তাঁর সম্মানার্থে প্রদত্ত পার্টিতে বিলাসিতা, জাঁকজমককে প্রশ্রয় দেবেন না।

১১। সাধারণভাবে কোন একজন মন্ত্রীকে তাঁর কাজকর্মকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যে যার ফলে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ কিম্বা সরকারী কাজের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা না দেয় কিম্বা বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে না মনে হয়। সরকারী কাজ করবার মধ্যে যদি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন দেখা দেয় মন্ত্রীকে সব সময় তা খোলাখুলি জানাতে হবে। ঐ সম্পর্কিত কাজকর্মে তিনি থাকবেন না, কিম্বা এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন না, আবার একান্তই তিনি যদি তা করেন তবে তার সমস্ত সহযোগীদের জ্ঞাতসারে তা করতে হবে। কোন মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিত্বের পদাধিকার বলে যে সমস্ত সরকারী সংবাদ জানতে পারেন তা কখনই তাঁর নিজের বা বন্ধুবান্ধব কি আত্মীয়দের উপকারের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না। তিনি কারুর কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ নেবেন না এবং কারো সঙ্গে এমন কোন সম্পর্কে আসবেন না যার ফলে তাঁর সরকারী কাজকর্ম বা সিদ্ধান্ত কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত হতে পারে।

১২। উল্লিখিত বাধানিষেধ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ দেখা দিলে সব সময়েই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর সিদ্ধান্ত জেনে নিতে হবে।

১৩। এই আচরণবিধি প্রতিপালনের বিষয়টি সুনিশ্চিত করবার অধিকার মুখ্যমন্ত্রীর থাকবে। ব্যাখ্যা : (১) এই আচরণবিধিতে মন্ত্রীর পরিবার বলতে যিনি আইনত তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নন এমন স্ত্রী অথবা স্বামী, ছেলেরা, অবিবাহিতা মেয়েরা, রক্তের সম্পর্কে কিম্বা বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা অথবা মন্ত্রী মহাশয়ের উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বা তাঁর অধীনে আছেন এমন ব্যক্তিদের বোঝাবে।

১৪। যদি উপরে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী মন্ত্রীমহাশয়ের পরিবারের কেউ তাঁকে এই আচরণবিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি বা অসামর্থ্য জানান তবে সে ক্ষেত্রে মন্ত্রী মহাশয় ঘটনাটি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে রাখলেই তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

পরিশিষ্ট—৫

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সাফল্যের দাবি

(প্রথমবার ফ্রণ্ট সরকার চলেছিল ন' মাস। সরকার কাজ শুরু করার কিছু-দিনের মধ্যেই এক বিজ্ঞাপন মারফত প্রচার দপ্তর অগ্রগতির একটি বিবরণ দেন। বিজ্ঞাপনটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৭-র মে। সেই বিজ্ঞাপনটি হুবহু প্রকাশ করা হল।)

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রথম ছ'হপ্তা

১লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বয়স ৬ সপ্তাহ পূর্ণ হয়েছে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে জনসাধারণের জীবনে কোন মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে—এমন দাবি সরকার করেন না। জনসাধারণও বোঝেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে তা সম্ভব নয়। তাহলেও এই সময়ের মধ্যে অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ব্যবস্থা সরকার করতে পেরেছেন। যে-সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, শুধু তার মধ্যে থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বস্তির করভার কমেছে

কলকাতা শহরের দরিদ্র বস্তিবাসী এবং গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের প্রয়োজনের দিকে সরকার স্বভাবতই সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিয়েছেন।

কর্পোরেশনের আইনে বস্তি-বাড়ীর কর ধার্যের যে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, তার ফলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বস্তি-বাড়ীর করের হার ছিল বড় বড় অট্টালিকার সমান—বার্ষিক মূল্যায়নের উপর শতকরা ২৩ ভাগ। গত বৎসর কংগ্রেস সরকার তাকে আরও বাড়িয়ে ৩০ ভাগে তুলেছিলেন।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার এবার বিধানসভায় আইন পাস করেছেন যে, বস্তি-বাড়ীর করের হার শতকরা ১৮ ভাগের বেশী হতে পারবে না অর্থাৎ শতকরা ১২ ভাগ কর কমলো। ঐ আইনে আরও বলে দেওয়া হয়েছে যে, গত বছরের করও এই হিসেবে নিতে হবে—যদি কেউ বেশি দিয়ে থাকেন, তবে তা মানিয়ে নেওয়া হবে। সরকার আশা করেন যে, কর হ্রাসের ফলে বস্তি-বাড়ীর মালিকরা যে সুবিধা পেলেন, তার থেকে তাঁরা ভাড়াটিয়াদের ভাড়া কমানোর কথাও বিবেচনা করবেন।

বস্তির করভার কমানোর সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে বড় বড় অট্টালিকার ধনী মালিকদের কাছ থেকে আরও কিছু বেশী কর আমদানী হয়। কলকাতায় যেসব বাড়ীর বার্ষিক মূল্যায়ন ১৫ হাজার টাকার

ওপর, কংগ্রেসী আমলে সেগুলির করের হার ছিল শতকরা ৩০ ভাগ। যুক্তফ্রণ্ট সরকার এ-বছর থেকে তার হার করে দিয়েছেন শতকরা ৩৩ ভাগ।

গৃহহীন কৃষকের জন্য জমি

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামের গৃহহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক পরিবার সরকারী খাস বা আদায়ী জমি থেকে অনধিক পাঁচ কাঠা বাস্তু জমি লাভ করবেন। বাস্তু জমির এক-তৃতীয়াংশ একর খাজনামুক্ত রাখার জন্য ভূমি সংস্কার আইনে যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে দ্রুতগতিতে কার্যে পরিণত করা হবে।

সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে, বর্গাদারেরা যাতে জমি থেকে উচ্ছেদ না হয়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খরা অঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা

খরা-পীড়িত যে-সমস্ত অঞ্চলে গত বছরের তুলনায় উৎপাদন শতকরা ৬০ ভাগ বা তার কম হয়েছে, সেখানে সমস্ত খাজনা ও সেস মকুব করার এবং তা হওয়া সাপেক্ষে খাজনা, সেস বা ঋণ আদায়ও সরকার স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যান্য অঞ্চলে খাজনা আদায় হবে বটে, কিন্তু আপাতত সার্টিফিকেট সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

খরা অঞ্চলে জল সরবরাহ

খরা অঞ্চলে, বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় জরুরী জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। বাকি জেলা-গুলিতে জরুরী জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য জেলা-প্রতি এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার

চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা প্রসারের জন্য মাত্র এক মাসে ৬৮ লক্ষ টাকা খরচ মঞ্জুর করেছেন যুক্তফ্রণ্ট সরকার।

শীতকালীন ভাতা

কার্সিয়াং, দার্জিলিং, কালিম্পং এই পার্বত্য মিউনিসিপ্যালিটীগুলির কর্মচারীদের শীতকালীন ভাতার দাবী এই প্রথম মঞ্জুর হল। ভাতার বিগত আর্থিক বছরের সমস্ত খরচই সরকার বহন করবেন। ভবিষ্যতে এই খরচের শতকরা ৮০ ভাগের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন।

পৌর সংস্থার নির্বাচন

বালী এবং হাওড়া কর্পোরেশনসহ ২৫টি পৌর সংস্থায় কমিশনারগণের নির্ধারিত কর্মকাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার নতুন করে কমিশনার নির্বাচনের কাজ ধামাচাপা দিয়েছিলেন। এছাড়া, কতকগুলি পৌর সংস্থা বাতিল

করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মাধ্যমে কাজ চালান হচ্ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার এইসব পৌর সংস্থায় আশু নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যেই ২৫টি পৌর প্রতিষ্ঠানের কমিশনার নির্বাচনের দিন স্থির হয়ে গেছে। মে মাস থেকেই নির্বাচনের কাজ শুরু হবে।

তাঁতশিল্পীর সুবিধা

নিয়মিত সুতার সরবরাহ না পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের চার লক্ষ তন্তুবায়ী দীর্ঘকাল ধরে রুজি-রোজগারের যে তীব্র অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণের ফলে তন্তুবায়ীরা খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থা ও শীর্ষ সমবায় সমিতি এই দুটি সংগঠন কল্যাণী স্পিনিং মিলে উৎপন্ন তাঁত-শিল্পের উপযোগী সুতোর সমস্তটাই তুলে নিয়ে তন্তুবায়ীদের ন্যায্য মূল্যে বিতরণের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উক্ত সংস্থা দুটির এবং সরকারের মতামত না নিয়ে মিল কর্তৃপক্ষ দামের কোন পরিবর্তন করতে পারবেন না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

সরকার উপলব্ধি করেন যে, জটিল উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান খুব অল্পদিনে সম্ভব নয়। কিন্তু এখনই যে-কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব, তার মধ্যে অন্যতম হল : কলোনীগুলিতে ন্যূনতম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান। তদনুসারে সরকার-অনুমোদিত কলোনীগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সহজসাধ্য করা হয়েছে। এছাড়া, জবরদখল কলোনীগুলিতে পূর্বে যে অর্পণ-পত্র দেওয়া হত, তার বদলে উদ্বাস্তুদের সুবিধার জন্য নতুন ধরনের অধিকার-পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

ফরাক্কা বাঁধ

ফরাক্কা প্রকল্পের কাজে অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ১৯৭১ সালের জুন মাসের মধ্যে ফরাক্কার কাজ শেষ করতেই হবে এবং তার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, হলদিয়া বন্দরের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম

যে গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক শাসনের আশায় পশ্চিমবাংলার মানুষ যুক্তফ্রন্টের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা উপলব্ধি করেন যে, এই কাজ সম্পন্ন করতে গেলে প্রাথমিক কর্তব্য হল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। যে কুখ্যাত কালা কানুন বা নিরাপত্তা আইনের বলে গত ১৭ বছর যাবৎ জনগণের ভাগ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশীর উপর নির্ভরশীল ছিল, মন্ত্রিসভা সেই আইনের অবসান ঘটিয়েছেন। তাছাড়া, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলে নিবর্তনমূলক আটক আইনবলে ধৃত সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন। গত বছর খাদ্য বিক্ষোভ সম্পর্কে যাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে

মামলা শুরু করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৯ জন ছাড়া সকলের ক্ষেত্রেই মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এই ৯ জনের বিরুদ্ধেও অভিযোগগুলি পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-বিক্ষোভ সম্পর্কে সমস্ত মামলাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

সরকারী কর্মচারীদের অধিকার স্বীকৃত

কংগ্রেসী আমলে সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত হবার অধিকার কোনদিনই স্বীকৃতি পায়নি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বিনা দ্বিধায় সরকারী কর্মচারীদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া, কর্মচারীদের সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের উপর প্রতিশোধমূলক আচরণ করে যে ৩২ জন কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ২৮ জনকে যুক্তফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই নিজ নিজ পদে পুনর্বহাল করেছেন—বাকী ৪ জনের পুনর্নিয়োগের প্রশ্নও বিবেচনা করা হচ্ছে।

মেদিনীপুরের কালেক্টরেট অফিসে এবং রাইটার্স বিল্ডিংস-এ তদানীন্তন সরকারের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর কিছু সময়ের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করার ফলে যেসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

শুধু সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই নয়, স্টেট বাসের কর্মীরা ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করলে যে ৬০০ জন কর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তাঁদের প্রত্যেকের উপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এবং সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

নাট্য সংস্কৃতির শৃঙ্খলমোচন

দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক কর্ম-প্রেরণাকে বন্ধনমুক্ত করতে সরকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সেজন্য মন্ত্রিসভা জানিয়ে দিয়েছেন যে, নাটক মঞ্চস্থ করার আগে পুলিস কর্তৃপক্ষ বা জেলা-শাসকের অনুমোদনের কোন প্রয়োজন নেই।

শ্রমিক স্বার্থ

ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিসের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে। এতে শ্রমিকদের 'কালেক্টিভ বার্গেনিং'-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, গত এক মাসে ১৩টি শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সে ১৩টি শিল্প হ'ল: ধানকল, ক্ষেত-মজুর, পাথর ভাঙা, লাক্ষা শিল্প, তেল-কল, ময়দা-কল, রাস্তা ও ঘরবাড়ী তৈরী ও মেরামত, মোটর যানবাহন, সিগারেট, কাঁচশিল্প, ডাল-কল, চামড়ার কারখানা এবং দশজনের কম কাজ করে এমন পাওয়ার লুম। তৃতীয়তঃ, শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কন্‌সিলিয়েশন যাতে দীর্ঘদিন ধরে না চলে, তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন কোন কন্‌সিলিয়েশনই তিন মাসের বেশী চলতে দেওয়া হচ্ছে না। চতুর্থতঃ, বেকার সমস্যা নিরোধকল্পে বিভিন্ন জেলায় কর্মসংস্থানের জন্য

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমে শ্রমিকদের বাড়ী দেবার জন্য ইত্যাদি কাজে যতগুলি কমিটি ছিল, সবগুলিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে প্রতিনিধি-স্থানীয় করার উদ্দেশ্যে। পঞ্চমতঃ, ই-এস-আই হাসপাতালগুলিকে পুরোপুরিভাবে আধুনিক হাসপাতালে পরিণত করার জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা নিবারণ

অন্ধ উত্তেজনায় আর প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের প্ররোচনায় অতীতে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার অল্প পরেই কলকাতায় এই ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু নতুন সরকারের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, শুধু পুলিসের উপর ভরসা না করে মন্ত্রীরা নিজেরাই অশান্তি নিবারণের জন্য পথে নামেন। ফলে, মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা শান্ত হয়।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাগমারী, শান্তিপুর ও পুরুলিয়ায় আনন্দমার্গের ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশাসন ও বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ গণতন্ত্রের অন্যতম মাপকাঠি। বর্তমান মন্ত্রিসভা ভারতের সংবিধানের এই নির্দেশকে কার্যে দ্রুত রূপায়ণের জন্য মনস্থির করেছেন।

গভীর নলকূপ

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার অব্যবহিত আগে পশ্চিমবাংলার ১,৩৭০টি গভীর নলকূপের মধ্যে মাত্র ৬৬৫টির বৈদ্যুতিক পাম্প ছিল। পুরো মার্চ মাস এবং এপ্রিলের ১২ তারিখের মধ্যেই ৭৮টি গভীর নলকূপে বৈদ্যুতিক পাম্প সংযোজিত হয়েছে। সরকার আশা করেন, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই ১,৩৭০টি গভীর নলকূপে বৈদ্যুতিক পাম্প সংযোজিত হবে।

শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষকগণ যাতে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত, বদলী প্রভৃতির মাধ্যমে হয়রানি না হন, তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের রাজনৈতিক দলে যোগদান অথবা নিজেদের মধ্যে সংস্থা গঠনের যে মৌলিক অধিকার তা স্বীকৃত হয়েছে। অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকরা যাতে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ছাড়াও পেন্সন পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। যে সমস্ত শিক্ষক অন্ততঃ পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেছেন, শিক্ষকতা কাজে লিপ্ত থাকাকালে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর বিধবা স্ত্রী ও সন্তানেরা যাতে গ্রাচুইটি অথবা ফ্যামিলি-পেন্সন পেতে পারেন, তারও ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রশাসনিক রদবদল

বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সাহসের সঙ্গে রদবদল করে সরকার আমলাতান্ত্রিক অচলায়তনকে সচল করার চেষ্টা শুরু করেছেন এবং তা জনসাধারণের সমর্থন পেয়েছে। এ-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

খাদ্য সমস্যা

এ-বছর পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির দরুন ফসল কম উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু লোকসংখ্যা গত বছরের চেয়ে বেড়েছে। এ-অবস্থায় খাদ্য-সমস্যা আগের বছরের তুলনায় জটিলতর। তার উপর বছরের গোড়ায় ফসল ওঠার মরশুমে কংগ্রেস সরকার আভ্যন্তরীণ সংগ্রহে জোর দেননি। ফলে, সামান্য খাদ্যশস্যই সংগৃহীত হয়েছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে কার্যভার গ্রহণ করে ইতিমধ্যেই একদিকে আন্তর্জেলা ও জেলার অভ্যন্তরস্থ কর্ডনিং ব্যবস্থা এবং উৎপীড়নমূলক লেভি প্রথা বাতিল করে দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষকে অনেক বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত করেছেন, অপরদিকে কৃষককে ন্যায্য দাম দিয়ে ধান সংগ্রহ করার নীতি গ্রহণ করে দাম মণ-প্রতি ৫ টাকা বাড়িয়ে ধানের দাম ১৬-১৭-১৮ টাকার বদলে ২১-২২-২৩ টাকা এবং চালের দাম ৩৫-৩৬·৫০ এবং ৩৮ টাকা ধার্য করেছেন। ধান বা চালের সংগ্রহ-মূল্য বাড়ানো সত্ত্বেও রেশন-এ যে-চাল দেওয়া হয়, তার দাম বাড়ানো হবে না বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

এছাড়া, খাদ্যশস্য সঞ্চয় ও সরকারের কাছে বিক্রয় করা ইত্যাদি সম্পর্কে এমন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে ২ লক্ষ টন চাল অথবা ৩ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করার লক্ষ্যে পেঁছানো যাবে বলে আশা করা যায়। যদিও জনসাধারণ যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন, কিন্তু কিছু কিছু বড় জোতদার সরকারের ধান সংগ্রহ-নীতির সঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তে সহযোগিতা করছেন না—এটা উপলব্ধি করে সরকার এক আদেশ জারী করেছেন যে, সেচ অঞ্চলে ১০ একরের উপর বা সেচবিহীন অঞ্চলে ১২ একরের বেশী জমি যাদের আছে, তারা পরিবারের প্রত্যেকের জন্য বছরের ১২ মণ ধান এবং বীজের জন্য একর-প্রতি ২ মণ ধান রেখে বাকী সমস্তটাই সরকারের কাছে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য। ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ধানকলগুলিকে যে ধান সরবরাহ করবে, তার সমস্তটাই ১·৫০ মণ-পিছু ২ টাকা বানি নিয়ে সরকারকে চাল হিসেবে দেবে।

সরকার যে খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছেন, তার রূপায়ণ কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্যে সরকার জেলা থেকে অঞ্চল পর্যন্ত সকল দলের প্রতিনিধি নিয়ে খাদ্য কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মন্ত্রী ও নেতারা নিজেরা গিয়ে খাদ্য সংগ্রহ অভিযানকে শক্তিশালী করেছেন।

জনসাধারণই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক। এই অভিযানে জনগণই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

সরকার নতুন। তার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং সকল বিভাগের কাজেকর্মেই ভুল-ত্রুটি হতে পারে সে-কথা সরকার বোঝেন। জনসাধারণের কাছে সরকারের প্রার্থনা যে, তাঁরা যেন নির্ভয়ে ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করেন এবং সংশোধনের পরামর্শ দেন। সরকার অকুণ্ঠচিত্তে আশ্বাস দিতে পারেন যে, সমস্ত পরামর্শই ভাল করে বিবেচনা করে দেখা যাবে।

পরিশিষ্ট—৬

দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সাফল্যের দাবি

(যুক্তফ্রণ্ট সরকার ১৯৭০ সনে "এক বছরের সাফল্য" নামে প্রচার দফতর থেকে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য ইংরেজিতে। সেই পুস্তিকার সারাংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হল।)

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে প্রগতিশীল শক্তিগুলি দানা বেঁধে উঠছিল, পশ্চিম-বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার সেই শক্তিরই জয়ের সূচনা। কোয়ালিশন সরকারকে এক কঠিন পরীক্ষা, টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়। জনগণের ইচ্ছায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা। জনগণ তাঁদের দাবি মেটানোর হাতিয়ার হিসাবেই এই সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। বর্তমানের সংবিধানের বেড়াজালের মধ্যেই এই সরকার সাধ্যমত জনগণের সেবা করে যাবে। ফেডারেল সংবিধানে ব্যয় বরাদ্দ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতি দায়িত্ব অর্পণের মাত্রা অনুযায়ীই হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের সংবিধান অনুসারে, ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অধিকাংশ চাপটাই পড়ে রাজ্য সরকারের উপর; যদিও রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কদাচিৎ বাড়ে। অন্যদিকে অধিক হারে রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলি, বিশেষত ক্রমোন্নত শিল্পের ক্ষেত্রে, প্রায় সবই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার সংবিধান সংশোধনের জন্য চাপ দেবে, যাতে রাজস্ব বণ্টন অর্পিত দায়িত্বের মাত্রা অনুযায়ীই হয়।

দেশের জাতীয় আয় গত বিশ বছরে বেড়েছে শতকরা ৯১ ভাগ। গত ১৯৪৮-৪৯ সালে মূল্যমান অনুসারে গত ১৯৪৮-৪৯ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৮,৬৫০ কোটি টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৬,৫৪৪ কোটি টাকা। বিশ বছর আগে, ১৯৪৮-৪৯ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২৯৬·৬ টাকা আর ১৯৬৮-৬৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৩১৭·৫ টাকা, অর্থাৎ বেড়েছে শতকরা মাত্র ২৭ ভাগ। দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে সেই হারে কোনদিক থেকেই জাতীয় উৎপাদন বাড়েনি। শহরে-গ্রামে বেকার এবং আধা-বেকার বেড়েছে ব্যাপক হারে। এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল গত বিশ বছরে যে সব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করেছেন এবং উন্নয়নের কর্মসূচি নিয়েছেন তা একের পর এক ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রের ঘোষিত নীতির সঙ্গে কাজের মিল নেই। ঘোষিত নীতি ছিল সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ গড়ে তোলা। কিন্তু একদিকে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ জমা হয়েছে, অন্যদিকে জনগণের জীবনযাত্রার

মান নিচে নেমে গিয়েছে। এই জিনিস চিরদিন চলতে দেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য যা কিছু বদলানোর দরকার তা দ্রুত করতে হবে।

রাজস্ব আদায় এবং খরচ

চলতি বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ সালে সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ধরা হয় ২৬৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। গত জুলাই মাসে বাজেট ধরা হয়েছিল ২৩০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৩৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। সংশোধিত বাজেটে মোট খরচের অঙ্ক দাঁড়ায় ২৪৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা আর আগের বাজেটে ওই অঙ্ক ছিল ২৮২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। খরচের অঙ্ক বাড়ে ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

১৯৭০-৭১ সালে বাজেটে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ধরা হয় ২৭৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ধরা হয় ২৮৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

১৯৭০-৭১ সালে বাজেটে মূল খরচ ধরা হয়েছে ২৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। গত ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বাজেটে ধরা হয়েছিল ২৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।

যে গুরুত্বপূর্ণ খাতে খরচ ধরা হয়েছে সেগুলি হল : (১) জমিদারী প্রথা বিলোপের দরুণ জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি বাবদ ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা, (২) প্রধানত গভীর নলকূপ, উত্তোলন সেচ এবং বীজ খামারগুলির উন্নয়ন বাবদ ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, (৩) অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের আংশিক মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ, শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, বিভিন্ন সমবায় সংস্থা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ও শিল্প সংস্থা পরিচালক বাবদ ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, (৪) ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী নদী প্রকল্প বাবদ ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, (৫) দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের জন্য ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, (৬) বিভিন্ন সেচ এবং পয়ঃপ্রণালী প্রকল্পে ৪৩ লক্ষ টাকা, (৭) রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, (৮) বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণের কাজ করার জন্য ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা, (৯) শিল্প শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্পে ভরতুকি হিসাবে ৩০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ভাড়া করা বাড়ির প্রকল্পে ৫০ লক্ষ টাকা (১০) লবণ হ্রদ উদ্ধার প্রকল্পের জন্য তিন কোটি টাকা, (১১) বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাবদ ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং (১২) গৃহহীনদের পুনর্বাসন কর্মসূচির জন্য ৭২ লক্ষ টাকা।

পঞ্চম অর্থ কমিশন

কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি মেনে নিয়েছেন। এর ফলে কেন্দ্র কর বাবদ যে অর্থ আদায় করে থাকেন তার থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য পাঁচ বছরে (১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ১৯৭৩-৭৪) পাওয়া যাবে মোট ২৯৬.৬৪ কোটি টাকা। এ ছাড়াও, সংবিধানের ২৭৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ গ্র্যান্ট ইন এড হিসাবে পাবে ৭২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা।

পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ পাঁচ বছরে পাবে

৩৬৯ কোটি টাকা। আর চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়েছিল ১৯৭ কোটি টাকা। বাড়লো প্রতি বছরের জন্য ৩৪ কোটি টাকা করে। বাস্তবিকপক্ষে গত ১৯৬৫ সাল থেকে মহার্ঘ ভাতা প্রভৃতি বাবদ রাজ্য সরকারের খরচ বেড়েছে বছরে ৫৩ কোটি টাকা করে। গত মার্চ (১৯৬৯) মাস থেকে কেন্দ্রের হারে মহার্ঘ ভাতাও মঞ্জুর করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পঞ্চম অর্থ কমিশনের কাছে এক স্মারক-লিপিতে স্ট্যান্ডিং অর্থ কমিশনের দাবি জানানো হয়েছে। যাতে রাজ্যগুলির বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনার বহির্ভূত আর্থিক প্রয়োজন পর্যালোচনা করে দেখা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের যেমন পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা বহির্ভূত আর্থিক প্রয়োজন পঞ্চম অর্থ কমিশন মেটাননি। স্বভাবতই এর জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা শেষ হয় ১৯৬৫-৬৬ সালে। চতুর্থ যোজনা চূড়ান্ত না হওয়ায় পর পর তিন বছর বার্ষিক যোজনায় কাজ হয়। ওই তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল: ১৯৬৬-৬৭ সালে ৫৩·০৩ কোটি; ১৯৬৭-৬৮ সালে ৫১ কোটি এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ৫৭·৪২ কোটি টাকা। আশা করা যায় চতুর্থ যোজনা কার্যকর হবে চলতি বছর থেকে। যদিও এখনও পর্যন্ত জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ নতুন খসড়াকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেননি।

তৃতীয় যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩০৭·৭৪ কোটি টাকা। চতুর্থ যোজনায় ৬০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হবে বলে ধরা হয়েছিল। দেখা গেল, খসড়ায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৩২০ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হতে চলেছে। এর মধ্যে কেন্দ্র দেবেন ২২৯ কোটি টাকা। বাকি ৯১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে সংগ্রহ করতে হবে। এর মধ্যে ৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে পাঁচ বছরে অতিরিক্ত কর ধার্য করে।

শেষ পর্যন্ত যোজনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার অবস্থা যা দাঁড়ায়, তা হল : (১) যোজনা কমিশন কেন্দ্রের সাহায্যদান সম্পর্কে যে আশ্বাস দিয়েছেন তা থেকে ২২১ কোটি টাকা, (২) আলাপ আলোচনা চালিয়ে এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ সংগ্রহ এবং (৩) অতিরিক্ত কর ধার্য করে ৭০ কোটি টাকা তোলা হবে। সব মিলিয়ে দাঁড়াবে ৩২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

পে কমিশন গঠন

গত ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার পে কমিশন গঠন করেন। কমিশনকে বলা হয় বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন হারের কাঠামো পরীক্ষা করে তাঁদের সুপারিশ করতে। স্পন্সর্ড এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ওই সুপারিশগুলির কার্যকারিতা বিবেচনা করতে

অনুরোধ করা হয়। দুঃখের বিষয়, কমিশন সর্বসম্মত কোন একটি রিপোর্ট পেশ করতে পারেননি। কমিশন রিপোর্ট দেন ১৯৬৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। আলাদা আলাদাভাবে তিন দফা সুপারিশ করা হয়।

বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখার পর রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই মত ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে এককালীন হিসাবে ৯ কোটি টাকা ধরা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি : কৃষি থেকেই আমাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জাতীয় আয় হয়ে থাকে। অথচ আশ্চর্য, বিগত তিনটি যোজনায় কৃষিকে সেইভাবে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বলতে গেলে কৃষির প্রতি অবহেলা ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম দুর্বলতা, আর তার জন্যে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর জন্য প্রচুর বিদেশী মুদ্রা জলে যাচ্ছে।

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দু বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বাবলম্বী করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার সার কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার নীতি কার্যকর করতে শুরু করেছেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯৭০-৭১ সালে ধরা হয়েছে ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে শুধু চালের উৎপাদন ৭১ লক্ষ মেট্রিক টন।

সেচ: ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী এবং দামোদর উপত্যকা—এই তিনটি বৃহৎ সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৮-৬৯ সালে খরিফের মরশুমে ১৪,১৫,০০০ একর এবং রবির মরশুমে ৮০,০০০ একর জমিতে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরে কংসাবতী প্রকল্পের মাধ্যমে খরিফের মরশুমে ৩·১০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা যাবে। লক্ষ্যমাত্রা হল ৮ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা। ছোট, বড় এবং মাঝারি সব রকম সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৯-৭০ সালে দাঁড়াবে ১৭·৬৩ লক্ষ একর।

এ পর্যন্ত ১,৫৪৩টির মধ্যে ১,৩৭৩টি গভীর নলকূপ বিদ্যুৎ চালিত করা হয়েছে। এছাড়া ৫৫৩টি পাম্পে নদী থেকে জল তুলে সেচের কাজ হচ্ছে। কৃষি জমিতে ১৯৬৮-৬৯ সালে ১১,৫০০ অগভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে এবং ১৯৬৯-৭০ সালের কর্মসূচিতে ২০ হাজার অগভীর নলকূপ খনন করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। অবশ্য এর সাফল্য মূলত নির্ভর করছে ব্যাংক থেকে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার উপর।

খাদ্য সরবরাহ : যদিও ১৯৬৯ সালে খাদ্যশস্যে পশ্চিমবঙ্গের বিরাট একটা ঘাটতি ছিল, কেন্দ্রের সরবরাহও নামমাত্র, তবুও রাজ্য সরকারের সঠিক কয়েকটি ব্যবস্থার জন্য বাজার নিয়ন্ত্রিত ছিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য খুব একটা বাড়েনি। শুধু বিধিবদ্ধ রেশনেই ৮৫ লক্ষ লোককে ৯৫০ গ্রাম চাল এবং ১,৬৫০ গ্রাম করে গম দেওয়া হচ্ছে।

চলতি খারিফ বছরে খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্য বাড়িয়ে ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

পশুপালন এবং উন্নয়ন : হরিণঘাটায় দুধের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে গবেষণা-প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। পাঁচ বছরে এর জন্য খরচ

ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকার মেদিনীপুর জেলার শালবনীতে ৫০ হাজার একর জমিতে পশুপালন কেন্দ্র এবং পশুখাদ্যের খামার গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনার কাজ শুরু করছেন।

মাছ : রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের জলাশয়গুলির উন্নয়ন, ট্রলার দিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, সমুদ্রে নৌকায় মাছ ধরা প্রভৃতি পরিকল্পনার মধ্যে মাছের ঘাটতি মেটানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। ২৪ পরগণার রায়চকে একটি পোতাশ্রয় নির্মাণের উপযুক্ত স্থান কলকাতা পোর্ট কমিশনারস নির্দিষ্ট করেছেন। কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রকের অনুমোদনও পাওয়া গিয়েছে।

শিক্ষা : পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বিনা বেতনে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শহরাঞ্চলে এই ব্যবস্থা আরও চারটি পৌর এলাকায় মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয়মুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিলির কাজও শুরু করেছেন। গ্রামাঞ্চলে ১৪৫০ এবং কলকাতায় ৫০টি নতুন বিনাবেতনের প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে। যে সব গ্রাম অনুন্নত এবং যেখানে কোন স্কুল নেই সেখানে ৬০০ স্কুল বাড়ি তৈরির জন্য অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য : পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে হাসপাতালগুলির শয্যা-সংখ্যা ছিল ৩৭,৩০০। গত এক বছরে ৭০০টি নতুন শয্যার ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করা যায় ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে আরও এক হাজার বাড়ানো যাবে।

শিল্প উন্নয়ন : বন্দর, খনিজ সম্পদ এবং অন্যান্য যা শিল্প প্রসারের জন্য দরকার পশ্চিমবঙ্গে তার কোন অভাব নেই। নতুন শিল্প গঠনের পরিকল্পনা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে যে সব কল-করখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেগুলি বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যও একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে।

বন : কাগজ শিল্পের জন্য ১৯৭০-৭১ সালে ৫০০ হেক্টর এলাকায় বাগিচা গড়ে তোলা হবে। বনজ সম্পদের উন্নতির জন্য আরও কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান : বেতন হারের কাঠামো সংশোধনের ফলে চা, পাট, সুতাকল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ শ্রমিক বছরে কুড়ি কোটি টাকা লাভবান হয়েছেন। তবে কর্মসংস্থান পরিস্থিতির গত বছরের তুলনায় এবছর অবনতি ঘটেছে।

বিধান পরিষদ বিলোপ

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে বড় পদক্ষেপ হল ৩২ দফা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বিধান পরিষদ বিলোপের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা। যুক্তফ্রন্টের ভাষায় বিধান পরিষদ চালানো শ্বেতহস্তী পোষার খরচ চালানো। বিরোধী দলের সদস্য থাকার সময় বর্তমান যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলি দীর্ঘদিন ধরে এ সম্পর্কে ক্ষোভপ্রকাশ করে আসছিলেন।

অবশেষে সেইদিন এল ১৯৬৯ সালের ২১শে মার্চ। ভারতের প্রথম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে সর্বসম্মত প্রস্তাবে বিধান পরিষদের অবসান ঘটল। আয়ু শেষ

হল ১লা আগস্ট। আর এর দরুণ বছরে খরচ কমল সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে।

পশ্চিমবঙ্গ আর একটি বিষয়ে পথিকৃতের কৃতিত্ব অর্জন করল, সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং শপথ ঠিকমত রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা খুঁটিয়ে দেখার জন্য কমিটি নিয়োগ।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কাজটি সর্বপ্রথম করেছেন তা হল অতীতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে ছাঁটাই সরকারী কর্মচারীদের পুনর্বহাল। চোদ্দ বছর আগে দাবি আদায়ের জন্য অনশন করার অপরাধে বরখাস্ত ২০২ জন পুলিস কর্মচারীকেও পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অভিনব। তা ছাড়াও প্রায় এক হাজার ঘটনা সম্পর্কে দশ হাজার লোকের বিরুদ্ধে পুলিস কেস ছিল। তাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। যুক্তফ্রণ্ট সরকার ওই সমস্ত মামলা তুলে নেন।

যুক্তফ্রণ্টের ৩২ দফা কর্মসূচির অন্যতম কর্মসূচি ছিল প্রকাশ্য স্থান এবং সরকারী ভবন থেকে ব্রিটিশ শাসকদের মূর্তি অপসারণ। এই কর্মসূচি কার্যকর হয় ১৫ই আগস্টের আগেই। কয়েকটি সরকারী নাম এবং স্থান ছিল ব্রিটিশ শাসকদের নামানুসারে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার তার জায়গায় নামকরণ করলেন বাংলার কৃতি সন্তানদের নামে।

ব্রিটিশ শাসকদের মূর্তির জায়গায় বাংলার বিপ্লবী, মনীষী এবং কৃতিবিদদের মূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

২৪ পরগণার গড়িয়ায় বৃদ্ধ এবং নির্যাতিত অক্ষম রাজনৈতিক কর্মীদের থাকার জন্যে নতুন বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

কৃষকদের জন্যে জমি

কৃষক শ্রেণীর স্বার্থে ভূমি সংস্কারের কাজ যুক্তফ্রণ্ট সরকার ১৯৬৭ সালেই শুরু করেছিলেন। আবার সেই ভূমি সংস্কারের প্রচেষ্টা চলে ১৯৬৯ সালে। যদিও ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল, সিলিং এবং অন্যান্য ব্যাপারে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি। বেনামী জমির অনেক সন্ধান পাওয়া গেল। প্রায় দু লক্ষ একর কৃষি জমি ইনজাংশনের দরুণ দখল নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ প্রধানত সরকারী কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ এবং সংগঠিত জনসাধারণের উদ্যোগের অভাব। যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ছ মাসের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার একর জমির দখল নিয়েছেন এবং আড়াই লক্ষ একর জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছেন। সরকার বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ, বেআইনীভাবে জমি হস্তান্তর বন্ধ এবং বেনামী জমি খুঁজে বের করার দিকে অভিযান চালিয়েছেন।

এর ফলে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সরকার তিন লক্ষ একর জমি খাস দখলে এনেছেন। যুক্তফ্রণ্ট সরকারই প্রথম ভাগচাষী এবং বর্গাদার উচ্ছেদ আইন করে বন্ধ করেছেন। কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে সরকার ফসল তোলার মরশুমে কোনরকম হাঙ্গামা হতে দেননি।

কৃষকদের তিন একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব ফ্রণ্ট সরকারের আর একটি বড় অবদান।

সমবায়ের পথে

পশ্চিমবঙ্গের ৩৮,৫৩০টি গ্রামের মধ্যে কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতির সংখ্যা মাত্র ১২,৮৪৫। এর বেশির ভাগই সক্রিয় নয়, বাকিগুলি চালিত হয় কায়েমী স্বার্থের দ্বারা। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলন মূলত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। সমবায়ের আওতায় পড়ে জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ। এর মধ্যে ১৯ ভাগ কৃষি সমবায়। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আইনের সংশোধন করা হবে।

সরকার চান, (১) ঋণগ্রহীতা আগের ঋণ শোধ করে আবার ঋণ নিতে পারবেন, (২) ছোট চাষী এবং বর্গাদারদের ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (৩) ঋণের জন্য আবেদনপত্র সম্পর্কে নতুন ব্যবস্থা এবং (৪) স্বল্প মেয়াদী কৃষিঋণকে ব্যাপক শস্যহানি (শতকরা ৫০ ভাগের বেশি) ঘটলে মাঝারি ধরনের ঋণ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হবে।

সমবায় আইন এমনভাবে সংশোধন করা হচ্ছে জমি বন্ধকী ব্যাংকগুলি থেকে গরীব চাষীদের যাতে ঋণ দেওয়া যায়।

সমাজ উন্নয়ন

সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্ট সরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট মহিলা সমিতিকে মহিলাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য ৪০০ থেকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ সাহায্য দিয়েছেন।

এছাড়া গ্রামের যুবসমাজের কল্যাণের জন্য ২০০ ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে ৪০০ থেকে ১,০০০ টাকা করে।

মজুতদারী নয়, অনাহারও নয়

জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, তার সঙ্গে ভুল কৃষিনীতির পরিণতি হিসাবে বিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ঘাটতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। রাজ্যকে নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রের সরবরাহের উপর। ১৯৬৯ সালে ঘাটতি খাদ্যশস্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে। এর মধ্যে কেন্দ্রের সরবরাহ পাওয়া যায় ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন। কেন্দ্রের সরবরাহ এবং রাজ্যের নিজের সংগ্রহের পর যে ঘাটতি থাকে তা মেটানোর জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকার কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। ফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিধিবদ্ধ রেশনে মাথাপিছু চালের বরাদ্দ প্রতি সপ্তাহে ৮৫০ থেকে বাড়িয়ে ৯৫০ গ্রাম করেছেন।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ

চলতি খারিফ বছরে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন। বড় বড় উৎপাদনকারীর উপর লেভি ধার্য করা হয়েছে। কর্ডনিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সংগ্রহ ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। উপরন্তু সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে খাদ্য ও রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছে। আশা করা যায়, জনগণের সহযোগিতায় চাল সংগ্রহের লক্ষ্যে পৌঁছানো খুবই সহজ হবে।

১৯৬৯ সালের ১লা নবেমবর থেকে ১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চাল সংগৃহীত হয়েছে ২,৭৪,০৫৫ মেট্রিক টন। গত বছর এই সময়ের মধ্যে হয়েছিল

২,১০,৬৬৬ মেট্রিক টন।

শিল্পোদ্যোগ

বলতে গেলে শিল্পের উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। শিল্পের লাইসেন্স দেবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের। ১৯৬৯ সালে ৬১টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে চারটি নতুন ইউনিট, তিনটি 'রেগুলারাইজেসনে'র জন্য ১৪টি নতুন আর্টিকল এবং ৪০টি সম্প্রসারণের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ওই বছর ৯টি শিল্প অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিতের জন্য আবেদন করা হয়। এর মধ্যে তিনটির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দেন। অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থানান্তরিতের জন্য আবেদন ছিল একটি।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার ১৯৬৯ সালে কয়েকটি অচল কলকারখানা পরিচালনা এবং অর্থলগ্নীর দায়িত্ব নেন। ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবি ফারমার লিমিটেডের নিয়ন্ত্রণের শেয়ার ক্রয় করা ছাড়াও আমেদপুরের ন্যাশন্যাল সুগার মিল পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল এবং আসানসোলের ঢাকেশ্বরী কটন মিলের পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

যুক্তফ্রণ্ট সরকার স্টেট ওয়্যার হাউসিং কর্পোরেশনের সহযোগিতায় তাঁত শিল্পের জন্য শান্তিপুর, ধনিয়াখালি, কোচবিহার এবং আরামবাগে ওয়্যারহাউস নির্মাণের প্রকল্প করেছেন। এতে তাঁতীরা প্রয়োজনে ওয়্যারহাউসে মালপত্র মজুত রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির অগ্রিম পেতে পারবেন।

শিল্প দফতরের প্রচেষ্টায় স্টেট ব্যাংক থেকে দুর্গাপুর এবং বারাসতে ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ শিল্পের জন্য এক কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য একটি পৃথক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ন' মাসের মধ্যে ১৩৪৪টি ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন ইউনিট তালিকাভুক্ত হয়েছে। এতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২০,৪২৯ জনের। আগের ওই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,২৭১ এবং ১৯,৭০১।

শ্রমিক-কর্মচারী : মজুরী বৃদ্ধি

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের অধিকার পেয়েছেন। এই অধিকারকে সংযত করে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পরিচালিত করবার জন্য তাঁরা অধিক পরিমাণে চেতনা সম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার আমলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ জাগরণ নতুন জীবনের স্পন্দন বহন করে আনছে। বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সুনিয়ন্ত্রিত জাগরণ যুক্তফ্রণ্ট শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি।

যুক্তফ্রণ্টের আমলে পাটকল, সুতাকল, চা বাগান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক প্রতি মাসে ১৫ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়তি আয় করতে পেরেছেন। যে পাটশিল্পের মালিকরা ১৯৬৮ সালে এককালীন সাহায্য হিসাবে

২৪ টাকা দিতে রাজী হননি, তাঁরা ফ্রণ্ট সরকারের আমলে অন্তর্বর্তীকালীন বেতন বাবদ ৩০ টাকা করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী মালিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছেন।

ফ্রণ্ট সরকার আপস আলোচনার মাধ্যমে ২,৭১৮টি শ্রমবিরোধের নিষ্পত্তি করেছে।

ফ্রণ্ট সরকারের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে দুটি বিল বিধানসভায় গৃহীত হয়।

একটুকু বাসা

ফ্রণ্ট সরকার গরীব জনসাধারণের জন্যে এককোটি টাকা ব্যয়ে দু হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছেন। বস্তি উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে প্রধানত কায়েমী স্বার্থের বাধায় এবং সরকারী প্রকল্পে নির্মিত ফ্ল্যাটের অত্যধিক ভাড়ার জন্য। শিল্প শ্রমিক এবং চা বাগিচার শ্রমিকদের বাড়ি নির্মাণের ব্যাপারে মালিকদের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

আইন ও শৃঙ্খলা

যুক্তফ্রণ্ট সরকার পুলিসের কার্যপদ্ধতি ঢেলে সাজিয়েছেন। বৃহত্তর জনগণের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থের বদলে পুলিসকে সামাজিক নিরাপত্তা এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে পরিচালিত করা হচ্ছে। দুষ্কৃতকারী, সমাজবিরোধী, চোরাকারবারী, মজুতদার এবং মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ক্ষেত্রে পুলিসের ভূমিকা সক্রিয়।

শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিসের দমননীতি বন্ধ করা হয়েছে। পি ডি অ্যাক্ট বিলুপ্ত হয়েছে। পুলিসের দমননীতির বিভীষিকা থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা একমাত্র এই মন্ত্রিসভার আমলেই রক্ষা পেয়েছেন।

তবু পুলিসের কাজ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত অভিযোগের মোকাবিলা যে করতে হবে—সে সম্পর্কে যুক্তফ্রণ্ট সরকার সচেতন।

নকশালবাড়ির রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর থেকে বহু মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতিকে বন্ধ করার জন্য একাধিক ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মী (তদন্ত) বিল মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান পাসপোর্ট প্রদানের বিষয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীর উপর যে বৈষম্য ছিল তার অবসান ঘটান হয়েছে।

সরকার কলেজ শিক্ষকদের বেতনহার পরিবর্তন করেছেন। ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বেসরকারী কলেজেও ৩০০—২৫—৫০০—৪০—৮০০ টাকার বেতনহার কার্যকর করা হয়। সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের অবসরকালীন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

সীমিত অর্থ নিয়ে বৃদ্ধদের বার্ধক্য ভাতাও দেওয়া হচ্ছে।

ক্রীড়া জগৎ

যুক্তফ্রণ্ট সরকার স্পোর্টস কাউন্সিল পুনর্গঠন করেন। তার সঙ্গে দুঃস্থ খেলোয়াড়দের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি তহবিলও খোলা হয়। ইডেনে স্টেডিয়াম তৈরি করার জন্য প্রাথমিক কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ক্লাব, পর্বত অভিযাত্রী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় এবং রোমাঞ্চকর অভিযানকারীদেরও ফ্রণ্ট সরকার আর্থিক সহায়তা করছে।

উদ্বাস্তু সমস্যা

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ দিয়ে চলেছেন। খাপছাড়া নীতি ত্যাগ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু নীতি গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন।

ত্রাণ ব্যবস্থা

যুক্তফ্রণ্ট সরকার খয়রাতি সাহায্যের চেয়ে টেস্ট রিলিফ বা কর্মসংস্থানের উপর বেশি জোর দেওয়া এবং ত্রাণ কার্যকে উন্নয়নমূলক ও উৎপাদন-সহায়কভাবে নির্বাচন করার নীতি গ্রহণ করেন।

স্বায়ত্ত শাসন

পৌরসংস্থার কর্মীরা যুক্তফ্রণ্টের আমলে আর্থিক দিক থেকে সুবিধা লাভ করেছেন। পৌর সংস্থাগুলিকে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। পৌর প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ৫০ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক মূল্যের জোত কর মুক্ত করা হয়েছে। বার্ষিক মূল্যের প্রথম তিন লক্ষের অতিরিক্ত টাকার উপর পৌর কর—এই যে অন্যায় নিম্নতর হার ব্যবস্থা ছিল তার অবসান ঘটিয়ে বঙ্গীয় পৌর আইনের অধীনে কলকারখানার সম্পদ নির্ণয়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মূল্য ধরবার ব্যবস্থা হয়েছে। পৌর আইন ব্যাপকভাবে সংশোধনের সুপারিশের জন্য দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পরিবহণ সমস্যা

পরিবহণ সমস্যা অত্যন্ত জটিল। তবু সরকারী বাসের কোনও ভাড়া বাড়ান হয়নি। ট্রামের বর্ধিত ভাড়া কিছু কমানো হয়েছে। জলপথকে আবার চালু করার জন্য অন্তর্দেশীয় জল পরিবহণ সেল তৈরি করা হয়েছে।

কর নীতির পরিবর্তন

পশ্চিমবঙ্গের কর নীতিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিগত বছরের তুলনায় আবগারী শুল্কের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

আদিবাসীদের জন্য

সাঁওতাল-প্রধান আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে

প্রাথমিক শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

যুক্তফ্রণ্ট আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তা হল: যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপানের প্রবণতাকে প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগ এবং চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন।

যুক্তফ্রণ্টের আমলে কোর্ট ফি সম্পর্কে সংশোধনের ফলে দেওয়ানী আদালতে ও হাইকোর্টের আদি বিভাগে কোর্ট ফি জমা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নগর দেওয়ানী আদালত ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবির মামলার শুনানী যাতে নিতে পারেন তার জন্য নগর দেওয়ানী আদালতের এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রশাসন থেকে বিচারবিভাগ আলাদা করার কাজ ৫টি জেলায় শেষ হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও চলছে।

পর্যটকদের জন্য বহরমপুরের পর্যটক ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। বিষ্ণুপুরের পর্যটক ভবনের কাজও প্রায় শেষ।

সমস্যাসঙ্কুল মহানগরী

কলকাতা মহানগরীর সমস্যা জাতীয় সমস্যা। শহরের ত্রিশ হাজার বস্তির প্রায় ৭ লক্ষ বাসিন্দার জন্য বাসযোগ্য অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঠিকা ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ রোধের জন্য ঠিকা ভাড়াটিয়া আইন প্রণয়ন করেছেন এই যুক্তফ্রণ্ট সরকার। বস্তির উন্নয়নের জন্যে কাজ চলছে।

আর চলছে নিম্ন আয়ের শ্রমিক কর্মচারীর জন্য নতুন গৃহ নির্মাণের কাজ। সরকারী বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া পাবার জন্য এবং গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ পাবার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে দুর্নীতি ও আত্মীয়পোষণ রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার হুগলি নদীর উপর দ্বিতীয় সেতু প্রকল্পের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

সরকার বাড়িভাড়া আইন সংশোধন করে ভাড়াটিয়াদের উপর বাড়ির মালিকদের প্রাত্যহিক নির্যাতন বন্ধ করেছেন।

পরিশিষ্ট—৭

অজয়বাবুর অপ্রকাশিত বিবৃতি

(১৯৬৭ সনের ২রা অক্টোবর অজয়বাবু পদত্যাগ করবেন বলে স্থির করে-ছিলেন। কেন পদত্যাগ করছেন, কেন মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিচ্ছেন সেইসব কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি একটি বিবৃতিও তৈরী করেছিলেন। সেই বিবৃতিটি ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেবার আর পদত্যাগ করলেন না। তাই বিবৃতিটিও আর প্রচারিত হল না। সেই অপ্রকাশিত বিবৃতি এখানে প্রকাশ করা হল।)

অতীতে ফরওয়ার্ড ব্লক, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি এবং লোকসেবক দলের বেশীর ভাগ সভ্যরাই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন এবং বারে বারে তাঁরা বিভিন্ন কারণে কংগ্রেস ছেড়ে এসেছেন।

তিন বৎসর আগে বাংলা কংগ্রেসের নেতারা এবং তার বেশীরভাগ সদস্যরাও কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে উপদলীয় আধিপত্য ও তার দুর্নীতি এবং হুকুমদারী মনোভাবে ও দলের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে না পেরে তাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে এসে বাংলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

গুর্খা লীগও কংগ্রেস বিরোধী আর একটি দল।

এই সমস্ত দল এবং বাম ও দক্ষিণ কমিউনিস্ট পার্টি, আর এস পি, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার, ওয়ার্কার্স পার্টি, বলসেভিক পার্টি এবং মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি সবাই মিলে গত সাধারণ নির্বাচনে প্রথম সংযুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনে নিজেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

কিন্তু নির্বাচনের পরে দেখা গেল, জনসাধারণ স্পষ্টভাষায় সংযুক্ত ফ্রণ্ট সরকার গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। জনসাধারণের এই ইচ্ছা অনুযায়ীই ১৪টি দল মিলে সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যেকার কতকগুলি দলের মধ্যে মোটামুটি আদর্শগত ঐক্য রয়েছে।

এরা ১৮টি জনহিতকর কার্যসূচীর ভিত্তিতে রাজ্য সেবার উদ্দেশ্যে সমবেত-ভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন করে।

কিন্তু গত ছয় সাত মাস এরা যুক্তভাবে কাজ করে বুঝতে পারল যে বিশেষ করে বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সহযোগীদের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের কথায় ও কাজে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে সংসদীয়

গণতন্ত্রের প্রতি তাদের কোন আস্থা নেই এবং তারা তাদের পার্টির স্বার্থকে
বাড়িয়ে তোলার জন্য মন্ত্রিত্বের আসন এবং বিধানসভাকে ব্যবহার করছে।

এইজন্য তারা অন্যান্য দলের কর্মীদের উপর জোর জুলুম, মারধর, এমন
কী লুঠতরাজ করতেও পিছ-পা নয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি মূল ভিত্তি হল, সরকারী দলের যৌথ দায়িত্ব।
অপর কথায় বলতে গেলে, মন্ত্রী মণ্ডলকে সরকারী সিদ্ধান্তগুলির জন্য পরিপূর্ণ
দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি
নিজেদের মন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রিসভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলিও অমান্য করতে
ইতস্তত করে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে খাদ্যনীতি সরকার সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে, বামপন্থী
কমিউনিস্ট পার্টি—তার সাধারণ সম্পাদক থেকে আরম্ভ করে অধস্তন সাধারণ
কর্মীরা পর্যন্ত—সবাই ইচ্ছা করে, সুপরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমে তার সমস্ত দায়-
দায়িত্ব খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

গণকমিটির নামে এইসব পার্টিগুলি জবরদখল, লুঠতরাজ এবং মারধর শুরু
করে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে।

সুচিন্তিতভাবে তারা শাসনযন্ত্র এবং পুলিসকে এমনভাবে নিরপেক্ষ করে
তোলার চেষ্টা করছে যাতে তাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপগুলি তারা অবাধে
চালিয়ে যেতে পারে। শিল্প বিবাদের নামে তারা ঘেরাও, জোরজবরদস্তী এবং
অন্যান্য বর্বরনীতি প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্পদকে ধ্বংস করেছে।

যেখানে আমাদের প্রয়োজন শিল্পের প্রসার এবং অধিকতর কর্মসংস্থান,
কমিউনিস্টদের কৃপায় সেখানে ৬০।৭০ হাজার লোক আজ বেকার হয়ে পড়েছে।
অসংখ্য ছোট এবং মধ্যম শ্রেণীর শিল্প এবং যে সব শিল্প বাঙালী মধ্যবিত্ত
মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছে, ধার দেনা এবং পরিবারের অলঙ্কার-
পাতি বন্ধক দিয়ে কোনপ্রকারে চালনা করছে, সেই সমস্ত শিল্প আজ প্রায় ধ্বংস
হতে বসেছে।

বামপন্থী কমিউনিস্টদের এক অংশ আবার প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে তারা
জোতদারদের সমস্ত জমির ফসলও জোর করে কেড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ
বাটোয়ারা করে নেবে।

ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি তাদের কোন অনুকম্পা নেই। সেই সমস্ত সম্পত্তি
লুঠ করতে তাদের কোন দ্বিধা নেই। পরন্তু, তারা এইসব কাজ যোগ্যতমূলক
মনে করে এবং তাদের প্রগতিশীল রাজনীতি এবং সমাজতন্ত্রের অঙ্গ মনে করে।

এর চেয়ে গুরুতর কিছু সম্ভবত তারা করতে চায়। চীনাপন্থী বাম কমিউ-
নিস্টরা চীনের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে
চায়।

যদি তাই হয়, তাহলে সমগ্র আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিহারের কতক অংশ
এবং উড়িষ্যা অনেক বৎসর ধরে বিদেশী শক্তিগুলির মারণাস্ত্র নিয়ে লড়াই করার
ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

সহস্র সহস্র ঘরবাড়ী, স্কুল, মন্দির, মসজিদ এবং গির্জা পুড়ে ছাই হয়ে
যাবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর গহ্বরে চলে যাবে, কেউ পিতা মাতা হারাবে,

কেউ আবার সন্তান সন্ততিদের হারাবে, অনেক স্বামী স্ত্রী, আবার অনেক স্ত্রী স্বামীহারা হবে।

কৃষি, শিল্প এবং কলকারখানা সব ধ্বংস হয়ে যাবে, বেকারী বেড়ে যাবে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সমস্ত অঞ্চলটি দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে ভরে উঠবে। এই যুদ্ধের ফলাফল ভাবতেও বিস্ময় লাগে। সমগ্র দেশ আবার বৈদেশিক শক্তির অধীনস্থ হয়ে পড়বে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশই ভ্রমণকারীদের নিজেদের দেশের প্রতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বামপন্থী কমিউনিস্টরা এখানে এমন অবস্থা করেছে যে, বাংলাদেশে ভ্রমণরত মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে আবার একটা অতিবাম দলের উদ্ভব হয়েছে। তারা খোলাখুলিভাবে চীনকে সমর্থন করছে। তারা আওয়াজ তুলেছে :

"মাও-সে-তুঙ্, জিন্দাবাদ"
"মাও-সে-তুঙ্, লাল সেলাম"

এবং চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করে আমাদের দেশের এক ব্যাপক অঞ্চল দখল করে বসে থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী এবং অতিবামপন্থী—উভয় কমিউনিস্টই চীন এবং পাকিস্তানের সহায়তা কামনা করে। তাদের মধ্যেকার মতানৈক্য হল বিপ্লব শুরু করার সময় নিয়ে। বামপন্থী কমিউনিস্টরা মনে করে বিপ্লবের সময় এখনও হয়নি, আর অতি-বামরা মনে করে, সেই সময় এসে গেছে।

বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ৬।৭ হাজারের বেশী অতিবাম সভ্য রয়েছে। পার্টি বিরোধী কাজ করার জন্য এই অতি-বামদের সামান্য কিছু সভ্যকে মাত্র দল থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়েছে।

আমি মনে করি, এইরকম পার্টিকে এবং তার সহযোগীদের সরকারী মন্ত্রীর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে রেখে, দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে আর কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়।

আমি তাই অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং সেই সঙ্গে আমার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করছি।

আমি দেশ-প্রীতির প্রেরণাতেই এই পদত্যাগপত্র পেশ করছি। গত অর্ধ-শতাব্দী ধরে আমি আমার দেশের সেবা করার চেষ্টা করেছি। এই দেশপ্রীতি নিয়েই আমি, আমার দেশের সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক, বিশেষ করে যুবকদের এই কাজের জন্য আমাকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানাই।

আমি তাদের কাছে আরও আহ্বান জানাই, তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমাজবিরোধীদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর প্রতিরোধ করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির সমস্ত প্রচেষ্টাই প্রতিহত করে।

অজয় মুখোপাধ্যায়

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE
CALCUTTA-17

পরিশিষ্ট—৮

মুখ্য ও উপমুখ্যমন্ত্রীর পত্র বিনিময়

জ্যোতি বসুকে লেখা অজয় মুখোপাধ্যায়ের ২৯শে ডিসেম্বরের চিঠি
ডি. ও নং ১৮৪ সি. এম তাং ২৯-১২-৬৯

প্রিয় জ্যোতিবাবু,

গত ২৬শে তারিখ যখন আমি মালদা গিয়েছিলাম, গাজোল থানার ও. সি শ্রীমিহিরেশ বর্মণ এস. পি'র অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর উপর বদলির আদেশ হয়েছে। তিনি আমার কাছে তাঁর কতগুলি ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলেছেন; এবং তাঁর বক্তব্য শুনে তাঁর বদলিকে দুমাসের জন্য স্থগিত রাখার আদেশ দিয়েছি।

আপনার অবগতির জন্য।
আপনার একান্ত
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

৯ই জানুয়ারী (১৯৭০) এস. পি মালদাকে পাঠান অজয় মুখোপাধ্যায়ের বার্তা
মালদার এস. পি'র কাছে অজয় মুখোপাধ্যায়ের বার্তা

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, আই. জি পুলিস (পঃ বঃ), স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিবের নিকট এর কপি পাঠান হ'ল।

সরকারী নিয়ম বিধির ২৯(৩) ধারা প্রয়োগ করে আমি গাজোল থানার ও. সি'র বদলির আদেশ প্রত্যাহারের আদেশ দিচ্ছি। যা আমার পূর্ব আদেশ বলে স্থগিত ছিল। আমার নতুন কোন নির্দেশ ছাড়া তাঁকে উপরোক্ত পদ থেকে সরানো চলবে না।

এই বার্তার কপি উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে দেওয়া হল।

জ্যোতি বসুর অজয় মুখোপাধ্যায়কে ২-১-৭০ তাঃ লেখা চিঠি

প্রিয় অজয়বাবু,

আমি এইমাত্র গাজোল থানার ও. সি শ্রীমিহিরেশ বর্মণের বদলি সম্পর্কে আপনার ২৯শে ডিসেম্বরের ১৮৪ সি. এম নং চিঠিখানি পেয়েছি। তিনি কিছু

ব্যক্তিগত অসুবিধায় পড়েছেন বলে তাঁর বদলি ছ' মাস স্থগিত রাখার আপনার আদেশ বহাল রাখা হয়েছে। কারণ আমি একটি বিপরীত আদেশ দিয়ে জন-সাধারণের কাছে আপনাকে বা রাজ্য সরকারকে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাই নাই। তা হলেও, আমি কতগুলি মৌলিক ঘটনার সঙ্গে আপনাকে পরিচিত করতে চাই যা সম্ভবত আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। রুলস্ অফ বিজনেস অনুযায়ী অধস্তন পুলিস অফিসারদের বদলির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আই. পি. এস অফিসারদের ক্ষেত্রে যে অনুমতি নেওয়া হয় তার চেয়ে এর ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। অধস্তন পুলিস অফিসারদের বদলি করেন এস. পি. অথবা ডি. আই. জি অথবা পুলিসের আই. জি। বিশেষ একজন অফিসারকে বদলি করায় যদি তিনি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং তাঁর অসুবিধার কথা বদলিকারী অফিসার যদি আগে থাকতে না বুঝতে পারেন সে ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি শেষোক্ত অফিসার বা তার ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে তাঁর অসুবিধার কথা জানাতে পারেন। শ্রীমিহিরেশ বর্মণ সঠিক পথে না গিয়ে আপনার কাছে আবেদন করেছেন। আমি ভেবেছি, আপনার পক্ষে সঠিক হ'ত মিহিরেশ বর্মণের আবেদনের উপর কোন আদেশ না দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলছি, যা করেছেন তা আপনার এক্তিয়ারের কিঞ্চিৎ বাইরে। আবেদনটি আমার কাছে পাঠান হলে আমি জানতে পারতাম তার কি অসুবিধা ছিল এবং সেগুলিকে কিভাবে দূর করা যায়। বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে তাতে তাঁর কোন রকম অসুবিধা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আই. জি এবং স্বরাষ্ট্র দফতর এ সম্পর্কে সমান অজ্ঞ। পুলিসের আই. জি অবশ্য শ্রীমিহিরেশ বর্মণ এস. পি'র কাছে যে দরখাস্ত দিয়েছেন তার একটি অনুলিপি এস. পি মালদার কাছ থেকে পেয়েছেন। এই দরখাস্তের মধ্যে এমন কিছু নাই যা শ্রীবর্মণের বদলির আদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এর মধ্যে শাসানি আছে যে বদলির আদেশ রদ না হলে তিনি হাইকোর্টে আবেদন করবেন। সুতরাং আপনি খুব ভালভাবেই বিচার করতে পারবেন, যে অফিসার আপনার আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর সত্যিকার প্রকৃতি এবং চরিত্র কি।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কারণের জন্যই গাজোল থানার ও. সি'র দায়িত্ব থেকে শ্রীমিহিরেশ বর্মণকে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন। বছরের শেষেই অফিসার-দের বদলি করার প্রশস্ত সময় কারণ যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় কোন ক্ষতি না হয় তা দেখা হয়। এই কারণেই শ্রীবর্মণের বদলির আদেশ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি দেওয়া হয়।

যেহেতু শ্রীবর্মণের অসুবিধা কি আছে আমি জানি না, সেজন্য এই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোর আমি সিদ্ধান্ত করেছি। যদি আমি দেখি যে এই অসুবিধাগুলি কাল্পনিক বা অকিঞ্চিৎকর তা হলে তাকে গাজোল থানা থেকে চলে যেতে হবে।

শ্রীবর্মণের মত সরকারের অধস্তন অফিসাররা যদি ঊর্ধ্বতন অফিসারদের আদেশ এড়িয়ে যেতে পারে তবে অধস্তন অফিসারদের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, আমি নিশ্চিত এবং আপনিও আমার সাথে একমত হবেন, ভয়ংকর কষ্টসাধ্য হবে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেককে স্থিরীকৃত সীমার মধ্যে কাজ করতে দেওয়া উচিত এবং

এই সম্পর্কে অপরের অনুপ্রবেশ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আমাদের কেবিনেটের সমস্ত সহকর্মীরা যদি এই নীতি মেনে চলেন তবে ভবিষ্যতে আরো ভাল ভাবে কাজ করা যাবে।

আপনার একান্ত
জ্যোতি বসু

অজয় মুখোপাধ্যায়কে লেখা জ্যোতি বসুর ১২-১-৭০ তারিখের চিঠি

প্রিয় অজয়বাবু,

এস. পি মালদাকে প্রেরিত আপনার বিশেষ বার্তাটি আমি দেখেছি যাতে রুলস্ অফ্ বিজনেসের ২৯(৩) ধারার বিশেষ ক্ষমতা বলে যা আপনি ভেবেছেন —আমি বলব নিশ্চয়ই আপনার এ ধারণা ভুল। গাজোল থানার ও. সি'কে বদলি করার যে আদেশ এস. পি মালদা দিয়েছেন তাকে বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি বুঝতে পারি না এস. পি মালদাকে এ ধরনের একটি বার্তা আপনি কেন পাঠালেন। এর কোন মূল্য আছে? মেসেজে সরকারের কোন নির্দেশ পর্যন্ত নেই। এ ছাড়াও ও. সি গাজোল থানার সম্পর্কে আপনার অযৌক্তিক নির্দেশ আইনগত এক্তিয়ারের বাইরে, যা এই সম্পর্কে আমার আগের চিঠিতে উল্লেখ করেছি। আপনি মনে হয় রুলস্ অফ্ বিজনেসের ২৯ ধারার ৩ উপধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার বলেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে আপনি গোটাটাই ভুল করেছেন।

ঐ বিধিগুলি কেবলমাত্র আইনের প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধিমাত্র, স্বতন্ত্র কোন আইন নয়। কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তে পেঁছবার জন্য নিয়ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে কিন্তু কোন অবস্থাতেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ক্ষমতা দেয় না। যে কোন ক্ষেত্রে শাসন সংক্রান্ত কাজ করতে পারে কেবলমাত্র যাকে বলা হয় 'সরকার' এবং সরকারের অফিসাররা—আলাদা আইন অনুযায়ী। একজন মন্ত্রী এগ্‌জি-কিউটিভ অফিসার নন, এবং তিনি সরকারের প্রতিনিধি রূপেও নিযুক্ত নন। সুতরাং একজন মন্ত্রী নিজ থেকে বৈধ এগ্‌জিকিউটিভ আদেশ দিতে পারেন না। নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী তিনি প্রথমে তাঁর আদেশকে সরকারের আদেশে রূপান্তরিত করবেন—এবং কেবলমাত্র তখনই সেই আদেশগুলি কার্যকর এবং প্রয়োগোপযোগী হবে। রুলস্ অফ বিজনেসে কতগুলি অফিসারের পোস্টিং-এর সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু আপনার স্বাক্ষরযুক্ত কোন নির্দেশে কোন অফিসারকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আপনি বদলি করতে পারেন কি? তা আপনি পারেন না। যদি আপনি এরকম কোন আদেশ জারি করেন এবং বলেন যে এই আদেশের পিছনে আইনের সমর্থন আছে তা হলে তা হবে অর্থহীন বক্তব্য। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এস. পি মালদার কাছে আপনার মেসেজ কেন অর্থহীন হয়েছে। নির্দিষ্ট অফিসারদের সম্পর্কে বিধিগুলিতে বলা হয়েছে কি পদ্ধতিতে তাঁদের নিয়োগ এবং বদলি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কিন্তু বদলি বা নিয়োগের কোন ক্ষমতা মন্ত্রীকে দেওয়া হয় নাই।

২। এখন আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলব। একথা সত্য, আপনি যদি

কোন সিদ্ধান্ত করতে চান সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী এবং প্রয়োগ উপযোগী হওয়ার আগে প্রথমে তাকে সরকারী আদেশে রূপান্তরিত করতে হবে। কিন্তু আপনি কি ও. সি গাজোলের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যিনি স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) দফতরের নিয়ন্ত্রণে এবং যে দফতর আপনার তত্ত্বাবধানে নয়। এস. পি মালদার কাছে আপনার মেসেজে আপনি রুলস্ অফ্ বিজনেসের ২৯ ধারার ৩ উপধারা উদ্ধৃত করেছেন। আপনি যদি এই উপধারাটি পরীক্ষা করেন, আপনি দেখবেন যে এই উপধারায় কেবলমাত্র সরকারের নীতি বা কোন দফতরের জরুরী সরকারী নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারেই আপনাকে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। একটা পুলিস সাব ইন্সপেক্টরের বদলি একটা নীতি সংক্রান্ত ব্যাপার নয়, তেমনি একটা জরুরী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও নয়। আমাদের কাছে আপনি যে চিঠি লিখেছেন তাতে আপনি নিজেই বলেছেন যে, মিহিরেশ বর্মণ কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার জন্যই আপনি তাঁর বদলির আদেশ ছ' মাসের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, এই নির্দেশ স্পষ্টতই অফিসারটির ব্যক্তিগত সুবিধার সঙ্গে খাপ খাইয়েই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে সরকারের কোন রকম গুরুত্বের প্রশ্ন ছিল না। এসব ছাড়া এর মধ্যে জরুরী কী ছিল? আমার বিবেচনার জন্য এ বিষয়টি রাখা যেত। শ্রীবর্মণের বদলির আদেশ নাকচ করার মধ্যে জরুরী কিছু ছিল না। অত্যন্ত সহজ কারণ, প্রথমত আপনার নিজস্ব মূল্যায়ন অনুযায়ী বদলির আদেশকে স্থগিত রাখাই প্রয়োজন ছিল এবং হয়ত বদলির আদেশকে ছ' মাসের জন্য স্থগিত রাখার পর বদলির আদেশ নাকচ করা আদৌ প্রয়োজন হলে আরো চিন্তা ভাবনা করে নেওয়া যেত। এ থেকে দেখছেন যে রুলস্ অফ্ বিজনেসের ২৯ ধারার ৩নং উপধারা আপনি ভুল করে টেনে এনেছেন।

৩। সম্ভবত আপনি যুক্তি দেখাতে আগ্রহী হবেন 'জনস্বার্থে জরুরী ব্যাপার' এই কথার সংজ্ঞার অভাবে এবং সুস্পষ্ট বক্তব্যে যে বিশেষ একটি ঘটনা ঐ বাক্যটির মধ্যে পড়বে কিনা, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার অধিকার সম্পূর্ণই আপনার। মুহূর্তেই মনে হবে এ যুক্তি কত খারাপ। আইনের সঠিক গঠনের মধ্য দিয়ে যদি এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে 'জনস্বার্থে জরুরী ব্যাপার' বা সরকারী নীতি হ'ল যে কোন বিষয় যা মুখ্যমন্ত্রী মনে করবেন তাহলে গোটা আইনটিই অর্থশূন্য হয়ে পড়ত কারণ আইনের গঠনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী সরকারের সমস্ত দফতরের কাজ পরিচালিত করতে পারেন। এই ধরনের বিশ্লেষণ আমি গ্রহণ করতে আদৌ রাজী নই। কেউই যুক্তি দেবে না—এমন কি আপনিও নয়—এই পরিস্থিতি চিন্তা করেই রাজ্যপাল রুল অফ বিজনেস্ গঠন করেছেন। একথা পরিষ্কার যে মুখ্যমন্ত্রী কোনটা জনস্বার্থে জরুরী ব্যাপার বা সরকারী নীতি তা' এক তরফা নির্ধারণ করতে পারেন না। এই সম্পর্কে আদালতের বহু রায় আছে। সুতরাং এখানে এক তরফা সিদ্ধান্ত করার কিছু থাকতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী নিজের খামখেয়ালীতে কোন ব্যাপারকে জনস্বার্থে প্রয়োজন বলে চালাতে পারেন না এবং এই পদ্ধতিতে নিজেকে সরকারের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করতে পারেন না। এ বিষয়টি এমন নয় যা মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব বিচার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় এবং আজকের পরিপ্রেক্ষিতে যে মুখ্যমন্ত্রী কাজ করছেন

তাঁর উপর নিশ্চয়ই নয়।

৪। পূর্ব অনুচ্ছেদে আমি যা বলেছি তার সংগে যদি আপনি একমত না হন এবং আপনি যদি এই মত পোষণ করেন যে, জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজন বা সরকারী নীতি হ'ল যে কোন ব্যাপার যা আপনি ভাববেন, তা হলে আমি আপনাকে আইনের অর্থ সম্পর্কে কেবিনেটের পরামর্শ নিতে বলি, কারণ আমি এ ধরনের বক্তব্য অগ্রাহ্য করি এই জন্যে যে এর মধ্যে মারাত্মক বিপদ আছে। সাংবিধানিক মৌলিক প্রশ্ন জড়িত। উদাহরণ স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার সংগে যে সব দফতর তাঁর নয় সে প্রশ্ন আছে। মুখ্যমন্ত্রীকে একতরফাভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে না। আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের উপর সরকার পরিচালনার ভার আর নেই। এখন কতকগুলি দলের কোয়ালিশন চলছে এবং প্রত্যেকটি দলের কাজের সীমারেখা স্পষ্ট টেনে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো একজন মন্ত্রী তাঁর সংগে সংশ্লিষ্ট নয় এরকম সরকারী কার্য পরিচালনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী অপরের অসাধু পরামর্শে কান দিয়ে যদি ২৯(৩) ধারা বলে সরকারের যে কোন ব্যাপারেই প্রাধান্য দাবী করেন তবে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। সেদিন চলে গেছে। সেদিন যে পদমর্যাদা লাভ করা যেত আজকের দিনে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেননি। যে পরিস্থিতিতে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তা আপনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন। বর্তমান সরকারের কোন মন্ত্রীই অন্য কোন মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতির অপেক্ষা রাখে না, মুখ্যমন্ত্রী দলের প্রধান এই ধারণা এখন আর বৈধ নয় এবং বাতিল করা উচিত। আজকের দিনে কেউই অপরের তুলনায় মুখ্য নন। সুতরাং আপনি যে অধিকার দাবী করেছেন তা এমন যা আপনি দাবী করতে পারেন না। সকলের ঐক্যমতেই সরকার চালাতে হবে। এখানে আপনাকে আমি আমাদের পূর্বকালীন রাজ্যপাল শ্রীধরমভীরার অদৃষ্টে কি ঘটেছে তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার বিশেষ ক্ষমতা রাখেন এবং মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াই তিনি তাঁর একতরফা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। তাঁর এই প্রচণ্ড মোহ কি করে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পরবর্তী কালের ইতিহাস তা দেখিয়েছে। অপরাপর রাজ্যপাল এবং ভারত সরকারও এই ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। রাজ্যপাল ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন এ সম্পর্কে আর কোন কথা এখন আর বলা হয় না।

৫। বৈধতার প্রশ্ন ছাড়াও আমি আপনাকে পুনরায় ভেবে দেখতে বলব এই ঘটনার মধ্যে আপনি নিজে যে পথ অনুসরণ করেছেন তা সঠিক কিনা। এই সম্পর্কে আমি আমার সর্বশেষ চিঠিতে আপনাকে বলেছি যে, গাজোল থানার ও. সি-কে বদলির আদেশ স্থগিত রাখতে হবে, আপনার সে বাসনাকে মেনে নেওয়া হয়েছে কারণ জনগণের কাছে আপনাকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলতে চাই নাই। আমি বলেছি যেহেতু তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধা কি আছে তা আমি জানি না যার জন্য তিনি গাজোল থানা থেকে নড়তে পারছেন না, সেজন্য এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তলব করার সিদ্ধান্ত করেছি। এই চিঠি পাওয়ার পর আপনি অনায়াসেই

আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। এই ধরনের যদি আলোচনা হ'ত তা হলে আমরা নিজেরা মত বিনিময় করতে পারতাম এবং সম্ভবত প্রত্যেকের কাছে সমস্যাটির একটি সন্তোষজনক সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু সমস্যাটি সম্বন্ধে আপনি আমার সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করেন নাই। এমন কি আপনি আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দেননি। আপনি নিজের ধারণার উপর নির্ভর করে সরাসরি এগিয়েছেন (যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই), যে আমার মনোভাব অযৌক্তিক। আপনি উপযুক্তভাবে এস. পি মালদার কাছে মেসেজ পাঠালেন যে গাজোল থানার ও. সি-র বদলির আদেশ নাকচ করা হয়েছে। এই মেসেজে আপনি ২৯(৩) রুলস্ অব্ বিজনেসের ধারার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মেসেজটি পাঠাবার আগে আপনি যদি আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন তবে আপনার আদেশের পূর্ণ অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট ধারার অর্থ নিয়ে আলোচনা করে পরিষ্কার হওয়া যেত। আপনি যদি ভেবে থাকেন যে, সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ত্বরান্বিত আদেশ দেওয়ার আগের দুটি কেবিনেট মিটিং-এ প্রসঙ্গ তুলতে পারতেন। ৫ তাং একটি মিটিং হয়েছে এবং ৮ তাং আর একটি মিটিং হয়েছে। কেবিনেটেও আপনি চুপ করে থাকলেন। আপনার ব্যবহারে সত্যি আমি বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। আমি এর কোন মানেই খুঁজে পাচ্ছি না।

৬। আশা করি আপনি নিজস্ব কাজের পরিণাম বুঝতে পারছেন। আপনার কাজকে সমর্থন করলে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হবে। দেখা দেবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ। আপনি যে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করেছেন তার সুযোগ নিতে অনেকেই আগ্রহী হবে। ঊর্দ্ধতন অফিসারদের আদেশ উপেক্ষা করার ঝোঁক দেখা দেবে অধস্তন অফিসারদের মধ্যে, কারণ তাঁরা ভাববেন যে তাঁদের বিরুদ্ধে গৃহীত কোন ব্যবস্থা সরকারী পরিচালনা বিধির ক্ষমতা বলে আপনি বাতিল করে দেবেন। ফলতঃ ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে আজ আমি তার পূর্বাভাস পাচ্ছি। আপনি আমার কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। কাঁথি থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর এবং কাঁথি থানার ও. সি তাঁদের বদলির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। এই বদলির আদেশ হয়েছে কিনা আমি নিজে জানি না। স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) দফতরে অথবা পুলিসের আই. জির অফিসে এ সম্পর্কে কোন খবর নেই। আপনি যে খবর চান তা সংগ্রহ করে আপনাকে পাঠান হবে। আপনার কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করার একমাত্র কারণ এই যে, আপনাকে দেখানো যে গাজোল থানার ও. সি সম্পর্কে আপনার কাজকে আমরা যদি সমর্থন করি তাহলে ভবিষ্যতে স্বভাবতই এ ধরনের অবস্থা আসতে পারে। অফিসারদের একটা নির্দিষ্ট সময় পরে বদলি করা হয়। সরকারী পরিচালনা বিধির ২৯(৩) ধারার বলে যদি তাদের বদলি স্থগিত রাখতে হয় সরকার তাহলে একটা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

৭। শ্রীমহিরেশ বর্মণ সম্পর্কে একটুখানি এখন বলা দরকার। আপনার কাছে লিখিত আমার আগের চিঠিতেই এর একটু আঁচ দিয়েছি। গাজোল থেকে নড়তে তার ব্যক্তিগত অসুবিধা কি আছে এ সম্পর্কে আমি একটি রিপোর্ট তলব করেছিলাম। তিনি হাইকোর্টে যেতে চান এবং এখন এসব বললে তার মামলার ক্ষতি হতে পারে এই ছুতোয় অসুবিধাগুলি জানাতে তিনি সরাসরি অস্বীকার

করেছেন। এই সেই লোক যাকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তার ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা আপনাকে জানাবেন, কিন্তু জানাবেন না তাঁর কোন উর্দ্ধতন অফিসার বা স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে।

৮। এখন সুস্পষ্ট যে মালদার পুলিস সুপারের কাছে আপনার প্রেরিত বার্তা অপ্রাসঙ্গিক এবং মূল্যহীন। কিন্তু তা হলেও তাকে চ্যালেঞ্জ না করে পারা যায় না।

৯। আমি এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি ব্যাপার উল্লেখ করতে চাই, যা সরকারকে বেশ বে-কায়দায় ফেলেছে। আমি যখন কলকাতার বাইরে সফরে ছিলাম, আপনি আপনার বাংলা কংগ্রেসের একজন সদস্য সুকুমার রায়ের উপর গোপনে নজর রাখার জন্য কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আর সকলের রাজনৈতিক মতবিরোধের দরুন আপনার পার্টি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেও আপনারা তৃপ্ত হন নাই, পুলিসেরও নজরে তাঁকে রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত আমাকে না জানিয়ে নেওয়া ঠিক হয়নি কারণ আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের সিদ্ধান্ত হয় যে কোন রাজনৈতিক সহযোগীর পিছনে কলকাতা পুলিসের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ বা পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগকে ব্যবহার করা হবে না। আপনার কল্যাণে সুকুমার রায় সংক্রান্ত ব্যাপারটি আমাদের সরকারকে বে-কায়দায় ফেলেছে।

১০। দুঃখজনক হলেও এখন আমি মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে, গাজোলের ব্যাপারে আপনার হঠকারী আচরণ পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আপনি আপনার কর্মধারা কেবলমাত্র কার্জন পার্ক থেকে মহাকরণে স্থানান্তরিত করেছেন মাত্র। আপনার প্রকাশ্য সত্যাগ্রহের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র দফতরের মর্যাদাকে খাটো করে রাজনৈতিক লাভ করার কুমতলবে এই প্রচেষ্টা কার্জন পার্কে শুরু হয়। সম্ভবত সরকারী কাজে আপনার হতাশার ফলেই মহাকরণ থেকে চুপি চুপি এ কাজে এগিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র দফতরের ক্ষতি করার চেষ্টা করে রাজনৈতিক লাভ করার কুমতলবে আপনি নিজে সরকারী পদের অপব্যবহার করেছেন। আপনার নিশ্চিত ভেবে দেখা উচিত আপনি বর্তমান পথেই চলবেন, না যুক্তি এবং শুভ বুদ্ধির পথে চলবেন। যুক্তির পথে ফিরে যাবার এখনও সময় আছে। যে সংবিধানগত প্রশ্নগুলি আমি তুলেছি তা নিয়ে এখনও আমরা আলোচনা করতে পারি এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমঝোতায় আসতে পারি।

আপনার একান্ত
জ্যোতি বসু

অজয় মুখোপাধ্যায়কে লেখা জ্যোতি বসুর ১৫ই জানুয়ারীর চিঠি

প্রিয় অজয়বাবু,

মালদা জেলার পুলিসের রুজু করা আটটি ফৌজদারী মামলা তুলে নেবার

জন্য রাজ্য সরকারের আদেশ আপনি সরকারী পরিচালনা বিধির ২৯(৩) ক্ষমতা বলে নাকচ করে মালদার পুলিস সুপারকে যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন সেই প্রসঙ্গেই আমি এই চিঠি লিখছি। আপনি যদি এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতেন আপনি দেখতে পেতেন মালদার এস. পি-কে বার্তা পাঠাবার আপনার কোন প্রয়োজনই হত না। একটা দুঃখজনক ভুলের জন্য সরকার মালদা জেলার এই ৮টি মামলা তুলে নেবার নির্দেশ দেয়। আজ আমার নিজেরও ইচ্ছা এই আটটি মামলা চালিয়ে যাওয়া হোক। কারণ এসব মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিরা স্বভাব-অপরাধী এবং আমার কাছে খবর এসেছে যে এইসব ব্যক্তিরা বাংলা কংগ্রেসের আশ্রয় নিয়েছে। আপনার হয়ত মনে আছে, ৯ই ডিসেম্বর মালদায় একটি জন-সভায় আমি জোর গলায় বলেছি বাংলা কংগ্রেসের সদস্যরা স্বরাষ্ট্র দফতর এবং আমার নিজের রাজনৈতিক পার্টির বিরুদ্ধে ভয়ানক কুৎসা প্রচারে লিপ্ত আছে। তারা এই ৮টি মামলায় জড়িত এবং স্বভাব-অপরাধী বলে বলা হয়েছে তাই জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করেছিলাম যে এই মামলাগুলি চলবে। গুজব ছড়িয়েছিল যে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা এই মামলাগুলি প্রত্যাহারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। সে গুজব বন্ধ করার জন্যই আমি এ কথা বলেছিলাম। মামলাগুলি প্রত্যাহারের ইচ্ছা সেদিনও আমার ছিল না আজও নেই। যে সব মামলা তুলতে হবে, ভুল করে সেই দীর্ঘ তালিকায় এই মামলাগুলিও ছিল। এই ভুলের জন্য আমি সবচেয়ে দুঃখিত। আগেও দু একবার এ ধরনের ভুল হয়েছে। মালদার এই মামলাগুলি সম্পর্কে ভুলটা কেউ যদি আমাকে আগে ধরিয়ে দিত তাহলে মামলা-গুলি যে চলবে এ নির্দেশ আমিই প্রথম দিতাম। এখন আপনি দেখতে পাবেন কি করে সরকারী কার্যবিধির ২৯(৩) ধারাকে অসাধারণ ভাবে (এবং অকার্যকর ভাবে যা ইতিপূর্বেই আপনাকে আমার আর একখানা চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছি) টেনে আনা থেকে রেহাই পেতেন।

২। কোন কোন মহলের ধারণা যে নারী লাঞ্ছনার অভিযোগ সম্বলিত গাজোল থানার দুটি মামলা যার সঙ্গে আমার পার্টির লোক জড়িত বলে বলা হয়েছে, সে মামলা দুটি উপরের মামলাগুলির অন্তর্ভুক্ত। আপনি জেনে সুখী হবেন কিনা জানি না এ মামলা দুটি উপরোক্ত ৮টি মামলার অন্তর্ভুক্ত নয়। সে দুটি প্রত্যাহারের কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং হবেও না। সংবাদপত্রে এবং অন্যত্র আন্দাজে ধরে নিয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে যে মালদার তুলে নেওয়া ঐ ৮টি মামলার মধ্যে নারী লাঞ্ছনার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা দুটিও আছে। এই নারী লাঞ্ছনার কথা তুলে ইতিমধ্যেই বাংলা কংগ্রেস আমার পার্টির বিরুদ্ধে কম লাফালাফি করেনি। এরকম ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল যে নারী লাঞ্ছনা বলে যা বলা হয়েছে সেই মামলায় আমার পার্টিকে অত্যন্ত বেকায়দাজনক অবস্থায় ধরা গেছে এবং সরকারী পদের অপব্যবহার করে আমি মামলা দুটি প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছি। আপনি এখন বুঝবেন আমি আশা করি যে, ঐ অনুমানটাও যেমন ভুল, তেমনি ভুল অনুমানের উপর নির্ভর করে যে ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছিল তাও ভুল।

গোটা ব্যাপারটা নিয়ে বিনা কারণে হৈ চৈ করা হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই এখন একথা বুঝতে পেরেছেন।

৩। এই বলে আমি চিঠি শেষ করতে চাই যে, আমি বুঝতে পারছি না তুচ্ছ সমস্যা, যার সমাধান খুব সহজে হতে পারে তা নিয়ে আপনি কেন অসাধারণ জটিল পদ্ধতিতে সমাধানের চেষ্টা করেন। আমি মনে করি ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সকলে যদি জটিল পদ্ধতি না নিয়ে আলোচনা করার মত আপনি সামান্য বুদ্ধি দেখান অথবা গোড়াতেই সমস্যা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করেন তাহলে অনেক ভাল হবে। যদি এটা করেন তাহলে আপনি দেখবেন যেটাকে আপনি সমস্যা বলে মনে করেন তা আদৌ সমস্যাই নয়।

আপনার একান্ত
জ্যোতি বসু

জ্যোতি বসুকে লেখা অজয় মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

ডি. ও নং ১২ সি. এম	২২শে জানুয়ারী ১৯৭০

প্রিয় জ্যোতিবাবু,

আমি আপনার ডি. ও চিঠিগুলি (নং ৪. পি এল তাং ২-১-৭০, নং ১৩০ পি. এল তাং ১২-১-৭০ এবং নং ১৭৪ পি. এল তাং ১৫-১-১৯৭০) পেয়েছি। হাতে আরো অনেক কাজ থাকায় আপনার চিঠিগুলির জবাব দিয়ে উঠতে পারিনি।

আমি অবাক হয়ে গেছি যে আপনি এই চিঠিগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিয়েছেন, যদিও আপনি এ চিঠিগুলিকে অত্যন্ত গোপনীয় বলে চিহ্নিত করেছেন যার থেকে একথা পরিষ্কার যে চিঠিগুলিতে যে সব ব্যাপার উল্লিখিত ছিল সেগুলি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এবং আপনি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। চিঠির প্রচারমূলক ভাষার থেকে মনে হয় ঐগুলি প্রচারের জনাই লেখা হয়েছে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশের এটাই কারণ বলে মনে হচ্ছে। এই চিঠিগুলি প্রকাশ করার ইচ্ছা পর্যন্ত আপনি আমাকে জানাননি যা সাধারণ ভদ্র রীতি অনুযায়ী প্রয়োজন।

ঐসব চিঠিগুলিতে স্বরাষ্ট্র দফতরের ৮টি ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহারের আদেশ এবং মালদা জেলার গাজোলের ও. সি-র বদলির আদেশকে নাকচ করে আমি যে নির্দেশ দিয়েছি সেই সম্পর্কে আপনি আপত্তি করেছেন। আপনার যুক্তির সমর্থনে যাকে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন বলেছেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন। যেহেতু আমি আপনার যুক্তি মানতে পারছি না সেজন্য একটু বিস্তারিতভাবে জবাব দিচ্ছি।

উল্লিখিত দুইটি নির্দেশ জারি করে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার এক্তিয়ারের বাইরে যাই নাই বা আমার কাজের জন্য স্বৈরাচারী কোন অপরাধে আমি অপরাধী নই। দফতরের মালদা জেলার পুলিসের পক্ষ থেকে রুজু করা ৮টি ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশকে আমার বাতিল করার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আপনার নিজের স্বীকৃতিই প্রমাণ করে। আপনি স্বীকার করেছেন যে এই মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার

সিদ্ধান্ত সঠিক নয় যদিও আপনি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যে "একটি দুঃখজনক ভুলের" জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং ২৯(৩) বিধি মতে মামলাগুলি প্রত্যাহারের নির্দেশকে বাতিল করে আমি যে নির্দেশ দিয়েছি তা সম্পূর্ণ যুক্তি-সংগত। "এটা যে একটি দুঃখজনক ভুল" আপনার এই ব্যাখ্যার উপর আমি আর কোন মন্তব্য করতে চাই না কারণ আপনি খুলে বলেননি এই ভুলের জন্য কে দায়ী অথবা এই ভুল কি করে হ'ল অথবা এই অদ্ভুত ভুলের যথার্থ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেননি।

একজন পুলিস অফিসারের বদলির আদেশ বাতিল করা সম্পর্কে আমার নির্দেশ প্রসঙ্গে ঘটনাটিকে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। আমি যখন মালদা সফরে গিয়েছিলাম, তখন এই পুলিস অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করে তার ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলেন। আমি আরো সংবাদ পেয়েছিলাম যে এই অফিসারটি কতকগুলি ফৌজদারী মামলা তদন্ত করছিলেন সেই তদন্তকে বাধা দেওয়ার জন্য দুরভিসন্ধিমূলক ভাবে এই বদলির আদেশ জারি করা হয়। যেহেতু সংবাদটি আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়, আমি তাই তক্ষুনি এ সম্বন্ধে কিছু করা সিদ্ধান্ত করলাম। এই সময় আমি বদলির আদেশটিকে বাতিল করে দেই নাই কারণ ঘটনাটি সম্পর্কে আমি গভীর ভাবে অনুসন্ধান করি নাই, যদিও আমার সংবাদের সূত্র দায়িত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য ছিল, আপনি বা অন্য কোন সহ-কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করার সময় ছিল না এবং আমি সেই মুহূর্তেই আদেশ না দিলে অফিসারটিকে বদলি হতে হচ্ছে। আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছি যা আমার কাছে সঠিক এবং যথাযথ মনে হয়েছে। কিন্তু আর সকলের কাছে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার জন্য আমি কাগজপত্রে লিখি নাই যে বদলির আদেশ রাজনৈতিক কারণে দেওয়া হয়েছে এবং এই সংবাদ আমি পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট অফিসারটি আমার কাছে তার ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা বলেছে কেবল-মাত্র এটুকু বক্তব্যের মধ্যে আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। কিন্তু আপনি আপনার চিঠিতে আমার নীরবতার সুযোগ নিয়ে যুক্তি তৈরী করেছেন যে ব্যাপারটি একটি নীতিগত বা জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজন ছিল না। বস্তুতপক্ষে এটি উভয়ত ছিল। পরবর্তীকালে আমি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে সন্তুষ্ট হয়েছি যে বদলির পেছনে যে ষড়যন্ত্র আছে এ সম্পর্কে আমি যে সংবাদ পেয়েছিলাম তা সঠিক এবং আমি বদলির আদেশ নাকচ করে দেই। কিন্তু তা হলেও যে কারণের জন্য বদলির আদেশকে আমি নাকচ করতে বাধ্য হয়েছি তা রেকর্ডভুক্ত করতে চাইনি। সুতরাং সরকারী পরিচালনা বিধির ২৯(৩) ধারা বলে আমি বদলির আদেশ বাতিল করে দিয়েছি কেবলমাত্র এই কথা কয়েকটির মধ্যে আমার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। কিন্তু বিধির ২৯(৩) ধারা উল্লেখের মধ্য থেকেই পরিষ্কার যে ব্যাপারটিকে আমি নীতিসংক্রান্ত এবং জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজন বলে গণ্য করেছি। বদলির আদেশের মধ্যে আমার সবকিছু বলার কোন প্রয়োজন নেই। এবং না বলার জন্য আদেশ বাতিল বা অকার্যকরী হবার কোন কারণ নেই। একই জেলার মধ্যে ও. সি-কে এস. পি বদলি করেন। এক জেলা থেকে আর এক জেলায় বদলির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ডি. আই. জি বা আই. জি নির্দেশ দেন। গাজোলের ও. সি-কে বদলি করার আদেশ এস. পি-কে দেওয়া হয়েছিল। এটা প্রভাবিত ও

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নিয়মের ব্যত্যয় নয় কি?

আপনি সন্তোষলাভ করেছেন যে আমার আদেশ কার্যকরী এবং প্রয়োগ উপযোগী হওয়ার আগে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সরকারী আদেশে রূপান্তরিত হওয়া উচিত ছিল। আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। অসংখ্য আদেশ জারি করা হয়েছে এবং তাদের অনেকগুলি সংশ্লিষ্ট অফিসারদের টেলিগ্রাম যোগে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আদেশগুলি কার্যকরী হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সরকারী আদেশে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয় নাই। সে যাই হোক, প্রয়োজন হলে পরবর্তীকালে একটি নিয়মমত নির্দেশ জারি করা যাবে।

আপনি আরো সন্তোষলাভ করেছেন যে সরকারী কার্য পরিচালন বিধির ২৯ (৩) ধারা আমাকে সংশ্লিষ্ট আদেশ দেবার ক্ষমতা দেয় নাই। পুনরায় এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। সংবিধানের ১৬৬(৩) ধারা বলে এই বিধিগুলি রাজ্যপাল গঠন করেছেন, "রাজ্য সরকারের কাজকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং সেই কাজগুলি মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য..." বিধিগুলির এক্তিয়ার এবং উদ্দেশ্য বুঝতে হলে একসঙ্গে পড়তে হবে। একসঙ্গে পড়লে দেখা যাবে যে মন্ত্রীসভার প্রধান হিসেবে বিধিগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। বিধির ২৯(১) ধারায় নির্দিষ্ট করে ১৩টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই বিধি মুখ্যমন্ত্রীকে তদারকি করার বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। বিধির ২৯(২) ধারায় ৪টি বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে কোন আদেশ দেওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীকেও রাজ্যপালের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিধির ২৯(৩) ধারায় মুখ্যমন্ত্রীকে সাধারণভাবে সমস্ত দফতর এবং সমস্ত ব্যাপারে তদারকি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই বিধিতে বলা হয়েছে, "যে কোন ক্ষেত্রে নীতি সংক্রান্ত এবং জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজনের প্রশ্ন জড়িত থাকলে মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রয়োজন অনুভব করেন তবে তিনি যে কোন দফতরের উপর আদেশ দেওয়ার অধিকারী অথবা নির্দেশ কার্যকরী করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।......" প্রশ্নটির সঙ্গে ব্যাপারটি নীতিসংক্রান্ত বা জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজন কিনা তিনিই এ সম্পর্কে বিচার করবার কেবল একমাত্র অধিকারী; কারণ প্রাসঙ্গিক কথাগুলি হচ্ছে, "যখন তিনি প্রয়োজন মনে করবেন, আদেশ দেওয়ার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আদেশ দেওয়ার আগে মন্ত্রীসভার বৈঠকে ব্যাপারটিকে উত্থাপন না করে তিনি নিজের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে একমত না হলে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে পারেন কিন্তু আদেশটি সম্পর্কে বৈধতা বা সাংবিধানিক এক্তিয়ারের প্রশ্ন তুলতে পারেন না।" এই বিশেষ ঘটনাটির ক্ষেত্রে নীতি সংক্রান্ত এবং জনস্বার্থে জরুরী প্রয়োজনের প্রশ্ন জড়িত ছিল যা উপরে আমি বিশ্লেষণ করেছি, কারণ আমি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ না দিলে সংশ্লিষ্ট অফিসারটিকে দুরভিসন্ধিমূলক বদলির আদেশ অনুসারে বদলি হতে হত। প্রশাসনিক ব্যাপারে এটি একটি রুটিন বদলি বলে যে আপনি মত প্রকাশ করেছেন তা সঠিক নয়। আপনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করিনি। আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এরকম আলোচনা করার

আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু একটার পর একটা ঘটনা এই আলোচনা করার পথে বাধা হয়ে এল। যার জন্য আমি আপনার সঙ্গে আর আলোচনা করতে পারিনি। কিন্তু আমিও বলব আমাদের দু'জনের অফিস একই বাড়িতে এবং চোখের সামনে হলেও এ ব্যাপার নিয়ে আপনিও আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই।

কোয়ালিশন সরকারে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান সম্পর্কে আপনি যে মত ব্যক্ত করেছেন সে সম্পর্কে আমার মতামত বিশ্লেষণ করব। আপনি লিখেছেন (আপনার ১২ই জানুয়ারীর চিঠি) যে এর সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত, যথা মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং যে দফতরের দায়িত্বভার তাঁর উপরে ন্যস্ত নয় এর সম্পর্কে। আপনার যুক্তি দ্বিবিধ : (১) সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী দলের প্রধান, "সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম" এবং হয়ত মুখ্যমন্ত্রীর এ অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ আমি কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। আমি নিশ্চয়ই বলব আপনার যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল।

আমি আশঙ্কা করছি আপনি সংবিধানকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন এবং যে চুক্তি অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় এসেছে সে সম্পর্কে আপনি ভুল বুঝেছেন। সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী কেবলমাত্র হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মত সমকক্ষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠই নন, তিনি মন্ত্রীসভার প্রধান। সংবিধানের ১৬৩ ধারায় বলা হয়েছে রাজ্যপালকে তাঁর কার্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে যার প্রধান থাকবে মুখ্য-মন্ত্রী। মূল কথাগুলি হল 'সকলের উপরে'। সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রি-সভার প্রধান। তিনি কেবল সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম নন, তিনি মন্ত্রীপরিষদের প্রধান। সংবিধানের ২১৬ ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাইকোর্টের বিচার-পতির মর্যাদায় বা ১২৪ ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈপরীত্য করতে পারেন কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে মূল কথাটি 'সকলের উপরে' অনুপস্থিত। ভাষার এই তফাৎটি আশা করি আপনি লক্ষ্য করবেন।

সংবিধানের অন্যান্য ধারাগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান হিসাবে যে ক্ষমতা আছে তা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। ১৬৪(১) ধারায় বলা হয়েছে : "রাজ্যপাল মুখ্য-মন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিয়োগ করা হবে......" সুতরাং কেবলমাত্র মুখ্যমন্ত্রীরই কোন মন্ত্রীর নিয়োগের বা কোন নিয়োগ বাতিলের ক্ষমতা আছে যদি তিনি রাজ্যপালকে সেরকম পরামর্শ দেন এবং রাজ্যপাল সাধারণ ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। এই ক্ষমতা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বৃটেনে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান ১৩ জন মন্ত্রীকে তাঁদের দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁদের জায়গায় লোক নিয়োগ করেন। ১৯৬৯ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড উইলসন অনেক মন্ত্রীকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং সেখানে নতুন লোক নিয়োগ করেন। ১৯৬৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অর্থদফতরের মন্ত্রণালয় থেকে উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব-ভার থেকে অব্যাহতি দেন। আমি এরকম আরো ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দিতে পারি।

সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী কেবলমাত্র তাঁর সমকক্ষদের প্রধান আপনার এই মত সংবিধান অনুযায়ী সঠিক নয়।

আপনি সন্তোষলাভ করেছেন, সে যাই হ'ক পশ্চিমবঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে সাংবিধানিক প্রধান রূপে আমার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আপনার এ মত সঠিক নয়। আপনি বলেছেন, "কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের উপর এখন আর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা অর্পণ করা হয়নি। এখন এখানে একটি কোয়ালিশন সরকার আছে এবং প্রত্যেকটি পার্টির কাজকর্মের সীমারেখা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোন একজন মন্ত্রী, যে দফতরের দায়িত্বভার তার উপরে ন্যস্ত নয়, তার উপর নিজের প্রাধান্য দাবী করতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী দলের প্রধান এই তত্ত্ব এখন অচল এবং পরিত্যাগ করা উচিত। অপরের তুলনায় কেউই আজ বড় নয়।" এই যুক্তিগুলি থেকে কি বেরিয়ে আসছে : হয় কোন মুখ্যমন্ত্রী নেই, না হলে ১৪ জন মুখ্যমন্ত্রী আছে। অন্য কথায় (আপনার মত অনুযায়ী) যুক্তির ভিত্তিতে যুক্তফ্রণ্ট হওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদ বাতিল হয়ে গেছে। আপনি সংবিধান পরিবর্তন করার জন্যে অভিনব ব্যবস্থা দিয়েছেন; কতগুলি দল মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করার জন্য সংবিধানের ১৬৮ ধারা প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদের অবলুপ্তি হয়েছে—এই তত্ত্বকে গভীরভাবে গ্রহণ করা যায় না। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে কেবল মাত্র এই প্রথম কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় নাই। কিন্তু আপনার মত কেউই এই ধরনের অদ্ভুত তত্ত্বের অবতারণা করা সঠিক বলে মনে করেননি। ১৯৪০ সালে মিঃ চার্চিল বৃটেনে তিন দলের কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু কোন দিনই কেউ এ ধরনের যুক্তি দেন নাই যে (মিঃ চার্চিল) প্রধানের ক্ষমতা চাওয়ার অধিকারী নন। আমি ফরাসী দেশের ইতিহাস বা অন্যান্য দেশের থেকে আরো অনেক নজির দিতে পারি।

ভারতে আমাদের লিখিত সংবিধান আছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর স্থান সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। আপনার তত্ত্বকে গ্রহণ করলে সংবিধানকেই ধ্বংস করা হবে। সংবিধানের আইন অনুযায়ী যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী আমাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী রূপে নিয়োগ করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী আমার পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়েছে। মন্ত্রীসভা সংবিধান অনুযায়ী বিধানসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী। সমস্ত মন্ত্রীরা (আপনিও) মন্ত্রী পদে নিয়োগের আগে আইন অনুযায়ী "ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্যিকারের আস্থা এবং আনুগত্যের" শপথ নিয়েছেন। আমার কথা বলতে গেলে কোন রকম মানসিক ধারণা ছাড়াই আমি শপথ নিয়েছি এবং যতদিন আমি মন্ত্রীপরিষদের প্রধান থাকব আমি নিজেকে বা অন্য কাউকে সংবিধানকে ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসাবে সংবিধান ব্যবহার করতে দেব না। ইতিহাসের প্রচুর নজির থেকে দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক সংবিধানকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শ্লোগানের মুখোশ ধরে অগ্রাহ্য করা হয় এবং পরিশেষে সংবিধানের নিজস্ব ধারাগুলির অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে সংবিধানকেই ধ্বংস করা হয়। যে সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য আমি পবিত্র শপথ নিয়েছি, আমি স্থির প্রতিজ্ঞ যে আমাদের সংবিধানের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটবে না।

যুক্তফ্রন্ট গঠন করার জন্য যে চুক্তি হয় তাতে আপনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু সেই চুক্তিতেও আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বলে বলা হয়েছে। আমার দফতরগুলির নাম : "মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী"—এবং এইরকম। যুক্তফ্রন্টের সমস্ত সদস্যের সম্মতিতেই আমাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদাধিকার আপনি যেমন বলতে চাইছেন সেরকম অর্থশূন্য নয়। যুক্তফ্রন্টের সমস্ত সদস্যই যখন একমত হয়ে আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাল তারা এই পদের অর্থ এবং গুরুত্ব জানত। সুতরাং চুক্তির মধ্য দিয়ে যে কোয়ালিশান সরকার হয়েছে তাতে আপনি যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আমি তেমনি মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এই পদের যে সব ক্ষমতা আছে আমি সেই সব ক্ষমতার অধিকারী। কোয়ালিশন সরকারে প্রতিটি দলের কার্যধারার সীমারেখা দৃঢ়ভাবে বাঁধা বলে আপনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা সঠিক নয়। সেই সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিন্তু দৃঢ়ভাবে নয়। সত্যিকার ঘটনা হচ্ছে সরকারের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ছাড়া অপরাপর মন্ত্রীদের সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। চুক্তির মধ্য দিয়ে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হয়েছে তাতে মুখ্যমন্ত্রীর পদের বিলোপ হয়নি, বরঞ্চ একদলের সরকারের চেয়ে ১৪ দলীয় সরকারে এই পদের প্রয়োজন আরো বেশী। মুখ্যমন্ত্রী যে দফতর তাঁর দায়িত্বে নেই সে দফতরে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না বলে আপনি যে যুক্তি দিয়েছেন সংবিধান অনুযায়ী এই যুক্তি নাকচ হয়ে গেল। সংবিধানের ১৬৩ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে প্রত্যেককে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতিও দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি কোন দফতর কেড়ে নিতে পারেন তবে (বিশেষ ক্ষেত্রে) সেই দফতরে তিনি হস্তক্ষেপ করতেও পারেন। সমস্তর মধ্যেই অংশ নিহিত থাকে।

যে চুক্তির মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হয়েছে তার সত্যকারের অর্থ এবং কার্যকারিতা আমি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব। সংবিধানের গুরুত্বকে ধ্বংস করার জন্য বা সংবিধানের বিশেষ ধারাকে প্রত্যাহার করার জন্য চুক্তিগুলি সম্পাদিত হয়নি, তাহলে এই চুক্তি হত হঠকারী, সংবিধান বিরোধী এবং অবৈধ। সুতরাং একে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে সংবিধানের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত না হয়—এবং একই সাথে এর মূল উদ্দেশ্য এবং অন্তরাত্মা রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই চুক্তির ভিত্তিতে দফতরগুলি বিভিন্ন দলের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই দল-গুলি মিলে যে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছে পৃথিবীতে যুক্তফ্রন্ট নামে তার পরিচয়। কিন্তু চুক্তিটির সর্ত হচ্ছে যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং সেই দলের প্রত্যেকটি মন্ত্রী সেই দল বা মন্ত্রীর ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু সেই চুক্তিকে ভঙ্গ করে নয়।

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি চুক্তিতে চুক্তিভঙ্গের জন্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকে। এই চুক্তির মধ্যে এই ধরনের নির্দিষ্ট কোন সর্ত নেই যা দিয়ে কোন দল বা কোন মন্ত্রী যদি চুক্তি ভঙ্গ করেন অথবা ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তার প্রতিবিধান করা চলে। এই ফাঁক বা ত্রুটি সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। এই ধরনের কোন পরিস্থিতি হলে মন্ত্রিসভার প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী অসহায় হয়ে বসে থাকতে পারে না। যুক্তফ্রন্টের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাকে কাজ করতে হবে এবং সরকার যে সংবিধানসম্মতভাবে চলছে এ

সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। দেখতে হবে যে তাঁর দলের বা অন্য কোন দলের মন্ত্রী ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিনা। আপনার তত্ত্বকে যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে যে দল সংবিধানকে ধ্বংস করতে চাইছে বা যে চুক্তির ফলে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে তাকে অস্বীকার করার স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হয়।

আপনি আমাকে আমাদের আগের রাজ্যপাল ধরমভিরার অদৃষ্টে কি ঘটেছে তা স্মরণ করতে বলেছেন। এর থেকে পুরনো প্রবাদের কথা মনে পড়ে, "নিজে চোর কোতোয়ালকে ডাকে"। আমি সে নই যাকে ধরমভীরার (বা মিঃ নাম্বুদ্রিপাদের) অদৃষ্টে কি ঘটেছে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমি সে নই যে ক্ষমতার অপব্যবহার করার দোষে দোষী বা আমার উপর যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার অপব্যবহার আমি করেছি। সংবিধান অনুযায়ী আমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার এক্তিয়ারের বাইরে আমি যাই নাই, যার মধ্যে একটি হল সরকার সংবিধান অনুযায়ী চলছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য দলের মতামত গ্রহণ করুন যে, ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য কে দোষী।

আমি যুক্তফ্রণ্টের স্বার্থে আপনাকে একটি অনুরোধ করেই এই চিঠি শেষ করব। আপনার উপর বাইরের যে চাপ আছে তা পরিহার করে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। যদি যুক্তফ্রণ্টের স্বার্থ রক্ষিত হয় তবে যে কোন ঘটনা বা সমস্যা নিয়ে আমি যে কোন সময়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে সম্মত আছি।

যেহেতু আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই আপনার চিঠিগুলি প্রকাশ করেছেন সেহেতু জনসাধারণের কাছে আমার বক্তব্য উপস্থিত না করে কোন বিকল্প নেই। সুতরাং আমি এই চিঠিটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিচ্ছি। আপনার যুক্তিগুলির জবাব দিতে গিয়ে আমি কোন 'গোপনীয়তা' প্রকাশ করে দেইনি যা আপনি ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেননি।

আপনার একান্ত
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে জ্যোতি বসুর চিঠি

নং, ৮২৯-ডি. সি. এম

কলকাতা, ২৪শে জানুয়ারি
উপমুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
১৯৭০

প্রিয় অজয়বাবু,

আপনার ২২শে জানুয়ারির চিঠি পেয়েছি (পত্র নং ১২।সি এম)। বহু ভুল ধারণা ও ভুল বক্তব্যে তা পরিপূর্ণ। এটাও দেখা যাচ্ছে আপনি কিছু কিছু ব্যাপারে মোহগ্রস্ত। তা শোধরাবার প্রয়োজন।

২। আমি সম্প্রতি আপনাকে যে চিঠি লিখেছি তার তিনখানির নকল সংবাদ-পত্রে দেওয়ার জন্য আপনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। দয়া করে লক্ষ্য করবেন, আপনার অভিযোগটা সঠিক নয়। আমি তিনটে নয়, একটিরই বয়ান প্রকাশ করেছি। এটা সত্য যে গাজোলের ও. সি সংক্রান্ত আমার চিঠিটি সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আপনি জানেন, পত্রে উল্লিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মন্ত্রীসভায় আলোচনা করার জন্য আমি সদস্যদের চিঠির কপি দিয়েছিলাম। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা বেসরকারীভাবে কোন মতে তা য়োগাড় করেছে। মালদা জেলার ৮ জন অপরাধীর মামলা সংক্রান্ত চিঠিখানি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে আমি দিয়েছি। চিঠির বয়ান থেকেই পরিষ্কার হবে কেন আমি তা সংবাদপত্রে দিয়েছি। মামলা প্রত্যাহার নিয়ে আপনি আপত্তিজনক প্রচার চালিয়েছেন। বাস্তবে কী ঘটেছে তা জনগণের জানা প্রয়োজন। সত্য হচ্ছে এই, ঐ ৮ জন ব্যক্তি স্বভাব-অপরাধী এবং তারা বাংলা কংগ্রেসের সদস্য। জনগণের জ্ঞাতার্থে এটাও বলা প্রয়োজন, আমি মালদার এক জনসভায় ঘোষণা করেছিলাম—পুলিস শেষ পর্যন্ত এ মামলা চালাবে। যেহেতু, মামলাটির কোন রাজনৈতিক ভিত্তি নেই, যেহেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা স্বভাব-অপরাধী, সেহেতু মামলাটি প্রত্যাহার করার ভিত্তিই নেই।

৩। আপনি 'ভদ্রতা বিধি' সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আপনি ব্যক্তিগত উদাহরণ যা রেখেছেন, আশা করি সেটা মনে রাখবেন। গাজোলের ও. সি-র বদলি স্থগিত রাখার জন্য আপনি মালদার এস পি-কে যে আদেশ দিয়েছেন, আমি জানার আগেই তা কাগজে বেরিয়েছে। সে সময়ে আমি শিলিগুড়ি ছিলাম। আমি আপনার আদেশের কথা শুনে বিস্মিত হলাম। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তা জেনেছিলাম। তারপর মালদার এস. পি-র কাছে রেডিওগ্রাম যায়। তাতে আপনি ২৯(৩) ধারা প্রয়োগ করে আদেশ দিয়েছেন। আপনি মনে করেছেন যে ২৯(৩) ধারা আপনাকে ঐ ক্ষমতা দিয়েছে। এই রেডিওগ্রামের মর্ম কাগজে বেরিয়েছে। এই খবর কেমন করে প্রকাশ পেলো সে সম্পর্কে আপনি কিছুই বলেননি। অতএব ভবিষ্যতে আপনি কখনো আমাকে 'ভদ্রতা-বিধি' সম্পর্কে অনুগ্রহ করে কিছু বলবেন না।

৪। স্বরাষ্ট্র দফতরের আদেশকে অকার্যকরী করে আপনি মালদার এস. পি-কে রেডিওগ্রামের মারফতে গাজোলের ও সি-র বদলির আদেশ স্থগিত করতে বলেছেন। এ হচ্ছে আপনার অনুসৃত শিষ্টাচারের এক চমৎকার উদাহরণ। আপনার এই কাজকে আপনি যুক্তিমণ্ডিত করতে চেয়েছেন। আপনি ইচ্ছা করে এইভাবে আমার বক্তব্যের জবাব এড়িয়ে গেছেন। আমার চিঠিতে আমি যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বলেছি, আপনি যদি মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন তবে কোন অসুবিধাই হতো না। কেন, তা আমি পূর্বোক্ত দুটি অনুচ্ছেদে বিবৃত করেছি। সেজন্য আমি আমার অভিযোগে এখনো বহাল আছি—গাজোলের ও সি-র বদলির আদেশ যে পদ্ধতিতে আপনি স্থগিত রেখেছেন আমাকে না জানিয়ে, তা বিধিবহির্ভূত। কেন আপনি প্রথমে আমার সঙ্গে আলোচনা করেননি? আমার সঙ্গে বিনা আলোচনায় মালদার এস. পি-কে আপনি যে রেডিওগ্রাম পাঠিয়েছেন তার যৌক্তিকতা কী? অত্যন্ত চালাকি করে আপনি এসব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। আপনি কি দয়া করে তার জবাব দেবেন?

৫। গাজোলের ও. সি সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার আচরণের প্রসঙ্গে আসা যাক্। আপনার ব্যাখ্যা অসন্তোষজনক ও অগ্রহণীয়। পুনর্বার আমাকে না জানিয়ে আপনি গাজোলের ও. সি-র বদলি ৬ মাসের জন্য স্থগিত রেখেছেন। এর জবাবে আপনি জানিয়েছেন, এ না করলে অফিসারটির বদলি হতো এবং তা হতো অন্যায়। এ বক্তব্য আমি গ্রহণ করতে পারি না। যতক্ষণ না আমি (জ্যোতি বসু) এস. পি-র সুপারিশ সংবলিত গাজোলের ও. সি-র তথাকথিত ব্যক্তিগত অসুবিধা সম্পর্কে উল্লিখিত চিঠি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিই, ততক্ষণ বদলির আদেশ কার্যকর করা থেকে বিরত থাকুন—এই মর্মে আপনি অনায়াসে এস. পি-কে বলতে পারতেন। ...এখন আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন আপনার আচরণ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা কী রকম ফাঁপা। সমস্ত রকম শিষ্টাচারের বাইরে আপনি অপ্রত্যাশিত, অশোভন ও অন্যায়ভাবে বদলি রদের আদেশ দিয়েছেন। আমি এ ব্যাপারে আপনার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়েছি, আগেই আমি জানিয়েছি, জনসমক্ষে আপনাকে হেয় করতে আমি চাইনি পালটা আদেশ দিয়ে। ২রা জানুয়ারীর চিঠিতে আমি আপনাকে বলেছিলাম—গাজোলের ও. সি-র ঘটনা আপনি আমাকে বলতে পারতেন। আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী ঐ ও. সি-র প্রকৃতি সম্পর্কেও জানিয়েছি। আপনি পুরোপুরি চুপ থাকলেন। এ চিঠির কোন উত্তর দিলেন না। এই ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলাই আর সংগত মনে করলেন না, যদিও আপনার নিজের ভাষায়—আপনার ও আমার অফিসের দূরত্ব অতি সামান্যই। আমি সে কারণে ভেবেছিলাম, আমার চিঠিতে প্রকাশিত মতামতকে আপনি স্বীকার করেছেন। ৭ দিনের অখণ্ড স্তব্ধতার পরে যখন আপনার রেডিওগ্রামের কপি আমি পেলাম তখন তাই আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এই রেডিওগ্রামে আপনি ২৯(৩) ধারা বলে আপনার তথাকথিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে গাজোল থানার ও. সি-র বদলির আদেশ রদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজের প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা কোথায়? আপনি যুক্তি দিয়েছেন, ২৯(৩) ধারা আপনাকে আপনার নয় এমন সব দফতরে জরুরী নীতি সংক্রান্ত ও জনস্বার্থ জড়িত ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপের অধিকার দিয়েছে। এই যুক্তি শুধু দুষ্পাচ্য নয়, বাজেও। ধরে নিলাম, যদিও স্বীকার করছি না যে, ঐ ধারা ঐ ক্ষমতা আপনাকে দিয়েছে, তবে আমি প্রশ্ন করি, ব্যাপারটি এতোই জরুরী ছিল? আগেও এ প্রশ্নের জবাব আপনি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। আমি সেজন্য আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। কারণ জবাব কোথায় যে উত্তর দেবেন। আমি বদলি ৬ মাসের জন্য স্থগিত রাখতে সম্মত ছিলাম। সুতরাং তড়িঘড়ি করে ঐ আদেশ রদ করার কোন ক্ষেত্রই ছিল না। যদি বদলি রদ করার কোন কারণ থেকেই থাকে, তবে তা আলোচনা করার যথেষ্ট সময় ছিল। সুতরাং, ২৯(৩) ধারা আপনার ব্যাখ্যামতো যদি ঐ ক্ষমতা দিয়ে থাকে, তবে তাও আপনি ভুলভাবে প্রয়োগ করেছেন।

৬। নিজের কাজের সাফাই হিসেবে বলেছেন—গাজোলের ও. সি-কে রাজ-নৈতিক কারণে বদলি করা হয়েছে বলে তার হয়ে আপনি হস্তক্ষেপ করেছেন। আমি জানি, নিজের ভুল স্বীকার করা আপনার পক্ষে কঠিন। সেজন্যই নিজের সাফাই-এর জন্য আপনি একখানা উপন্যাস বানিয়েছেন। আপনি বলেছেন, বদলি রদ করার কারণ আপনি ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেছেন, যাতে আমি হেয় বোধ না

করি। আগে তো আপনার এই সৎ উপলব্ধি দেখা যায়নি। এমন কি, যে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি, সেক্ষেত্রে আমাকে বেকায়দায় ফেলার কাজ সম্পন্ন... এই হচ্ছে ভণ্ডামির শেষ আশ্রয়।

৭। আপনার আচরণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা কারুর কাছে গ্রহণীয় নয়। আপনি এখন বলছেন, আগে আপনি কারণ ব্যাখ্যা না করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে 'গোপনীয় পত্রে' বা মৌখিকভাবে কারণটা জানাতে পারতেন। আপনি ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মালদা গিয়েছিলেন। কিন্তু ২২শে জানুয়ারি পর্যন্ত আপনি একদম চুপচাপ রইলেন। এখন হঠাৎ আপনি যুক্তি নিয়ে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু হায়! বড়ো বিলম্ব হয়ে গেছে। এখন কেউ আপনাকে বিশ্বাস করবে না।

৮। গাজোলের ও. সি-র ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা না করার কারণ হিসেবে বলেছেন : "আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা অসুবিধা সৃষ্টি করল।" কিন্তু আমি আপনাকে জানাতে চাই, আপনি আলোচনা করা প্রয়োজনই মনে করেননি যদিও আমাদের অফিসের দূরত্ব খুব সামান্যই।...আপনি এই দীর্ঘ সময় আমার সঙ্গে আলোচনা করার সময় পাননি। কিন্তু তাই বলে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। আপনাদের উপদেষ্টাদের কাছ থেকে ২৯(৩) ধারা ও সংশ্লিষ্ট আইনের অর্থ আপনি বুঝে নিতে পারলেন এই সময়ের মধ্যে। তারপর মালদার এস. পি-কে রেডিওগ্রাম পাঠাতে পারলেন। আপনি অন্য সব কাজ করতে পারলেন অথচ আমার সঙ্গে আলোচনার সময় পেলেন না। ভণ্ডামির একটা সীমা আছে। আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, আপনার রেডিওগ্রামের পিছনে অতি ব্যস্ততার কারণটা কী? আমার সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে কি আপনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তো। আপনি অন্তত ৫ মাস আরো অপেক্ষা করতে পারতেন। কারণ আগেই আমি বলেছি আমার সঙ্গে কথা না বলে আপনি যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য।

৯। সরকার পরিচালনবিধির ২৯(৩) ধারার আসল গঠন সম্পর্কে আমার মতামত পূর্বাহ্ণেই বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করেছি। আমি সব সময়ই আমার পূর্বেকার মতামতে অবিচল থাকব এবং এই সম্পর্কে আপনার ব্যক্ত মতামতকে সম্পূর্ণরূপে আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আপনি আপনার উপস্থাপিত তত্ত্বের দ্বারা এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, উল্লিখিত ধারা অনুসারে জনস্বার্থে কোন্ বিষয়টি জরুরী অথবা জরুরী নয় তা নির্ধারণের সর্বময় কর্তা আপনি স্বয়ং। আপনার এই ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে সরকার পরিচালনবিধির উক্ত ধারাগুলিই হবে অর্থহীন এবং এই ব্যাখ্যানুসারে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হবেন। সরকার পরিচালন-বিধির মূল লক্ষ্য যদি এই ধরনের হয় তাহলে উক্ত ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ধারা, উপধারা ও বিধির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যা ভাল মনে করবেন তা করতে পারবেন—এ ধরনের কোন বিধি যদি সরকার পরিচালন-বিধির কোথাও উল্লেখ করা হতো তাহলে হয়তো একই কথার পুনরাবৃত্তি থেকে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যেত। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আপনি সরকার পরিচালন-বিধির ২৯(৩) ধারা নিজের খুশিমত একতরফাভাবে ব্যবহার করতে পারেন না এবং এই ধারাটি

মুখ্যমন্ত্রী সরকারী ক্ষমতার সর্বময় কর্তারূপেও প্রতিভাত করতে পারে না। আমার বিশ্বাস আছে, আপনার পরিবেশিত তত্ত্ব কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০। আপনি আরেকটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। আপনার ধারণা, সরকার পরিচালন-বিধির ২৯(৩) ধারা অনুসারে আপনি সরকারের প্রতিটি বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কিন্তু এই ধারণা মোটেই সঠিক এবং অভিপ্রেত নয়। এই ধরনের হস্তক্ষেপের পূর্বে হস্তক্ষেপসংক্রান্ত বিষয়বস্তু নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে অন্তত একবার আলোচনা করা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এবং অভিপ্রেত। বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু না বলে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাথে আলোচনা না করে আপনার তরফ থেকে ২৯(৩) ধারা প্রয়োগ করা কোন মতেই শোভন হতে পারে না। আপনি এই যুক্তি অস্বীকার করতে পারবেন না।

১১। সংবিধানের নিয়মাবলীর উপরে আপনার নিবন্ধ একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র অপেক্ষা বেশি কিছু যোগ্যতা দাবি করতে পারবে না। আপনার ধারণা মত সংবিধান অনুসারে একথা সঠিক যে—"রাজ্যপালের কার্যাবলী পরিচালনায় সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান করে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যপাল কর্তৃক অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিয়োজিত হবেন।" কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত করা যাবে না যে, প্রতিটি পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তৃত্ব থাকবে অথবা তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাজের উপরে খবরদারি করবেন। সংবিধানের নিয়মাবলী সব সময় সঠিক অর্থবহ হতে পারে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুসারে সংবিধানের নিয়মাবলীকে বুঝতে হবে এবং সে অবস্থানুসারেই সেগুলিকে প্রয়োগও করতে হবে।

১২। সংবিধানের ১৫৪(১) ধারায় বলা হয়েছে : রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে থাকবে এবং তা তাঁর দ্বারা অথবা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা কার্যকর হবে। ১৬৩(১) ধারায় বলা হয়েছে : রাজ্যপালকে পরামর্শ দেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ-মত কাজ করবেন, অবশ্য সংবিধানে স্বীকৃত তাঁর বিশেষ ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করতে পারবেন। ১৬৩(২) ধারায় বলা হয়েছে : এই বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কিত ব্যাপারে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই সর্বোচ্চ এবং তা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তাই এটা পরিষ্কার যে, আক্ষরিক অর্থে সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যাপারে রাজ্য-পালই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। একথা সত্য মন্ত্রিসভা এ ব্যাপারে রাজ্যপালকে সহযোগিতা এবং সুপারিশ করবে। সংবিধানের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার এই সুপারিশ মানতে বাধ্য। এ ব্যাপারে রাজ্যপাল নিজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। অবশ্য এ থেকে এ প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই 'না'। অধিকাংশ ব্যাপারেই রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান মাত্র।

১৩। যে সমস্ত বিষয় রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে রাজ্যপালই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, রাজ্যপাল নিজে নিজের ইচ্ছামত সবকিছুকে বিশেষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করতে

পারবেন না। সরকার পরিচালনবিধির ২৯(৩) ধারা বা অন্যান্য ধারার কোথাও বলা নাই যে, মুখ্যমন্ত্রী জরুরী জনস্বার্থ বিষয়ে নিজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ধরমভীরা যেভাবে ক্ষমতার অপব্যাখ্যা করেছেন আপনিও তাই করবার চেষ্টা করছেন। আপনি এবং আমরা সকলেই ধরমভীরার সাংবিধানিক ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছিলাম। অন্ততঃ ১৬৩ ধারার কিছু কথা তাঁর অনুকূলে ছিল। কিন্তু পরিচালনবিধির কোনকিছুই আপনাকে সমর্থন করে না।

১৪। আপনি বলেছেন, পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভা আপনারই পরামর্শমত রাজ্যপাল নিযুক্ত করেছেন। একথা সত্য। তার অর্থ এই নয় যে, বিভিন্ন মন্ত্রী তাঁদের নিয়োগের জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের মনোনয়নে আপনার কোন হাতই নেই। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ দল কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন এবং দফতর পেয়েছেন। আপনি রাজ্যপালকে তাঁদের নিযুক্ত করবার জন্য এই জন্যই উপদেশ দিয়েছেন যে, আপনি যুক্তফ্রন্ট থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশিত হয়েছেন। সংবিধান অনুযায়ী আপনি শুধুমাত্র এই সংবাদটি রাজ্যপালের কাছে পেঁছে দিয়েছেন। এটা আপনাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীর নিয়োগ করে থাকেন এই সাংবিধানিক নিয়ম পশ্চিমবাংলার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় পুরোপুরি ব্যবহৃত হতে পারে না।

১৫। আপনি আপনার ক্ষমতা এবং মর্যাদা সম্পর্কে মোহগ্রস্ত। আপনি বলেছেন আপনি সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী যে কোন মন্ত্রীর দফতর কেড়ে নিতে পারেন। সংবিধান অনুযায়ী আপনি পারেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে সাথে সাথে এটাও আপনার জেনে রাখা ভালো যে, অন্য দলের কোন মন্ত্রীর হাত থেকে দফতর কেড়ে নেবার পরিণতি কি? এর ফলে যুক্তফ্রন্টই ভেঙে যাবে। আমি আগেই বলেছি সমস্ত মন্ত্রীই তাঁদের নিজ নিজ দল কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। সুতরাং সংশ্লিষ্ট দলের নির্দেশ ব্যতীত কোন মন্ত্রীর দফতর কেড়ে নিতে আপনি পারেন না। এটাই বাস্তব সত্য, তত্ত্ব যাই হোক।

১৬। আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চার্চিলের নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি সে ব্যাপারে বিশদ জানি না। আমি এটাও জানি না যে, চার্চিল অন্যান্য মন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীতই অন্য মন্ত্রীর দফতরে সরকার পরিচালন-বিধির ২৯(৩) ধারা প্রয়োগ করে হস্তক্ষেপ করতেন কিনা। আমি জানি না তিনি তাঁর সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতেন কি না। এবং তাঁদের চিঠির উত্তরটাও দিতেন কি না। এবং সাধারণত চুপচাপ থেকে তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে গোপনে ২৯(৩) ধারা সম্পর্কে পরামর্শ করতেন কি না।

১৭। আপনি আরও দুজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, যথা ম্যাকমিলান ও উইলসনের নজির উল্লেখ করেছেন। চার্চিলের কথা উল্লেখের মতো এগুলিরও কোনও মানে হয় না। ম্যাকমিলান ও উইলসন তাঁদের মন্ত্রিসভা থেকে কয়েকজন মন্ত্রীকে নিশ্চয়ই বাদ দিয়েছিলেন। একথা প্রমাণ করার জন্য অতদূরে ইংলণ্ডে যাবার প্রয়োজন নেই। আপনি নিজের ঘরেই ও-ধরনের ভাল উদাহরণ পাবেন। অতি সম্প্রতি ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কয়েকজন মন্ত্রীকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর পিতাও ঐ ধরনের কাজ করেছেন। কিন্তু এতে কী প্রমাণ হয়? এতে প্রমাণ হয় যে, এক-

দলীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যা চান তাই করতে পারেন, অবশ্য তার পেছনে যদি তাঁর দলের প্রয়োজনীয় সমর্থন থাকে। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের আমলে অবস্থা ভিন্ন। ফ্রন্ট না ভেঙে আপনি কোন মন্ত্রীকে তাঁর দফতর থেকে বাদ দিতে পারেন না। একদলীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নজির তুলে তা সে ব্রিটিশই হোক বা ভারতীয়ই হোক বিশেষ কোন লাভ নেই।

১৮। আপনি ফরাসী সরকারের কথাও তুলেছেন। ফরাসী সাংবিধানিক ইতিহাস পড়লে আপনি দেখতে পাবেন যে, ফরাসীরা যখন-তখন প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তনে অভ্যস্ত।

১৯। আপনি সংবিধান ধ্বংসের কথা এবং সংবিধান রক্ষায় আপনার কর্তব্যের কথাও বলেছেন। আপনি শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করবেন বৈকি, কারণ মন্ত্রিসভা ধ্বংস করে এবং নিজেকেই সরকারের সর্বেসর্বা করে তুলে সংবিধান ধ্বংস করতে বরং আপনিই চেয়েছেন। যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে চুক্তি হলো—সবার সম্মতিক্রমে ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করতে হবে। সংবিধানকে সর্বদাই রক্ষা করা হচ্ছে। তবে সংবিধানকে রক্ষা করার অজুহাতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বেসর্বা হয়ে বসতে পারেন না। আপনি যা করার চেষ্টা করছেন সংবিধান সে অধিকার আপনাকে দেয়নি।

২০। আপনার আচরণের দ্বারা আপনি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গে সাহায্য করেছেন এবং বিশৃঙ্খলা এনেছেন সরকারী কার্য পরিচালনার মধ্যে। আপনি যদি এ ধরনের কাজ করে যান, তাহলে সরকারী যন্ত্র একেবারে ভেঙে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট অসুবিধায় পড়বে।

২১। আমি এখন সম্পূর্ণ একটা আলাদা বিষয়ের কথা তুলছি। এটা সুকুমার রায় সম্পর্কিত। আমার গত চিঠিতে আমি বলেছি যে, তাঁর কাজকর্মের উপর গোপনে নজর রাখার জন্য পুলিসকে নির্দেশ দিয়ে আপনি সরকারকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছেন। আপনি একাজ করেছিলেন বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আপনার চিঠিতে এ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ নেই। আপনি অভিযোগ করেছেন যে, গাজোল থানার ও. সি-র বদলির নির্দেশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ অভিযোগ কি আপনার মুখে সাজে। যারা কাচের ঘরে বাস করে, তাদের সম্পর্কে সেই প্রবাদ বচনের কথা কি আপনি ভুলে গেছেন?

২২। গাজোল ও. সি-র ব্যাপারে আপনার বিবেক জেগে উঠেছে। আহত হয়েছে আপনার ন্যায় বিচারের ধারণা। এর মধ্যে অনেকখানি পবিত্রতার ভান রয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, চিনি শিল্পের কন্ট্রোলার নিয়োগের ব্যাপারে শিল্প ও বাণিজ্য দফতর মন্ত্রিসভাকে যে প্রতারণা করেছে, সে সম্পর্কে আপনি গত চারমাস ধরে কি করছিলেন? আপনার সুবিধার জন্য আমি সংক্ষেপে প্রসঙ্গটা এখানে তুলছি। বাণিজ্য ও শিল্প দফতর একজন অধস্তন অফিসারকে (অস্থায়ীভাবে জেলা শিল্প অফিসার হিসাবে যিনি এখন কাজ করছেন) চিনি শিল্পের কন্ট্রোলার পদে নিয়োগ করতে চায়। এই পদের বেতন হার হল ১৮০০—২২৫০ টাকা। উক্ত অফিসারের বর্তমান বেতন নাকি ৮০০ টাকার কাছাকাছি। মন্ত্রিসভা উক্ত অফিসারকে ঐ পদে নিয়োগের ব্যাপারে বেশ কয়েকবার ঐ দফতরের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। অফিসারটিকে ঐ পদে নিয়োগ করা হলে এক কলমের

থেকেই তার বেতন প্রায় ১০০০ টাকা বেড়ে যাবে। তখন বাণিজ্য ও শিল্প দফতর বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে একজন উপযুক্ত অফিসারকে নিয়োগের প্রস্তাব দিলে, মন্ত্রিসভা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই চিনি-শিল্প সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, চিনি উৎপাদন ও আখ চাষ সম্পর্কে পুঁথিগত ও প্রয়োগগত জ্ঞান থাকতে হবে। তাই সেই সব সদস্যদের নিয়েই বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা দরকার, যাদের এ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। শিল্প ও বাণিজ্য দফতর অবশ্য একটি কমিটি গঠন করে এমন সদস্যদের নিয়ে যাদের এ যোগ্যতা আছে বলে মনে হয় না। এদের মধ্যে একজন সদস্য অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস এবং অবসরের আগে তিনি ছিলেন ডেপুটি সেক্রেটারির সমতুল্য এক পদে। আরেকজন ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ হিসাবে অবসর নেন। তৃতীয় সদস্য রাজ্য সিভিল সার্ভিসের অফিসার, সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি। তাই দেখা যায়, তিনজন সদস্য ডেপুটি সেক্রেটারির পদ ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেননি। অথচ চিনিশিল্পের কন্ট্রোলারের বেতনের হার সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারির বেতনের সমান। তাছাড়া এসব সদস্যদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু চিনি তৈরি ও আখ চাষের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। চতুর্থ সদস্য ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্য। পঞ্চম সদস্য সম্পর্কে কিছু জানা নেই। সরকার ঐ পদের জন্য যে যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেয়, সে ব্যাপারেও প্রশ্ন ওঠে। যেমন ধরুন, এ পদের জন্য প্রার্থীর বয়স সীমা দেওয়া ছিল ৪৫-৫৪ বছর। পরে ঊর্ধ্ব বয়স সীমা ৫৫ বছর করা হয়। এ করা হল কেন? এর কোন সঙ্গত কারণ নেই। একজন মাত্র প্রার্থী কমিটির সামনে উপস্থিত হন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর বয়স ৫৫ বছর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়োগ করা হল। এই অফিসারের কথাই শিল্প-বাণিজ্য বিভাগের মনে মনে ছিল। আমি জানতে চাই, চিনি প্রস্তুত ও আখ চাষের ব্যাপারে এই অফিসারের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কিনা? আমি গত সেপ্টেম্বরে এ ব্যাপারে আপনার কাছে বিস্তারিত নোট পাঠিয়েছিলাম। নোটে ব্যাপারটার গুরুত্বের কথাও বলা হয়েছিল। আপনি এ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও তা হয়নি। আলোচনা প্রয়োজন মনে করে এবং প্রয়োজন হলে মন্ত্রিসভায় আলোচনার প্রস্তাব করে সম্প্রতি আমি এ বিষয়ে আপনাকে লিখেছি। এ ব্যাপারে তো আপনি ২৯(৩) ধারা প্রয়োগ করেননি। সম্ভবত তা করেননি এজন্যই যে, এক্ষেত্রে আপনার যুক্তি দুর্বল। সংবাদপত্রে এরকম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শিল্প-বাণিজ্য দফতর যাকে অনুগ্রহ করতে চায়, সেই অফিসারের বাড়িতে বিনা ভাড়ায় বাংলা কংগ্রেসের অফিস চলছে বলেই আপনি এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। একজন সৎ লোক সব ব্যাপারেই সৎ থাকেন। বেছে বেছে সততা প্রয়োগ করা চলে না। আরও একবার আপনি কথায় এবং কাজে গরমিলের পরিচয় দিয়েছেন। আমি তাই বলছি, এখনও সময় আছে, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের এই কেলেঙ্কারী বন্ধ করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, এমন কি তাতে যদি আপনার দলের বিনা ভাড়ায় অফিস পাবার অসুবিধা ঘটে তবুও।

২৩। আপনার চিঠির শেষাংশে "বাইরের চাপ প্রতিহত করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার" ব্যাপারে আপনি আমার সহযোগিতা চেয়েছেন।

আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন। আমি জানি না, আমার উপর কিসের চাপ পড়ে। আমি সব সময়েই পূর্ণ স্বাধীনতায় কাজ করে থাকি। আপনি বলেছেন, আপনি আমার যে কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। আপনি একথা বলছেন বটে, কিন্তু বাস্তবিকই কি আপনি তাতে প্রস্তুত আছেন? আমি তো আলোচনার কথা বলেই আসছি। পাঞ্জাবের ব্যাপারে আমার অভিযোগই তো হল যে, আপনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাকে আস্থায় নিয়ে আলোচনা করলেন না এবং আমার অজান্তে তাড়াহুড়া করে ব্যবস্থা নিলেন। দু-দুবার সরকার পরিচালনার রায় আমরা জনগণের কাছ থেকে পেয়েছি। জনগণের সে রায় ছিল—আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকার চালাতে হবে। আমি আমার আগের চিঠিতেও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথায় জোর দিয়েছি। ঐ চিঠি লেখার আগে আমার বক্তব্য আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলেছি। আমি সব সময়েই আলোচনায় প্রস্তুত আছি—যেমন আগেও ছিলাম। আমি তাই এই বলে শেষ করব, আসুন আমরা একসঙ্গে মিলে সরকারের সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলার পথ খুঁজে বের করি। মন্ত্রিসভার সদস্য বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে বৈঠকা ও বোঝাপড়া থাকা উচিত। তা না হলে সরকার সফলভাবে চলতে পারে না এবং যে জনগণের রায়ে আমরা ক্ষমতায় আসীন হয়েছি, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

আপনার একান্ত
জ্যোতি বসু

অজয় মুখোপাধ্যায়ের ৩১।১।৭০ তারিখের চিঠি

প্রিয় জ্যোতিবাবু,

আমি আপনার চিঠি (ডি. ও নং ৮২৯ ডি. সি. এম তাং ২৪-১-৭০) পেয়েছি যা আপনি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিয়েছেন। জবাব দিতে দেরী হওয়ার জন্য আমাকে মার্জনা করবেন কারণ একটা ধারণা ছিল যে, আমার জবাব কিছুকালের জন্য ধরে রাখব।

আমি আপনার চিঠির জবাবের ভাষার কর্কশতায় হতভম্ব হয়ে গেছি যা অনেক সময় ব্যক্তিগত কুৎসায় পর্যবসিত হয়েছে। আপনি আমার দিকে যে সব বিশেষণ ছুঁড়েছেন তার থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "বালসুলভ আকাঙ্ক্ষকর বুদ্ধি", "আপনার উল্লেখ হল শূন্য", "আপনার মূল্যায়ন স্কুলের ছেলেদের যথেষ্ট সাহায্য করবে", "আপনার ভণ্ডামি এবং শঠতার অপূর্ব কৌশল", "আমি ভেবে-ছিলাম যে ভণ্ডামির একটা সীমা আছে", "আপনার কাজের সমর্থন করতে গিয়ে আপনি ভ্রান্ত তত্ত্ব এবং উপন্যাস রচনা করেছেন", "ভণ্ডামীর এই হল শেষ শব্দ", "এখন কেউই আপনাকে বিশ্বাস করবে না।" সভ্য মানুষের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়েও ভদ্রতা রক্ষা করা হয়ে থাকে। এমন কি যুদ্ধ ঘোষণার বাণীও আপনার চিঠির ভাষার চেয়ে কম কুৎসাপূর্ণ থাকে। আমাকে ভর্ৎসনা করার বাসনায় আপনি ভুলে গেছেন যে, আপনি সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী আর লিখেছেন মুখ্য-মন্ত্রীকে। আমাকে জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আপনার ভয়ানক

দুশ্চিন্তায় আপনি দেশের প্রতি আপনার দায়িত্ব ভুলে গিয়েছেন এবং অপমানজনকভাবে বন্ধুরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদের উল্লেখ করেছেন। আমার চিঠিতে উল্লিখিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দফতর পুনর্বণ্টন এবং কোন কোন সদস্যকে তাঁদের দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সম্পর্কে জবাব দিতে গিয়ে আপনি আমাকে "আপনি অ্যানটিক-অদ্ভুত", দু'জন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখ করেছেন, হ্যারল্ড ম্যাকমিলান এবং হ্যারল্ড উইলসন (অ্যানটিক অর্থাৎ কৌশলী, অথবা বিচিত্র কার্যকরণ)। আপনার চিঠির ভাষার অসংযম সম্ভবত তাদের দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। আমাকে অপদস্থ করার জন্য আপনি এত আগ্রহান্বিত যে আপনি মন্ত্রগুপ্তির শপথ এবং আইন ভঙ্গ করে সরকারের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। আপনার চিঠিতে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন, "গত চার মাস ধরে আপনি কি করছিলেন চিনি শিল্পে কণ্ট্রোলার নিয়োগের ব্যাপারে শিল্প এবং বাণিজ্য দফতর যখন কেবিনেটকে ধাপ্পা দিয়েছে, **আপনার অবগতির জন্য সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করছি**" (বড় অক্ষর আমার)। উপরের বাক্যটি যাতে আমি বড় অক্ষর ব্যবহার করেছি তার থেকে দেখা যাবে যে আপনি ঘটনাটি ইচ্ছে করে প্রকাশ করেছেন, অনিচ্ছাকৃত ভাবে নয়। দীর্ঘ বিবরণের মধ্যে আমাদের কেবিনেট মিটিং-এ যা আলোচনা হয়েছে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, আপনার নিজস্ব গোপন নোট, আমাদের গোপন আলোচনা এবং যে সমস্ত ঘটনা যা জনসাধারণ জানে না। আমাদের বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার ক্ষমতা—এই সমস্ত কিছু আদৌ সংপৃক্ত নয়। যে কোন প্রকারে আপনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন (আপনার মত অনুযায়ী) গাজোল থানার ও. সি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কাজে অনেক সাধুতার ভান করা হয়েছে, এবং প্রমাণ স্বরূপ একজন কেবিনেট মন্ত্রীর ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম শপথ ভঙ্গ আমাদের সাংবিধানিক ইতিহাসে অদ্বিতীয়। আপনি যে শপথ বাণী উচ্চারণ করেছেন তা আমাকে স্মরণ করতে দিন। "আমি ভাবগম্ভীরভাবে শপথ গ্রহণ করছি যে, আমার সরকারের মন্ত্রী হিসাবে আমার বিবেচনার জন্য যা আসবে বা আমরা জানতে পারব তা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ফাঁস করে দেব না, কেবলমাত্র সরকারী কার্য পরিচালনার জন্য যা প্রয়োজন হবে তা বাদ দিয়ে।" যদি আপনি মনে করেন যে, ১৪ দলের কোয়ালিশন সরকারে আপনি কাজ করেন এবং একটি বিশেষ দলের সদস্য বলে আপনি সাংবিধানিক এবং আইনগত দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং শপথ ভঙ্গের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন তা হলে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, আপনি এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত নন। ১৯২২ সালে মিঃ এ. এস. মণ্টেগু যিনি ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন তাঁকে কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বরখাস্ত করেছিলেন—যে কোয়ালিশন সরকারে কনজারভেটিভ্ দলের প্রাধান্য ছিল। আপনার কাজের আইনগত ব্যাপারগুলি পরীক্ষা করা পর্যন্ত আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার অধিকার সংরক্ষণ করে রাখছি।

দুঃখজনকভাবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নেই যে, এ ধরনের পত্রালাপ চলতে থাকলে আপনি আইন ভঙ্গ করে গোপন তথ্য আর ফাঁস করে দেবেন না, আমি এ ব্যাপারে আর অংশ গ্রহণ করতে রাজী নই কারণ তাতে এ ধরনের আইন ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। সংবিধানের ১৬৩(২) ধারা অনুযায়ী যৌথ দায়িত্বের নীতি

অনুসারে মন্ত্রী পরিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্রী এমনকি আমি নিজেও যে কোন মন্ত্রীর আইন ভঙ্গের জন্য দায়ী। সুতরাং জনসাধারণের রক্ষার জন্য এবং জনস্বার্থের খাতিরে এই পত্র বিনিময় বন্ধ করছি। সে যাই হোক, আপনার সঙ্গে অভদ্রতার প্রতিযোগিতা করা আমার ইচ্ছা নয়।

যা হ'ক আমি আপনার যুক্তির জবাব দেব। যুক্তফ্রণ্ট সরকারে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে আমি যে ব্যাখ্যা করেছি এবং সরকারী কার্যবিধির ২৯(৩) ধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি সঠিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিজেকে স্বৈরাচারী করে তুলবেন। আপনি আমাকে অভিযুক্ত করেছেন, "সংবিধানকে লঙ্ঘন করে এবং মন্ত্রীপরিষদকে নস্যাৎ করে নিজেই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইছেন।" আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, হিটলার তার প্রত্যেকটি যুদ্ধের বা আক্রমণের সময় তার প্রতিপক্ষকে যুদ্ধবাজ এবং আক্রমণকারী বলে অভিযুক্ত করতেন এবং নিজেকে শান্তিপ্রিয় বলে দাবী করতেন। পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, বেল-জিয়াম এবং ফ্রান্স এবং সর্বশেষ আক্রমণ করার আগে এক এক করে সকলকেই অভিযুক্ত করা হ'ল।

সুতরাং আমি গুরুত্ব সহকারে আপনার বিশেষণগুলি ধরছি না, যথা, "আপনি সংবিধানকে লঙ্ঘন করেছেন", "মন্ত্রী পরিষদকে নস্যাৎ করছেন", "ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইছেন" ইত্যাদি। কিন্তু আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলব যে, আপনার যুক্তি যে আমি সংবিধানের ১৬৩ এবং ১৬৪ ধারার যে ব্যাখ্যা দিয়েছি যাতে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের প্রধান, মুখ্যমন্ত্রীকে স্বৈরাচারী করে তুলবে এবং যুক্তফ্রণ্টের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করবে এর কোন ভিত্তি নেই। মুখ্য-মন্ত্রীর ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংবিধানে বর্ম আছে। তিনি বিধানসভার কাছে দায়ী। তিনি সঠিক এবং নিঃসর্তভাবে দায়ী; এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যা করেছেন তার প্রত্যেকটির জন্যই বিধানসভায় কৈফিয়ৎ তলব করা যায়।

যদি তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, অথবা সমস্ত ক্ষমতা নিজে অধিকার করেন, অথবা এমন কোন কাজ করেন যা নিন্দনীয় অথবা সঠিক নয় অথবা রাজ্যসরকারের কাজ এমনভাবে চালাতে চান যা সংবিধান সম্মত নয়, তাহলে বিধানসভার যে কোন সদস্য এবং যুক্তফ্রণ্টের সদস্যও নিন্দাসূচক প্রস্তাব বা অনাস্থা আনতে পারেন। সুতরাং যুক্তফ্রণ্টের প্রত্যেকটি দলেই নেতা বা যে কোন সদস্যদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর দুষ্কার্যের জন্য নিন্দা করার পথ খোলা আছে, যদি তিনি সেই দোষে দোষী হয়ে থাকেন যা আপনি অভিযোগ করেছেন।

কোয়ালিশন সরকারে বিশেষ মন্ত্রীর ক্ষমতার যে বিপদ তা কিন্তু অনুপস্থিত নয় যদি সেই কোয়ালিশন পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের হয়, এই বিপদ কিন্তু সত্যিই বাস্তব সাধারণ কর্মসূচী রূপায়ণ করতে গিয়ে একটি দল তার মতাদর্শকে অপরের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারে এবং এই পদ্ধতিতে অন্যান্য দলগুলি খাটো করে লেজুড় করে তুলবার চেষ্টা করতে পারে অথবা ময়াল সাপ তার শিকারকে যেমন করে আঘাত করে ধীরে ধীরে গিলে ফেলে তেমনি অন্যান্য দলগুলিকে একটার পর একটা আঘাত করে গ্রাস করতে পারে। সংবিধান মন্ত্রী-

পরিষদের প্রধানকে মুখ্যমন্ত্রী করে এর কার্যকরী বর্মের ব্যবস্থা করেছে, একজন প্রধানের সমস্ত কিছু তদারকি করার ক্ষমতা দিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীপরিষদকে বিধানসভার কাছে দায়ী করে।

আপনি আপনার চিঠিতে 'ম্যানডেট'-এর তত্ত্ব দিয়েছেন এবং সন্তোষলাভ করেছেন যে, "সংশ্লিষ্ট দলের 'ম্যানডেট' ছাড়া কোন মন্ত্রীকে তাঁর দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না এবং কোন মন্ত্রীকে যদি তাঁর দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবে।" জনসভায় আপনার বক্তৃতায় এই তত্ত্বকে আরো বিস্তৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, যুক্তফ্রন্ট যদি ভেঙ্গে যায় তবে ভোটারদের কাছ থেকে রায় নিতে হবে এবং শেষে এর থেকে নতুন করে সরকারের রায় নিতে হবে। আপনার যুক্তিতে সারবত্তা কিছু নেই। ভোটাররা এরকম কোন রায় দেয় নাই যে বিশেষ কোন দফতর একটিমাত্র দলের দখলে সবসময় থাকবে। যদি কোন একটি দল এই ধরনের মনোভাবের পরিচয় দেয় যে, বিশেষ একটি দফতর বা অন্য একটি তার দখলে থাকবে তবেই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে পড়বে, এর অর্থ হচ্ছে যে সেই বিশেষ দফতরটি কোন কারণ বশতঃ এতই গুরুত্বপূর্ণ যা তার দলের একটি হাতিয়ার, এই দফতরটি ছাড়া যুক্তফ্রন্ট তার দলের কাছে অর্থহীন।

নির্বাচনের পর দলগুলোর মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলেই দফতর বণ্টন করা হয়েছিল, এবং এই চুক্তিগুলিও প্রত্যেকটি চুক্তির মত সর্তসাপেক্ষ ছিল। কোন রকম প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এই চুক্তিভঙ্গ করা চলবে না বা এর অধিকার এবং ক্ষমতারও অপব্যবহার করা চলবে না।

যদি কোন ক্ষমতা বা অধিকারের অপব্যবহার করা হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান তদারকি ক্ষমতার অধিকারী করে সংবিধান বর্মের ব্যবস্থা করেছে। যুক্তফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করেছে এবং (সংবিধানের) সর্ত অনুসারে তদারকি করার যথোপযুক্ত ক্ষমতা দিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী অন্য সকল মন্ত্রীর সমপর্যায়ে আপনার এই যুক্তি সংবিধান বিরোধী।

এই চিঠি শেষ করার আগে একটি সাংঘাতিক ব্যাপার সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট ছাত্ররা এক মাইল দীর্ঘ একটি মিছিল বিধানসভা গেটের সামনে আনেন, এবং যুক্তফ্রন্ট থেকে কেউ সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে সন্দেহ করে তাদের মারাত্মক সাজা দেওয়া হবে এই বলে শ্লোগান দেয়। বিধানসভা ভবনের গেটে বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান দেয়—অজয়-ডাঙ্গে-সুশীল ধাড়া—নিপাত যাক। —যারা যুক্তফ্রন্টের ভিতরে ভাঙ্গনের বীজ ছড়াচ্ছে। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে—উপমুখ্যমন্ত্রী যুক্তফ্রন্টের প্রতি বিক্ষোভকারীদের সর্তহীন সমর্থনের জন্য অভিনন্দন জানান। (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডারড্ জানুয়ারী ৩০, পৃ ১০)

এই বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভকারীদের কাছে আপনার বক্তৃতাকে আমি খুব গভীরভাবে নিয়েছি। একজন আইনজ্ঞ হিসাবে আপনি অবগত আছেন যে কোন বিক্ষোভ যখন সুনির্দিষ্টভাবে আইনসভায় শাসানি বা অন্য উপায়ে চাপ সৃষ্টি করতে আসে তা হয় বিধানসভার প্রতি অপমান। বিধানসভার ভেতরে যুক্ত আলোচনা হল গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বিক্ষোভকারীরা সদস্যদের ভীত সন্ত্রস্ত

করতে চেষ্টা করেছে যাঁরা তাদের মতে যুক্তফ্রন্ট চলুক এই মতের বিরোধী। আপনি আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে তাদের কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আমার শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধাসহকারে
আপনার একান্ত
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

অজয় মুখোপাধ্যায়কে লেখা জ্যোতি বসুর ৩।২।৭০ তাং চিঠি

প্রিয় অজয়বাবু,

আমি রোববার বিকেলে (১লা ফেব্রুয়ারী) পুরুলিয়া থেকে ফিরেছি বলে ৩১ জানুয়ারীর আপনার অত্যন্ত গোপন ডি. ও চিঠিখানি সোমবার সকালে পেয়েছি। আর সকলে অবশ্য রোববার সংবাদপত্রে তা দেখে থাকবে।

আমার শেষ চিঠিখানিকে আপনি অসৌজন্যমূলক বলে মনে করেছেন কিন্তু সত্য কথা বলা অসৌজন্যমূলক হলে আপনার আরো বেশী অসৌজন্যমূলক ব্যবহার এবং কার্যক্রম তার জন্য দায়ী। আমার ২রা জানুয়ারীর চিঠির জবাব আপনি দেননি। গাজোল সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে সুকৌশলে এবং সন্তর্পণে আপনি আমার উপর ন্যস্ত দফতরের উপর হস্তক্ষেপ করেছেন এবং জনসমক্ষে আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন।

প্রথম চিঠিতে আপনি মিঃ উইনস্টন চার্চিল, হ্যারল্ড ম্যাকমিলান এবং হ্যারল্ড উইলসনের উল্লেখ করেছেন। এবার আপনি মিঃ লয়েড জর্জ ও ই. এস. মণ্টেগুর নাম উল্লেখ করেছেন। এসব দেখে মনে হয় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীদের শাসন সম্পর্কে আপনার ভ্রান্ত প্রশংসার একটা মনোভাব আছে। অপরে যা করেছে এটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয় একথা আপনার বোঝা উচিত—আপনি নিজে কি করতে পারেন সেটাই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমার শেষ চিঠিতে কয়েকজন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আমার মন্তব্যে আমাদের দেশে একটি অস্বস্তিকর কূটনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে একথা আপনি লিখেছেন। আপনি কেন আমাদের দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন একথা আমি বুঝতে পারছি না। এখানকার কাজে যুক্ত-ফ্রণ্টের বিভিন্ন শরিক দলগুলির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির কাজে যদি আপনি সময় ব্যয় করেন তবে আপনার সময় আরো ফলপ্রসূভাবে কাটতে পারে। ইংরেজ-দের হিউমার-বোধ আপনার চেয়ে ভাল। সেখানে আমার চিঠির জন্য ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা বিচারের ভার তাদের উপরেই ছেড়ে দিন।

শ্রীসুকুমার রায়ের ব্যাপার সম্পর্কে আপনার নীরবতায় আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। এ সম্পর্কে দুবার আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু আপনি নীরব থেকেছেন।

চিনি শিল্পে কণ্ট্রোলার নিয়োগের ব্যাপারে শিল্প বাণিজ্য দফতর আপনার বাংলা কংগ্রেসের সাথী যে কেলেঙ্কারী করেছেন সেই সম্পর্কে আমার মতামতের

জন্য আপনার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা সত্যিই চমৎকার। এই কেলেঙ্কারীর যে অভিযোগ উঠেছে তাকে অগ্রাহ্য করার মত কোন যুক্তি আপনার নেই। আপনি প্যাঁচ কষে বলেছেন যে, এই কেলেঙ্কারী আমার পক্ষে জনসমক্ষে প্রকাশ করা সঠিক হয়নি। আমার বিরুদ্ধে আপনি 'অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট' ভঙ্গ করার অভিযোগ তুলেছেন। আর একবার আপনাকে ভুল বোঝান হয়েছে এবং আপনার মন্ত্রণাদাতারা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। যে সব তথ্য আমি প্রকাশ করেছি সেগুলি সরকারী কাজের সূত্রে আমার নজরে আসেনি এবং আমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন একটি বিষয়। উল্লিখিত কোন বিষয়ই মন্ত্রিসভার কোন বৈঠকে এই তথ্যগুলি প্রকাশ হয়নি। আমি সম্পূর্ণ বাইরের সূত্র থেকে তথ্যগুলি জানতে পারি এবং আমি তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি। বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলি এই তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় এবং যুগান্তর ও অন্যান্য পত্রিকায় পরে এই তথ্য প্রকাশিত হয়। সর্বোপরি শিল্প বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রীর একান্ত সচিব ফাইল থেকে তথ্য নিয়ে যুগান্তর পত্রিকায় একখানি চিঠি লিখেছেন। সুতরাং কোন সরকারী গোপন তথ্য আমি প্রকাশ করিনি। যাই হোক, প্রকাশিত তথ্য-গুলি কি গোপন? এটা কি গোপন ছিল যে, চিনি শিল্পের কণ্ট্রোলার পদের জন্য মাত্র একজন প্রার্থীকে তথাকথিত বিশেষ কমিটি 'ইণ্টারভিউ' নিয়েছিল যে কমিটি বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গঠিত? এই কমিটির অধিকাংশ সদস্যেরই 'সুগার টেকনোলজি' সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না এটা কি গোপন ছিল? এই কমিটির একজন সদস্য বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এ তথ্য কি গোপন ছিল? এটা কি গোপন ছিল যে এই একমাত্র প্রার্থীর বয়েস ৫৪ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে এবং রহস্যজনক কারণে বয়সের সীমা ৫৪ বছর থেকে ৫৫ বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়? এ তথ্য কি গোপন ছিল যে এই একমাত্র প্রার্থীর একটি বাড়ী বিনা ভাড়ায় বাংলা কংগ্রেস ব্যবহার করে? শিল্প বাণিজ্য দফতর এই বেচারা একমাত্র প্রার্থীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজ্যের রাজস্ব থেকে হাজার টাকা বেতন বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে? শিল্প বাণিজ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনের একটি রিপোর্টের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সংবাদে প্রকাশ, তিনি স্বীকার করেছেন যে, সম্ভাব্য চিনি শিল্পের কণ্ট্রোলার পদের প্রার্থীর একটি বাড়ি বিনা ভাড়ায় আপনার দল ব্যবহার করে এবং শিল্প বাণিজ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিনা ভাড়ায় সেই বাড়িতে বসবাস করেন।

আপনার ভূমিকা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। কলঙ্ক তৈরী হবে, কুকাজ চলতে থাকবে কিন্তু যিনি তা প্রকাশ করবেন তার ভাগ্যে জুটবে দুঃখ। আপনি আশ্রয় নেবেন অফিসিয়াল অ্যাক্টের পেছনে। আমি আপনাকে হুঁশিয়ারী দিতে চাই যে কুকর্মের রক্ষা কবচ হিসাবে আইনটি তৈরী হয়নি। গোপনীয়তা পালন করতে হবে তার মানে এই নয় যে কুকর্মের সামনেও নীরব থাকতে হবে। অন্যদিকে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কুকর্মকে উন্মোচন করে দেওয়া।

শিল্প বাণিজ্য দফতরের আপনার বাংলা কংগ্রেসের সহকর্মীর কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ করে দিয়েছি বলে আপনি যদি মনে করেন আমি অন্যায় করেছি, তা হলে আপনি যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আপনার হুঙ্কারে ভয়

পেয়ে পেছিয়ে যাবার মত লোক আমি নই। আমি যে আদর্শে বিশ্বাস করি তার জন্যে বেশ কিছুকাল আমাকে জেল খাটতে হয়েছে। এমন কি ১৯৬৭ সালেও যখন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা পতনের জন্য গোপন চক্রান্ত চলছিল তখন আমি জেলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আপনি বলেছেন আমাদের বর্তমান পত্র বিনিময়ের মধ্যে শিল্প বাণিজ্য দফতরের কেলেঙ্কারী প্রকাশের ব্যাপারটি প্রাসঙ্গিক নয়। আপনি আবার ভুল করেছেন। গাজোলের ও. সি-র ব্যাপারে সাধুতার ভান করে সরকারী কার্যবিধির ২৯(৩) ধারার আশ্রয় নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল না। শিল্প বাণিজ্য দফতরের কেলেঙ্কারীর উল্লেখ করে আমি সপ্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে, আপনার সততার ভান গ্রহণ করা চলে না কারণ আপনি বাংলা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এক রকম এবং অন্য দলের সম্পর্কে আর এক রকম—আপনি এই দুমুখো নীতি নিয়েছেন। শিল্প বাণিজ্য দফতরের ঘটনায় সরকারের সততা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু বার বার বলা সত্ত্বেও আপনি কোন ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেছেন। আমার আগের চিঠির আবার উল্লেখ করে বলতে চাই সাধু ব্যক্তিরা সর্ব ক্ষেত্রেই সাধু হবেন। আপনাকে আমি আবার বলছি শিল্প বাণিজ্য দফতর সম্পর্কে আপনি কিছু করুন, অন্ততপক্ষে কিছু বলুন। তার কারণ ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও আপনি নীরব। শিল্প বাণিজ্য দফতরে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে জনসাধারণ নিশ্চয়ই কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকারী। এ ছাড়াও জনস্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত। আমি আর একবার আপনার কাছে দাবী জানাচ্ছি, এখনও সময় আছে, সরকারের সততা তুলে ধরবার জন্য শিল্প বাণিজ্য দফতরের কেলেঙ্কারী রোধ করে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

২৯শে জানুয়ারী বিধানসভা গেটের কাছে আগত ছাত্র মিছিল সম্পর্কেও আপনার ধারণা ভুল। আপনি যে শ্লোগানের উল্লেখ করেছেন, আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম তারা তা দেয়নি। নির্দিষ্ট দুটি প্রস্তাব পেশ করতে তারা এসেছিল। প্রথম প্রস্তাব ছিল বিদ্যালয়ে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত সকলের অবৈতনিক শিক্ষা চালু করতে হবে, দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। এই দুটি প্রস্তাবকে সমর্থন করেছি কারণ গণতান্ত্রিক রীতিকে আমরা সমর্থন করি এবং তার সঙ্গে এই মিছিলের সঙ্গতি রয়েছে। প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙে ফেলার জন্য যখন চক্রান্ত চলছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যখন বাংলা কংগ্রেসের বিধান সভার সদস্যদের কিনে ফেলেছিল, যুক্তফ্রণ্ট আপনার অনুমতি এবং আশীর্বাদ নিয়ে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ডাক দেয়। বিধানসভার গেটে, জেলাগুলিতে এবং শহরের অন্যত্র ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। ২৯শে জানুয়ারীর ছাত্র মিছিলের জন্য কেন যে আপনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন তা আমি বুঝতে পারছি না।

আপনার এবং বাংলা কংগ্রেসের কাজের জন্য যদি যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে যায় তবে জনগণের রায় নেওয়া দরকার একথা আমি জনসভায় বলেছি, যাতে বর্তমান সরকারের স্থলে আর একটা নতুন সরকার গঠন করা যায়। আপনার আপত্তির কারণ বুঝলাম না। জনগণকে সুপ্রিমকোর্ট বলে তাদের কাছে আপনি আবেদন করে থাকেন। আমার বিশ্বাসের কথা আপনার 'সুপ্রিম কোর্ট'-এর কাছে বলেছি।

সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 'সুপ্রিম কোর্ট' রায় দেবে না একথা নিশ্চয়ই আপনি বলতে চাইছেন না।

সরকারী গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে আপনি আশঙ্কা করছেন এবং এ কারণে আর লেখালিখি করতে চাইছেন না। যে সব প্রশ্নের আলোচনায় আমরা যোগ দিয়েছি তা থেকে এড়িয়ে যাওয়ার এ হচ্ছে অত্যন্ত খেলো অজুহাত। আপনি সম্ভবত অন্যান্য ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন। সরকারী কার্য বিধির ২৯(৩) ধারার আপনার যে ব্যাখ্যা তা আপনি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং গাজোলের ব্যাপারে আপনার কাজের যুক্তি আপনি দিতে পারেননি। আপনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা অন্যান্য মন্ত্রী থেকে অধিক।

মুখ্যমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীর চেয়ে পদমর্যাদায় মুখ্য, তত্ত্বের দিক থেকে সঠিক, কিন্তু আজকের দিনে বিভিন্ন দল মন্ত্রী ঠিক করে এবং দলগুলি দফতর বণ্টন করে; মুখ্যমন্ত্রীর এর মধ্যে কোন হাত নেই। এটা আপনি মেনে নিয়েছেন বলে আমি খুশী। কিন্তু তবু সংবিধান অনুসারে আপনি মনে করেন যে, অন্য মন্ত্রীদের তুলনায় আপনি বড়। আপনি যেভাবে সংবিধান বুঝেছেন তা ত্রুটিপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের তুলনায় বড় অথবা অন্য মন্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন সংবিধানে কোথাও এ কথা বলা হয়নি। সংবিধানের কাছে একমাত্র মন্ত্রিসভাই হচ্ছে প্রাসঙ্গিক অস্তিত্ব। মুখ্যমন্ত্রী অথবা অন্য কোন মন্ত্রী রাজ্যপালকে উপদেশ দেন না অথবা তাঁদের কেউ বিধানসভার কাছে দায়ী নন। যৌথভাবে মন্ত্রিসভার কাছে দায়ী। এর পর আপনি নিজের সম্পর্কে যে কোন ধারণা করতে পারেন বা সান্ত্বনা পেতে পারেন। আপনি যদি এই সব ধারণা অনুযায়ী কাজ করেন তা হলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবে। হুঁশিয়ারী আমি আপনাকে আগেও দিয়েছি। যুক্তফ্রন্টের ক্ষতি করতে না চাইলে ভবিষ্যতে আপনি আমার কাজে আপনার নাক গলাবেন না।

আমি আপনার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগগুলি করছি: (১) আপনি গাজোলের ও. সি-র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, (২) মালদা জেলায় কতকগুলি ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার করার ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ, (৩) উপযুক্ত কারণ ছাড়াই আমার ২রা জানুয়ারীর চিঠিখানির জবাব দেননি, (৪) যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপনি গাজোলের ব্যাপারে আলোচনা এড়িয়ে গেছেন, (৫) আমার সঙ্গে আলোচনা না করে এবং আমার মতামত না নিয়ে আপনি ২৯(৩) ধারার বলে গাজোলের ব্যাপারে অহেতুক অসঙ্গত এবং বে-আইনী আদেশ দিয়েছেন। তাতে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অনৈক্যকে সাহায্য করা হয়েছে, (৬) বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীসুকুমার রায়ের গতিবিধির উপর পুলিসকে নজর রাখতে বলে সরকারকে আপনি বিব্রত করেছেন, (৭) চিনিশিল্পে কণ্ট্রোলার নিয়োগের ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসের আপনার সাথীর কেলেঙ্কারী এবং কুকর্ম বন্ধ করতে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। এইসব অভিযোগ অস্বীকার করেননি এবং এর বিরুদ্ধেও আপনি কোন যুক্তি দেননি।

আমার মনে হচ্ছে এই চিঠি শেষ চিঠি। এর ফললাভে আমি সুখী।

আপনার একান্ত
জ্যোতি বসু

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	পৃঃ সংখ্যা
অকংগ্রেসী সরকার গঠন	১, ২, ৪, ৫, ৮, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৫৪
অচ্যুত মেনন	১৭২, ২০৬
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়	৩, ৫-১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮০, ৮১, ৯০, ৯১, ৯৯;
দ্বিতীয় পর্ব ঃ	১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১৩০, ১৩৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০২, ২০৪, ২০৫
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—জ্যোতি বসু আলোচনা	৬৪-৬৫
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ২রা অক্টোবর কেন পিছিয়ে গিয়েছিলেন?	৯৫-৯৮
অজয় ঘোষাল	৪৩
অতুল্য ঘোষ	২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬
অনাদি দাস	১৩৩, ২০১
অন্তর্বর্তী নির্বাচন	১০৭
অমর চক্রবর্তী	৫, ৩৯, ৭৫
অমিতাভ চৌধুরী	৪৪
অমৃতবাজার পত্রিকা	৪৮, ৪৯
অপূর্বলাল মজুমদার	১৩
অরুণ ঘোষ	৯
অরুণা আসফ আলি	১৩৩
অশোক ঘোষ	১, ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৭৭, ৭৮, ৯০, ১০২, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২১, ১৫২, ১৬৮, ১৭৭, ১৮৮
অশোক দত্ত	২৯
অশোক দাশগুপ্ত	১৮৫
অশোক সেন	২৮, ২৯, ৪৫, ৪৯, ৫৭, ৯৫
আই. এন. ডি. এফ—দ্রষ্টব্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট	
আচরণ বিধি	১৪২
আতাউর রহমান	৪৩
আনন্দবাজার পত্রিকা	১, ৪, ১৫, ৪৪, ৪৫, ৫১, ৫৫, ৭২, ৭৫, ৮১, ৯০, ৯১, ৯২, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩০, ১৪০,

১৪১, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৭, ১৮২, ১৮৮, ১৯০, ১৯৪
আবদুল্লাহ রসুল ১১, ১২, ১৩, ১৩২
আবদুস সাত্তার ৮৫
আর. এস. পি ৫, ৬, ১২, ১১৮, ১১৯, ১২৪, ১৪৫, ১৬৪, ১৬৭, ১৭৬, ১৮৫, ১৯৯
আর. সি. পি. আই ২, ১১৮, ১২৪, ১৬৭
আরামবাগ ৩
আশু ঘোষ ৩২, ৩৩, ৩৪, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১৬২

ইউ. এন. আই ৪৪, ১৫২
ইউ. এল. এফ ২, ৪, ৭, ৮
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট ৯০, ৯১, ৯২, ৯৯
ইন্দিরা গান্ধী ৩৮, ৪৫, ৪৯, ৬৭, ৮২, ৮৭, ১৪৬, ১৮৩ ১৯১, ২০০
ইন্দোর সম্মেলন ৭৪
ইলা মিত্র ১৩৯

উপানন্দ মুখার্জী ৩৩, ৪৫, ৭৫, ১৩৯, ১৪৭, ১৪৮

এম. এম. বসু ৪৫, ৮৯
এস. ইউ. সি ২, ১১, ৫৪, ১১৩, ১১৪, ১২৪, ১৪০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৫২, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৮৩, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৫
এস. এস. পি ২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৫৩, ৫৪, ৬৬, ১২৪, ১৫৩, ১৫৬, ১৬১, ১৬২, ১৬৫, ১৮৫, ১৮৮
এস. বি. রায় ৪৫
ওয়াই. ভি. চবন ২৪, ৮৭, ৯৩, ১২৭, ১৩৩, ১৩৫, ১৮৩
ওয়ারকারস পার্টি ২, ১১৮, ১২৪, ১৬৭, ১৮৫

কবির-মুখার্জী আলোচনা ৬২-৬৩
কবির, হুমায়ুন—দ্রষ্টব্য হুমায়ুন কবির।
কবির-পন্থী ৬২, ৬৮, ৭৪, ৭৭, ৯৬, ৯৭
কমল গুহ ২৫, ৩১, ৭৭, ৮০, ৮৯
কংগ্রেস ১, ২, ৪, ৬, ৮, ২৭, ৪৫, ৪৮, ৫৪, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ১০২, ১০৭, ১১০, ১৩১, ১৩২
কানাইলাল ভট্টাচার্য ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৬, ১৯৭, ২০২
কামরাজ ৫১, ৬৬, ৬৮, ৯৫, ৯৬
কারজন পার্ক ১৬৮
কার্টুন :
কাগুজে বাঘ ৩৯
ক্রুশ বহনকারী ৫০
জিতবে কে? ১৬৬
পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট ১৫৯
পুলিশ গার্ড অব অনার ১৫০
পূজার উপহার ৬৭
পূর্ণ সমর্থন ৮৩
বাংলা বন্ধ ৪১
বাংলার দ্বিধাগ্রস্ত হ্যামলেট ৫৮
মিনিফ্রণ্ট ২০৩
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ২০৭
কালান্তর ৪৪, ৭০, ১৪৫
কালী মুখার্জী ৩৫, ৬৯
কাশীকান্ত মৈত্র ৪০, ৭৫, ৮০
কাশীপুর অস্ত্রকারখানায় গুলিচালনা ১৩৩, ১৩৫

বিষয়	পৃঃ সংখ্যা
কে. কে. রায়	৭৫
কেন্দ্রীয় কংগ্রেসে বিরোধ	১৪৬
কেষ্ট ঘোষ	১৪৪
কোচবিহার সংঘর্ষ	১৬১
কৃপালনী, আচার্য জে. বি	৯৩
ক্যানিং সংঘর্ষ	১৬১,
ক্রান্তি দল	৪২, ৬২, ৬৯, ৭৪, ৭৯
খগেন দাশগুপ্ত	২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৬০, ৭৪, ৭৯, ৮৪, ৮৫,
খাদ্য-নীতি/খাদ্য সমস্যা	১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ৩৮, ৪০
গঙ্গাধর প্রামাণিক	৬৩, ৬৮, ৬৯, ৭৭, ৭৮, ১০১
গণ-অনশন	১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০
"গণদাবি"	১৪০
"গণশক্তি"	৬৫, ১২২, ১৪৮
গাজোলের দারোগা	১৭৬
গীতা মুখার্জী	৫৫
গুলজারিলাল নন্দ	৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৭, ৬৬, ৬৮, ৯৫
গোবিন্দ দে	৯৩
গোর্খা লীগ	৮, ৩৬, ৬৬, ১২৪, ১৬২, ১৮৫, ১৮৮, ১৯৪
ঘেরাও	১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ৩৬, ১৪১, ১৪৪, ১৮০
চণ্ডীবাবু	৭৮
চারুমিহির সরকার	৩৯, ৫৪, ৫৭, ১৯২
চিত্তপ্রিয় রায়	৭০
ছাঁটাই, ক্লোজার এবং ঘেরাও	১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ৩৬
জগজীবন রাম	১৭, ১৮৩, ১৮৮
জগদানন্দ রায়	৮৬
জগদীশ সিংহ	৮৩, ৮৮
জগন্নাথ কোলে	৩২, ৫৭
জমি ও ভেড়ি দখল	১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৬, ১৯৩
জর্জ ফারনানডিজ	১৫৬
জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৪
জাহাঙ্গীর কবির	৭, ১০, ৪০, ৫৪, ৬৮, ৬৯, ৯২, ৯৭
জীবন মাইতি	১৫১
জ্যোতি বসু	২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৯, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৫, ৯৯, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৯, ১৩০, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৮১, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৮, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৫
জ্যোতি ভট্টাচার্য	৩৯, ১১৯, ১৩১
টাইমস অব ইণ্ডিয়া	৪৩, ১১৬
ঠাণ্ডি যন্ত্র অপসারণ	১৭
ডাঙ্গে	৩৬, ১১৯, ১৬৪, ১৯৯
তরুণকান্তি ঘোষ	৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫৬, ৫৭, ৬১, ১৮৯
তারাসুন্দরী পার্ক	১৬৯

বিষয় পৃঃ সংখ্যা

ত্রিদিব চৌধুরী ৪, ৫, ১৩, ৭৭, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৭৫

দীপনারায়ণ সিংহ ১৩৩
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ঘটনা ১৩৩-১৩৫
দেওপ্রকাশ রাই ২৫, ৩৯, ৫৪, ৫৭, ১৯৫
দেবব্রত ধর ১৫১

ধর্মবীর ২৬, ৩৩, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৩, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৬, ৭৮, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০২, ১০৩, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩৩

নকশালপন্থী ২৫, ১৪৮, ১৪৯
নকশালবাড়ি ২৬, ৩৬, ৩৭
ননী ভট্টাচার্য ১২, ৩৯, ৪২, ১৯৮
নব কংগ্রেস ১৭২, ১৭৩, ১৯৮, ২০০, ২০২, ২০৪
(ডঃ) নলিনাক্ষ সান্ন্যাল ৯, ১০, ১১, ১৩, ৬৮, ১৪৭
নান্দু ঘোষ ৮৭
নারায়ণ রায় ১২
নারী নির্যাতন ১৯২-১৯৩
নির্জলিঙ্গাপ্পা ৮৯
নিত্যানন্দ কানুনগো ৪৬
নিরঞ্জন সেন ৫, ১২, ১৩, ৩৭, ৩৯
নির্মল বসু ১৩১, ১৩৮, ১৫৭, ১৬৮
নির্মল মুখোপাধ্যায় ১০
নির্মলেন্দু দে ৮, ২৮, ২৯, ৩০
নিশীথ কুণ্ডু ২৪, ৩৮, ৩৯, ৫২, ৫৪, ৯৬

বিষয় পৃঃ সংখ্যা

নীহার মুখার্জী ১২৪, ১৪১
নেতাজী প্রদর্শনী ১৯৪

পদ্মজা নাইডু ৯
পান্নালাল দাশগুপ্ত ১৪৭
পি. ইউ. এল. এফ ২, ৩, ৪, ৭, ৮
পি. এস. পি ৮, ৩৭, ৫৩, ৫৪, ৬৬, ১২৪, ১৭৭, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৫
পি. কে. সেন ৩৩, ৪৫, ৭৫, ১৫১
পি. টি. আই ৪৫
পি. ডি. এফ ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ১০২
পি. সুন্দরায়া ৫, ২২, ৩৬, ৩৭, ১৫৭, ১৬০, ১৮০, ১৯০
পুলিস অ্যাসোসিয়েশন ১৪৯, ১৫১
পুলিস বিক্ষোভ ১৪৬-১৫১
পুরবী মুখার্জী ৩৪, ৪৫, ৪৯
পৌরসভার নির্বাচন ১৪১, ১৪২
প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ ১৯৫, ১৯৯
প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৫৭, ৬১, ৭৪, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩
প্রতিভা মুখার্জী ১২৫
প্রতিরোধ আন্দোলন ১৬১
(ডঃ) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৩, ৫, ৬, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ২২, ৩২, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৯, ৫৪, ৫৭, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৪, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০০
(ডঃ) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভা পতনের আসল কারণ ঃ ৯৮-১০৩
প্রফুল্লচন্দ্র সেন ২, ৩, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৪, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭,

৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৬৮, ৭৯, ৮৫, ৯২, ৯৩ ৯৫, ৯৬
প্রমোদ দাশগুপ্ত ৩, ৪, ৫, ১২, ২৫, ৩৭, ৩৮, ৯৫, ৯৬, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩৮, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮২, ১৮৪, ১৯১, ১৯৮, ১৯৯, ২০০

ফরোয়ার্ড ব্লক ১, ২, ৩, ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৪, ৩৮, ৫৩, ৫৪, ৬০, ৬৪, ৬৬, ৮৭, ৯৫. ১০৭, ১০৯, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১৪১, ১৪৪, ১৫২, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৭১, ১৭২, ১৭৮, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭

বসু—দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু দে।
বদ্রী পোদ্দার ৪৬,
বরদা মুকুটমণি ১৩২, ১৮৯
বলশেভিক পার্টি ২, ৭, ১০, ১২৩, ১২৪, ১৩২, ১৮৫, ১৯৪
বাজেট অধিবেশন ৩১
বাংলা কংগ্রেস ১, ২, ৩, ৬, ৭, ১০, ১৩, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৫৪, ৫৯, ৬২, ৬৬, ৬৮, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৪, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৮১, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০২

বি. পি. ঝা ৩৬
বিজয় ব্যানার্জী ১৩, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ১০০, ১৪৬
বিজয় সিং নাহার ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫২, ৫৯, ৬০, ৬৯, ৮৫, ৮৬, ৯৬
বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৮
বিধানসভায় গণ্ডগোল ৯১, ৯২
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর পথরোধ ১৮০
বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ৭০-৭৩, ৭৬
বিনোদবিহারী মাঝি ৮৫
বিভূতি দাশগুপ্ত ৩৯, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ১, ৭, ৮, ১১, ৩৯, ৪০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭৭, ৮৭, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২০, ১২৩, ১৩২, ১৩৩, ১৫৩
বিষ্ণু বাগচি ৫৯, ৬০, ৯৭
বুর্জোয়া সংবাদপত্র ১০৯
বেতন কমিশন ৩৮, ৩৯
বেলভেডিয়ার ৪৭, ৫৫, ৬১, ৭০, ৯৭, ১২১
বৌদি ৬১, ৯৭, ৯৮
ব্যোমকেশ মজুমদার ২৯

ভক্তিভূষণ মণ্ডল ১০২
ভবানী সেন ১১৯
ভারত সভা হল ৭, ৯, ১০, ১১, ১৩, ৬৯
ভারমা-রায় রিপোর্ট ৭৬
ভি. কে. কৃষ্ণমেনন ২০০
ভি. ভি. গিরি ১৪২
ভূপাল বোস ৩৬
ভূপেশ গুপ্ত ১১৯, ১৯৬

বিষয়	পৃঃ সংখ্যা
মকসেদ আলী	১৩৩
মহামায়াপ্রসাদ সিং	৭৪
মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস	১৭
মাখন পাল	৯, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭
মানেকশ	৩৩
মায়া রায়	২৮
মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক	২, ১২৪, ১৬৭
মিনি ফ্রন্ট	১৯০, ১৯১
মে সাহেব	১০১
মোরারজী দেশাই	৮৯, ১৪৬
মোস্তাক মোরসেদ	১৩৯
মোহন কুমারমঙ্গলম	৮২
যতীন চক্রবর্তী	৮, ৬৯, ১২৩, ১৩২, ১৬২, ১৭৫, ১৭৬, ১৮০, ১৯৪
যুক্তফ্রন্ট : ১ম ও ২য়	
আদি পর্ব	১-১৪
আবার ডঃ ঘোষ	৮০-৯৪
আরও উত্তাপ	১৫৫-১৭০
উত্তাপ বৃদ্ধি	৩৬-৪২
টাস্ক ইজ ওভার	৬২-৭৯
দিল্লির সঙ্গে লড়াই	১২৫-১৩৭
দুটো প্রশ্ন	৯৫-১০৪
দোসরা অক্টোবর	৪৩-৬১
মিটমাটের প্রস্তাব	১৮১-১৮২
যাত্রা শুরু	১৫-২৬
লোভে পাপ	২৭-৩৫
শরিকী বিরোধের সূত্রপাত	১৩৭-১৫৪
শেষ অধ্যায়	১৮৮-২০৬
শুরুতেই সংকট	১০৭-১২৪
যুগান্তর	১১৯, ১২০, ১২১, ১২২
রণজিৎ গুপ্ত	১৫১
রণধীর বর্মন	৭০, ৮৬, ৮৭
রণেন সেন	১৬৭
রবি চৌধুরী	৬৯, ৭০, ৮৬, ৮৭
রবীন্দ্রলাল সিংহ	৮৫
রবীন্দ্র সরোবরের জলসা	১৩৩, ১৩৫-১৩৬
রাজনারায়ণ	১৬১
রাজ্যপালের ভাষণ	১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৭৮, ১৮৭
রাজ্য-বিধান পরিষদ	১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩
রাজেশ্বর রাও	১১৯
রাধাকৃষ্ণ সিংহ	৭৭
রাম চ্যাটার্জী	১২৪, ১৩৬, ১৯৪
রাষ্ট্রপতির শাসন	৯১, ৯৩, ৯৪, ১৮৯, ১৯৬, ২০৫, ২০৬
রেণু চক্রবর্তী	১৩২
জমি দখল অভিযান	২০, ২৫
লোকসভায় উপনির্বাচন	১৯২
লোকসেবক সংঘ	৫৪, ৯০, ১২৪, ১৬৭, ১৭৮
শংকর ঘোষ	৪৩, ৪৫, ১১৬, ১১৮
শংকরদাস ব্যানার্জী	৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৯, ১০০
শচীন ঘোষ	১৪৭, ১৫১
শম্ভু ঘোষ	১৩৬, ১৪৪, ২০২
শরিকী সংঘর্ষ	১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮
ঐক্য অটুট রাখার প্রস্তাব	১৬০
মেটাবার প্রস্তাব	১৪৫-১৪৬, ১৫৩-১৫৪
শান্তি মিত্র	৪৪
শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান	১৫৩, ১৬৩, ১৭১, ১৮৯, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৬

বিষয় পৃঃ সংখ্যা

শিশির কুঞ্জ ৪৬, ৪৭, ৫৩, ৫৭
শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮, ২৯, ৩৪
শ্রীপুর খনি ১৫৮

সঞ্জীব রেড্ডি ১৪৬
সতীশ সামন্ত ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১
সত্যপ্রিয় রায় ১২, ১১২, ১৩৯, ১৪৪, ১৮৮, ১৯২, ১৯৩
সন্তোষ ঘোষ ৪৪
সমর গুহ ৮, ৯
সমীর গাঙ্গুলী ৪৩
সরোজ মুখার্জী ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২১, ১২২
সি. পি. আই ১, ২, ৩, ৬, ৭, ১০, ১৩, ৩১, ৪০, ৪৪, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৯৫, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১৩০, ১৩২, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৫

সি. পি. এম ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ২২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৬৮, ৯৫, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৪
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ২৮, ৩৪, ৩৫, ৪৫, ৮৪, ৮৫, ৯৩, ১৮৯, ২০০, ২০৪
সুকুমার গুপ্ত ১২০
সুকুমার রায় ১০, ১১, ১৩, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৬, ৯৭, ৯৮, ১০৯, ১১৭, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৪, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬২, ১৬৩, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৯৩, ১৯৯
সুধীন কুমার ১০, ১১৮, ১১৯, ১৩২, ১৩৩
সুধীর চক্রবর্তী ৪৫
সুনীল দাশগুপ্ত ২৫
সুবিমল রায় ৯২
সুবোধ দত্ত ১৪৯
সুবোধ ব্যানার্জী ১১, ১২, ১৯, ৩৯, ৪২, ৬৬, ১১৩, ১৪১
সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ৫৪
সুশীলকুমার ধাড়া ৩, ১০, ১১, ১৩, ২৪, ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৬, ৭৫, ৯৭, ১০৯, ১১৭, ১২১, ১২৩, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৩, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৯০, ১৯২, ১৯৬, ১৯৭
সেণ্ট্রাল গভরনমেণ্ট হস্টেল ১, ৩, ৫, ৯৭
সোনারপুর সংঘর্ষ ১৬১
সোমনাথ লাহিড়ি ৪, ৫, ৯, ১০, ১৯, ৩১, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ১২৩, ১২৭, ১৩১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৯৫, ২০৬

বিষয় পৃঃ সংখ্যা

সোমেন মুখার্জী ৬৯
সৈয়দ বদরুদ্দোজা ৭৭
স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ১১৫, ১২৩, ১৩৬, ১৬২, ১৯৯, ২০০
স্পীকারের ক্ষমতা ১০০, ১০১
স্বরাষ্ট্র দফতর ১১, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ১৮৩, ১৯৬, ২০২
হরতালে খুন ২০২, ২০৪
হরিদাস মিত্র ১০, ১৩, ৮৪
হরেকৃষ্ণ কোঙার ৫, ১১, ১২, ৩৭, ৩৯, ৬৫, ৬৬, ৭৮, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৪, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৫৬, ১৫৭, ১৭৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৮, ১৯৯
হরেকৃষ্ণ মহতাব ৬৩
হরেন মজুমদার ৬৮, ৮৪
হিন্দুস্থান টাইমস ৮৬, ১০২
হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড ৬৯
হেমন্তকুমার বসু ৫, ৮, ৯, ১০, ৩৯, ৫২, ৬০, ৭৮, ৯৬, ৯৭, ১০৯, ২০৬

হুমায়ুন কবির ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১৫, ২৭, ২৯, ৪২, ৪৩, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৮৬, ৯২, ৯৭, ১১২

১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম
যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ভারতে সেই
প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার।
বাইরের ও ভেতরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে
বিপর্যস্ত সেই সরকার মাত্র
ন মাস চলেছিল। তারপর
এল পি. ডি. এফ-কংগ্রেস
কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা—
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।
কিন্তু তাও টিকল না।
তারপর রাষ্ট্রপতির শাসন এবং তারপর
১৯৬৯ সনে আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার।
দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারও
তেরো মাসের বেশী
চলতে পারল না। মুখ্যমন্ত্রী
অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
পদত্যাগ করলেন। সরকার ভেঙ্গে গেল
এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল
যুক্তফ্রন্টও—১৯৭০ সনের মার্চ মাসে।
পশ্চিমবঙ্গের এই তিনবছরের
রাজনৈতিক ইতিহাস
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল।
এত চাঞ্চল্যকর ঘটনা এ রাজ্যে
কংগ্রেস রাজত্বের কুড়ি বছরেও
ঘটেনি। ভেতর ও বাইরের নানা
ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে প্রতিনিয়ত—
যার বাইরের দিকটা আমরা সবাই
দেখেছি দৈনিক সংবাদপত্রে।
কিন্তু ভেতরের বা নেপথ্যের
ঘটনাগুলি আজও জনসাধারণ দেখতে
পাননি। এতদিন তা গোপনই ছিল।
আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক
সংবাদদাতা বরুণ সেনগুপ্ত
সেইসব নেপথ্য-কাহিনী
বের করে এনেছেন এবং তারপর
প্রকাশিত ও নেপথ্য কাহিনীতে
মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি
গুরুত্বপূর্ণ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস
লিখেছেন। সেই ইতিহাস একদিক দিয়ে
যুক্তফ্রন্টেরই ইতিহাস—
যার নাম
পালা বদলের পালা

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৭ সালে। তারপর আবার ১৯৬৯-এ। এই তিন বছরে রাজ্য জুড়ে প্রতিনিয়ত যেসব চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে কখনো ভিতরে কখনো বাইরে, কখনো প্রকাশ্যে কখনো বা নেপথ্যে, এ বইয়ের অক্ষরে অক্ষরে তারই ইতিহাস